উমাইয়া খেলাফত

ডক্টর ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট্,

মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা -৭০০০৭৩

প্রকাশনায়ঃ আলহাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা -৭৩

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর—১৯৫৭

প্রচ্ছদঃ কুমার অজিত

মূল্যঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাসেঃ প্রিন্ট-ও-গ্রাফ
৯সি, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণেঃ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং
২০৯ এ, বিধান সরণী/ কলিকাতা- ৭০০ ০০৬

প্রথম অধ্যায়

❑ উমাইয়া খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ❑

দ্বিতীয় অধ্যায়

❑ আমির মুয়াবিয়া ❑

তৃতীয় অধ্যায়

❑ প্রথম ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ❑

দশম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

উমাইয়া খেলাফতের বৈশিষ্ট্য (৬৬১—৭৫০ খ্রীঃ)

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রধান ঘটনাবলী

[সূচনা—নির্বাচন প্রথা রহিত—সরল জীবন ও সরলতার সমাধি—নিরপেক্ষতা বর্জন—রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ্‌তন্ত্রের বিলোপ—বায়তুলমাল হস্তগত—বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত—গোত্রীয় কলহ—ধর্মীয় চেতনা লোপ—উমাইয়াদের সিংহাসনে আরোহণ রচনা করল সৎখেলাফতের পট পরিবর্তনের ইতিহাস।]

সূচনা ঃ উমাইয়াগণ মনেপ্রাণে প্রথম আরব, এবং পরে মুসলমান, এই সত্যটাই তাঁদের প্রথম জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু প্রতিফলিতই হয়নি, নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে মহানবীর (দঃ) সাথে সম্মুখ সমরে দিবা-রাত্রির সহস্র সংঘর্ষে এটা অতি ভয়াবহ ও প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। বিশ্ব ধর্মের বিশ্ব ইতিহাসে কোন নবী বা ধর্মীয় দূতকেই এরূপ সম্মুখ সমরে বার বার সংগ্রাম রত দেখি না। একদিকে আল্লাহ্‌র নবী মহানবী, সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী, সর্ব মানবের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মহম্মদ (দঃ), অন্যদিকে দুর্ধর্ষ আরব কোরাইশ, দুর্বার গতিতে চলমান কোরাইশ, ভয়ভীতি লোভ-লালসা, সকল কিছুর উর্ধ্বে অবস্থান রত কোরাইশ, পলকে জীবন দিতে পারে, ক্ষণিকে জীবন নিতে পারে, এমনি যাদের পেশাগত ধর্ম, এবং নেশাগত নীতি, সেই দুর্জয় কোরাইশগণ; যাদেরকে বিশ্বের যে কোন বিক্রমশালী সম্রাটও অধীনস্থ করা তা দূরের কথা, একবার চিন্তাও করেন নি, সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোরাইশ। তাঁদের ক্ষমতার এতটুকুও অবশিষ্ট থাকতেও তাঁরা কোন দিনই মহানবীর নীতিকে বরণ করা তো বহুদূরের কথা। একবার চিন্তাও করেননি ভেবে দেখতে। তাঁরা সর্বতোভাবে মনেপ্রাণে ছিল আরব কোরাইশ। মহানবী কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর নিরুপায় সিংহ শার্দুল আরব কোরাইশ-উমাইয়াগণ সহস্র প্রচেষ্টার পর, সহস্র প্রাণ উৎসর্গের পর, সহস্র পথ পরিক্রমার পর, এককথায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকার পর মেনে নিয়েছিল মহানবীর নীতি। কিন্তু তাঁরা মনেপ্রাণে ছিলেন প্রথম আরব উমাইয়া, পরবর্তীকালে মনে ছিলেন আরব, দেহে হলেন মুসলমান। এইটাই ছিল তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁদের অগত্যা মুসলমানও বলা হয়। এটা এক দিক দিয়ে তাঁদের চরিত্রের কলঙ্ক

হলেও অন্য দিক থেকে অন্তরের ভূষণ। তাই উমাইয়া প্রথম আরবীয় মানুষ, এবং পরে ইসলামের মুসলমান।

মহানবীর আমলে প্রচণ্ড মরু-ঝড়, প্রবল ঝটিকা, মহাপ্রলয় বাজপাখী-গুলোকে যেন বাধ্য করেছিল মাথা নুয়াতে। বিশ্ব-ব্যক্তিত্ব, পর্বতসম ব্যক্তিত্ব মহানবীর সম্মুখে তাঁরা যেন বিন্দুরূপে বসে গেলেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক হলেন—মুসলমান। শার্দূল যেন সুযোগের অপেক্ষায়। মহানবীর তিরোধানের পর এল ন্যায়পরায়ণ খলিফা চতুষ্টয়ের যুগ। দুজন সৎ খলিফা অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তৃতীয় সৎ খলিফা হযরত ওসমানের বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে সুপ্ত ও ঘুমন্ত আরব-শার্দূল যেন প্রথম সাড়া দিল। অতঃপর আপন চিরাচরিত অভ্যাস মত সারা আরবে জাঁকিয়ে বসলো। খোলাফায়ে রাশেদীনের পতনের প্রথম বীজটি এই কুক্ষণেই রোপিত হয়েছিল। যেটি একদিন হযরত আলীর খেলাফত্ কালে মহীরুহ রূপ ধারণ করলো। মহান আলীর জীবন-মরণ সাধনাও তাকে রুখে দিতে পারল না। ইসলামি খেলাফতের বা গণতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে শার্দূল সিংহাসনে উপবিষ্ট হলো। সিংহাসনে বসা মাত্রই খেলাফত বা নবীজীর গণতন্ত্রের মৃত্যুবাণ ঘোষিত হলো। আরবের খলিফা আজ নিজেকে সম্রাট শাহানশাহ বাদশাহ বলে বিবেচিত করলেন। এইভাবেই আরবের উমাইয়াগণ তদানীন্তন যুগের খলিফা অপেক্ষা সমধিক গুণে ছিলেন—প্রথম সম্রাট শাহানশাহ, পরে খলিফা। ওটা ছিল তাঁদের পোশাকী খেতাব বা লকব মাত্র।

মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি রাজ্যের শুধু শাসনতন্ত্রেরই পরিবর্তন হয় নি, পরিবর্তন হল গোটা কাঠামোর। মহানবীর (দঃ) প্রতিষ্ঠিত ও চার খলিফার দ্বারা পরিচালিত ইসলামের প্রকৃত খিলাফত ব্যবস্থা বা গণতন্ত্র এখানেই সমাধিস্থ হল। আমীর আলী বলেন—"উমাইয়াদের ক্ষমতা লাভের পর কেবল শাসক গোষ্ঠীরই পরিবর্তন হয় নি, বরং শাসন নীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে, এবং এই পরিবর্তন সাম্রাজ্যের ও জাতির ভাগ্যাকাশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে"। "মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন--"আমার বিশ্বাস কিয়ামতের (উত্থান) দিন যদি জালেমদের ফাছেক দল থেকে পৃথক করে দাঁড় করান হয়, তা হলে তাদের পয়লা কাতারে বনু উমাইয়ারা থাকবে। সে জালেমরাই ইসলামের এই আজাদীর (গণতন্ত্রের) মন্ত্রটিকে জুলুমের শিকারে পরিণত করল। এরা ঠিক উত্থান ও প্রসারতা লাভের মুহূর্তেই গতিরোধ করে দাঁড়াল। ব্যক্তিগত স্বার্থে এ আদর্শটিকে পদদলিত

করল। ....তারা যে শুধু ইসলামের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করে ছেড়েছে, তাই নয়, অবশ্য এটাও কোরআনের দৃষ্টিতে কুফরী বৈ নয়। কিন্তু সব চাইতে বড় জুলুম হল, তারা ইসলামের প্রাণশক্তি সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার নির্দেশটিকে তরবারির জোরে দাবিয়ে দিতে চাইল। মুসলমানদের সত্য বলার প্রেরণাকে নষ্ট করে দিল।"

নির্বাচন প্রথা রহিত ঃ

মুয়াবিয়ার সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে খোলাফায়ে রাশেদীনের গণতান্ত্রিক শাসনের চির অবসান হল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগের সূচনা দেখা দিল। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি রাজা বা শাসকে পরিণত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করলেন এক দুস্তর ব্যবধান শাসক ও শাসিতের মধ্যে, বিজয়ী ও বিজেতার মধ্যে। এককথায় শাসক নিজেকে সর্বসাধারণের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রতিনিধিরূপে না রেখে রূপ দিলেন যথার্থ সম্রাটের। ফলে রহিত হল ইসলামের গণতন্ত্র, নির্বাচন প্রথা। মহানবীর নিজ হাতে রোপিত গণতন্ত্রের বীজ, খোলাফায়ে রাশেদীনের নিজ হাতে লালিত গণতন্ত্রের সেই শিশু বৃক্ষকে শিকড় সহ উপড়িয়ে ফেলে দিল মুয়াবিয়ার চির কলঙ্কিত হাত।

সরল জীবন ও সরলতার সমাধি ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল—সত্য ও সরলতার যুগ, সহজ জীবনের যুগ, অনাড়ম্বরের যুগ, অকৃত্রিমতার যুগ। মহানবীর অদর্শকে তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন অকৃত্রিম প্রাণে। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনযাত্রার জন্য কোন দিনই কোন রাজ-প্রাসাদ বা দুর্গের প্রয়োজন হয় নি। কোন দ্বারী বা প্রহরীর প্রযোজন হয় নি। সর্বসাধারণের স্বার্থে তাদের সাধারণ জীবন অতি স্বাভাবিক ভাবেই বয়ে চলেছে, তাঁরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন—তাঁরা একদিকে ছিলেন--শাসক, অন্যদিকে ছিলেন সাধারণ মানুষ। প্রজাবর্গের দুঃখ দুর্দশাকে স্বচক্ষে দেখা ও তাকে দুর করাকে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন। অন্ধকার রাত্রিতে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশাকে ছদ্মবেশে আপন চোখে অবলোকন করাকে আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করতেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ও এক বিধবার কাহিনী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আহারে বিহারে ব্যবহারে পোশাকে পরিচ্ছদে তারা আরব-গগনে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন, তা এককথায় পূর্ণ চন্দ্র, অন্যদিকে আড়ম্বরের আতিশয্যে অধিকাংশ উমাইয়াগণ যা তুলে ধরলেন—তা অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। আরনল্ডের ভাষায় বলতে গেলে—"মহানবীর আদর্শে ও ঐতিহ্যে প্রভাবিত

মক্কা ও মদীনার ধার্মিক গোষ্ঠী অনুভব করেন যে, মহানবীর এবং তার সাহাবীদের ধর্মপ্রবণতা ও অকৃত্রিম সরলতাকে সংরক্ষণ করার পরিবর্তে মুয়াবিয়া খেলাফতকে আড়ম্বর ও ভোগ বিলাসের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি পার্থিব সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন।" এই একই কথার সমর্থন করে ভনক্রেমার বলেন—"খলিফাদের দরবারে বিলাসিতা অবাধ গতি লাভ করল, যা খোলাফায়ে রাশেদীনের সাফল্যের চরম পরিপন্থী ছিল।" অতি ছোট্ট কথায় হিট্টি বলেন—"মুয়াবিয়া দরবারের প্রধান আকর্ষণ ছিল--সিংহাসন।" মুয়াবিয়া খোলাফায়ে রাশেদীনদের সরল জীবন ধারা ও সরলতাকে ধবংস করে ঐ ধবংসস্তুপের উপর রচনা করলেন--সর্বপ্রথম দেহরক্ষী হতে দ্বার রক্ষী। এমন কি আপন নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাবা মসজিদেও তৈরি হলো 'মাকসুরা'—নিভৃত স্থান। পরে রাজ দরবারে স্থান পেল অসভ্য আরবের সেই আদিম বস্তুগুলো—মদ, অবৈধ মেয়েছেলে, জুয়া, ঘোড়-দৌড়, দাবা প্রভৃতি। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক আরনল্ড ঠিকই মন্তব্য করেছেন—"৬৬১ খ্রীস্টাব্দে দামেস্কে মুয়াবিয়া উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে, প্রাচীন পৌত্তলিক আরবের ভাবধারার পুনর্জাগরণ হয়। ধর্মের স্থান গ্রহণ করল--অধর্ম, সত্যের স্থান গ্রহণ করল--মিথ্যা, সাধুতার স্থান নিল অসাধুতা। নিরপেক্ষতার স্থান নিল স্বজনপ্রীতি; 'মজলিস-উস্-শুরার' স্থান দখল করল--রাজতন্ত্র। তাই সেদিনে মুয়াবিয়ার উপাধি ছিল—আরবদের সীজার।" ("Caesar of the Arabs")।

নিরপেক্ষতা বর্জন ঃ

মহানবী (দঃ) তাঁর ইসলামি রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর। তিনি ঘোষণা করেছিলেন--"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার"। এবং এই ভাবেই তিনি বিশ্ববাসীকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আহ্বান করেছিলেন। মানুষে মানুষে কোন দিনের জন্যই কোন ব্যবধান তিনি মেনে নেন নি। খোলাফায়ে রাশেদীনও সেই পথই অনুসরণ করলেন। কিন্তু একমাত্র দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সমস্ত উমাইয়া খলিফা এই প্রথা রহিত করেন। মুয়াবিয়া হতে অন্যান্য সকল খলিফা জ্ঞান-পাপী আহম্মকের মত অনুভব করলেন, আল্লাহ তাঁদের মধ্য হতে একজনকে দুত নির্বাচন করেছেন; সুতরাং তাঁদের মূল্য অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি। জ্ঞানপাপীরা একবারও বোঝার চেষ্টা করলেন না, স্বয়ং 'দুত' কি করে করেছেন বা কি বলে গেছেন। তাঁরা প্রথম অনারবদের ঘৃণা করলেন। পরে আরবদের মধ্যেই স্বয়ং কোরেশদের একাংশ হাশিমীদেরও ঘৃণা করলেন, যে কোরেশ, বংশের হাশিমী গোত্রে স্বয়ং

মহানবীরই জন্ম। তাঁরাও উমাইয়াদের নিকট হতে নিষ্কৃতি পেলেন না। এই ভাবে স্বজন পোষণের মাত্রা আকাশ স্পর্শ করল এবং মহানবীর সাম্য ভিত্তিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোধ, খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্জলা নিরপেক্ষ নীতি উমাইয়া খলিফাদের নির্মম হাতে চরম স্বজন পোষণে পরিণত হল।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন-- "পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত চলতে পারে না"। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন--মজলিস-উস-শুরা, পরামর্শ সভা। পববর্তীকালে উমাইয়া খলিফাদের হাতে এই শুরার বিলোপ সাধন হলো। উমাইয়া খলিফাদের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য তাঁরা একটি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র (Hereditary Monarchy) প্রবর্তন করেন। ইসলামি রাজত্বে বা মুসলমানদের জন্য আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা। তাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ইসলামি রাজত্ব বা মুসলমানগণ পরিচালিত হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কোথাও কোথাও এর কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরার জন্য কিছু কিছু ছোটখাট আইন প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাও পবিত্র কোরআন হাদিসের মোখালেফাত বা বিরুদ্ধ নয়। কেননা কোরআন হাদিস মানুষকে এজমা বা কিয়াসের বা বিবেকের যথাযথ প্রয়োগের অধিকার দিয়েছে। হযরত ওমর সেইটাই প্রয়োগ করেছিলেন। এবং সৎ খলিফাগণের সকলেই ওটাই করেছিলেন। কেননা কোরআন হাদিসে বা যে কোন ধর্ম-শাস্ত্রে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুই লেখা থাকে না, এবং তা সম্ভবও নয়। সুতরাং সকলকেই সেখানে বিবেকের প্রয়োগ করতেই হবে। হযরত ওমর ঠিক তাই করেছিলেন। কিন্তু মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই সমস্ত আইনকে নিজ হাতে প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তখন সকলেই বুঝতে পারল এটা আর খোলাফতের যুগ নয়, পরিষ্কার রাজতন্ত্র। এই ধারা অপরিবর্তিত থাকে পরবর্তী আববাসীয় খলিফাগণ দ্বারাও।

গণতন্ত্রে মহানবী (দঃ) ঃ

এ মধুর মালিকানা জগৎপিতার
সকল সম্পদ হতে সব কিছু তাঁর।
শিখাইলে মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টিকুলে সকলের সম অধিকার।

এ জগতে আছে যদি রাজ সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
বলে নাই জোরে নাই জাতির জনক
মানুষই করিবে ঠিক মানব সেবক।

শিখাইলে মানুষেরে মান-মানবতার
জগতের গণতন্ত্র সাম্য-অধিকার।
দাও নাই রাজতন্ত্রে মানুষের রাজ
শিখায়েছ গণতন্ত্রে গড়িতে সমাজ।

মানুষ খলিফা শুধু খাদেম খোদার
একথা জানে না যেই নহে জনতার। ২ ঃ ২৮৪

— **কাব্যকানন**

আল্লাহতন্ত্রের বিলোপ ঃ

যে শাসনতন্ত্রে আল্লাহ বা বিধাতা-রচিত বিধানে মানুষ পরিচালিত হয়, তাকে বলা হয়—আল্লাহতন্ত্র (Theocracy), এবং যে শাসনতন্ত্রে মানুষ-রচিত বিধানে মানুষ পরিচালিত হয়, তাকে বলা হয়—গণতন্ত্র (Democracy)। ইসলামের প্রবর্তক মহানবী প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন আল্লাহতন্ত্রের। তিনি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর প্রতিনিধি, পরবর্তীকালে তাঁর চারজন সৎ খলিফা তাঁর প্রতিনিধি রূপে তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহতন্ত্রের প্রয়োগ করেন। অতি খোলা প্রাণে, খোলা মনে মানুষ নির্বাচিত করত তাদের নেতাকে, এবং সেই নেতাকে বলা হত খলিফা। এই খলিফা পরিচালনা করতেন শাসন ব্যবস্থাকে আল্লাহর বিধান মতো, এই ব্যবস্থা রহিত হলো উমাইয়া খলিফাদের হাতে।

বায়তুলমাল হস্তগত ঃ

বায়তুলমালের অর্থ ধনের ঘর বা কোষাগার। মহানবীর সময় বায়তুলমাল ছিল না। কেননা তখন তেমন কোন ধনই ছিল না, সুতরাং ধনাগারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের সময়ও কোন ধনাগার ছিল না। দ্বিতীয় খলিফা ওমর তাঁর সময়ে ইসলামের সম্প্রসারণে রাজস্ব বৃদ্ধি পেলে ওয়ালিদ বিন হিসামের পরামর্শ মত সর্বপ্রথম একটি

বায়তুলমাল স্থাপন করেন। এবং আব্দুল্লাহ ইবন-আরফানকে প্রথম প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে এই বায়তুলমালকে একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। পরবর্তীকালে প্রতিটি প্রদেশেও ইহা ছিল একেবারেই জনসাধারণের সম্পত্তি, কিন্তু পরবর্তীকালে এই জনসাধারণের বায়তুলমাল উমাইয়া খলিফাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়, ব্যতিক্রম শুধু—দ্বিতীয় মহানুভব ওমর বিন আব্দুল আজিজ।

বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত :

উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া খেলাফত লাভ করেছিলেন— ইমাম হযরত হাসানের সঙ্গে একটি চুক্তিবদ্ধ শর্তে। চুক্তিটি ছিল— মুয়াবিয়ার পর হযরত হাসানের ভ্রাতা হযরত হোসেন খেলাফত লাভ করবেন। কিন্তু মুয়াবিয়া তাঁর জীবনাবসানের পূর্ব ক্ষণে ঐ চুক্তির পূর্ণ অবমাননা করে তার আপন পুত্র প্রথম ইয়াজিদকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার বলে ঘোষণা করেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে প্রথম মুয়াবিয়াই বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাঁর নীতি পরবর্তীকালে সকল উমাইয়া ও আববাসিয়া খলিফাগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়। এই ভাবে ইসলাম জগতে তখন গণতন্ত্রের জন্য আরব ভূমিতে আর কোন শুভ বুদ্ধির উদয় হয় নি। তাই সেখানে ইসলামি রাজত্বের গণতন্ত্র-রবি আজও আর তার জাতিকে উষার আলোকে উদ্ভাসিত করল না। এক্ষেত্রে আজও আরব অন্ধকারে।

মহানবী (দঃ) বলেন—"যে কোন সুকাজের, বা সু-প্রথার প্রবর্তক, তার পরলোক গমনের পরও প্রলয় দিন পর্যন্ত তার সুফল পেতে থাকবে। অনুরূপভাবেই কুকাজ ও কু-প্রথার প্রবর্তকও প্রলয় দিন পর্যন্ত আপন কর্মের কুফল ভোগ করতে থাকবে"। নিশ্চয় মোহগ্রস্ত আমির মোয়াবিয়া এ হাদিসটি জেনেও না জানার ভান করেছিলেন।

কর্মী তলিয়ে যায় অতল জলে

কীর্তি দাঁড়িয়ে রয় আপন বলে।

থাকিলে পাপের কণা কিঞ্চিত জমা

তোমার বিচারাগারে নাহি আছে ক্ষমা। —কোরআন ৯৯ ঃ ৭-৮।

গোত্রীয় কলহ :

মহানবীর জন্মের পূর্ব হতেই কোরেশ বংশ গোত্র কলহে জড়িয়ে পড়ে। (এই সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে গেলে লেখকের ইসলামের ইতিহাসের প্রথম

খণ্ড মহানবী গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় আরবের পূর্ব পুরুষগণ এবং হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ অনুচ্ছেদটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।) মহানবীর ন্যায় এক অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাবে এই কলহ পরবর্তীকালে ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে (মক্কা বিজয়ের পর) বন্ধ হয়। এবং এই ধারা অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর পর্যন্ত। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের সময় আবার ইহা মাথা চাড়া দেয়। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর অসামান্য চেষ্টায় গোত্র কলহ কিছুটা প্রশমিত হলেও কলহের আগুন জ্বলতেই থাকে। বরং এই অভিশপ্ত আগুন নির্বাপিত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের শান্তি যুগকে শশ্মান ঘাটে পুড়িয়ে শেষ করল (অর্থাৎ খলিফা হযরত আলী শহীদ হলেন ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে)। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর হতে ৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে হযরত ওসমান হত্যা পর্যন্ত এই ২৬ বছর আমরা ইসলামের অনাবিল শান্তি যুগ পেলাম, এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে শাহাদৎ পর্যন্ত এই (৬৩০-৬৬১) তিরিশ বছর ইসলামের অক্ষত যুগ বা অনাবিল অবিকল যুগ পেলাম। পরবর্তীকালে উমাইয়াগণ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই কলহের আগুনকে প্রশমিত করার পরিবর্তে বহু গুণে বাড়িয়ে দিলেন। কোরেশ বংশের একদিকে বানু হাশিম, অন্যদিকে বানু উমাইয়া, একদিকে শিয়া, অন্যদিকে খারিজী, একদিকে মুদারীয় ও অন্যদিকে হিমারীয়দের কলহের আগুন হতে শেষ পর্যন্ত উমাইয়াগণও নিষ্কৃতি পান নি।

ধর্মীয় চেতনা লোপ ঃ

আল্লাহতন্ত্রের মাধ্যমে মহানবী মানুষের অখণ্ড জীবন সাধনায় ইহকাল ও পরকালের একটি সুন্দর সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি স্বর্গের জন্য সংসারকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া তো বহু দূরের কথা, বরং সংসারকে স্বর্গ লাভের সোপান স্বরূপ বলিষ্ঠ সেতু বলে বর্ণনা করে গেছেন। এককথায় তিনি ইহকাল ও পরকাল দু কালকে দুহাতে নিয়ে একটি সুন্দর সমুন্নত জীবন-ব্যবস্থার পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। পরবর্তী সৎ খলিফাগণ সেই পথ নির্দেশকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে উমাইয়া খলিফাগণ (দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত) পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পরকালের জীবন-চর্চাকে একেবারেই পদদলিত করে কুআচারের ব্যভিচারের মাধ্যমে ইসলামের ধর্মীয় চেতনাকে পদাঘাত করে মহানবী কর্তৃক নির্দেশিত সকল মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে একেবারেই পঙ্গু করে দিলেন। ইসলামের একটা বাহুকে তাঁরা চির ক্ষতবিক্ষত কবলেন, একটি পা'কে খোঁড়া করলেন, একটি চোখকে অন্ধ

করলেন। আরনল্ড বলেন—"ইসলামের ধর্ম, আইন-কানুন, রাজনীতি ও যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয় মদীনায়। পরে আরবের বাইরে ইসলাম বিস্তৃত হলে এই গুলোরও প্রয়োগ হয় বহির্জগতে।" কিন্তু উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাণ কেন্দ্র মদীনা তার মর্যাদা হারাল। দামেস্ক রাজধানীর গৌরব অর্জন করল। ইসলামের মহাদুর্দিনে যাঁরা ইসলামের মহানবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যাঁরা ইসলামের জন্য জীবনের সমস্ত সম্পদ হতে জীবনকেও অবলীলায় দান করেছিলেন, তারা আজ শুধু মহানবীর পবিত্র সমাধিকে বুকে ধারণ করে অশ্রুসজল নয়নে ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। এই সম্পর্কে জোসেফ হেল একটি খাঁটি কথা বলেছেন—"এর পর হতে মদীনা ইমলামের জ্ঞান-সাধনা এবং ধর্মীয় প্রাণ-কেন্দ্রের মর্যাদা হারাল এবং মদীনার সূর্য অস্তমিত হলে রসুলের প্রকৃত ইসলামও অস্তমিত হল।" সকল বৈশিষ্ট্যের উপর এইটাই হল উমাইয়া খেলাফতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পতনেরও প্রধান কারণগুলোর অন্যতম কারণ।

কুচক্রী কালাপাহাড় আমির মুয়াবিয়া
এক চোখে দেখিলেন শুধু এই দুনিয়া।
পেয়েছিলেন ভাগ্য বলে নবীজীর মহব্বত্
ভুলে গেলেন বেমালুম নবীজীর সহবত্।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমির মুয়াবিয়া (৬৬১—৬৮০ খ্রীঃ)

প্রধান ঘটনাবলী

[প্রথম জীবন—মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভ—প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন—আরবের তিন রাজনৈতিক মেধা—রাজ্যজয়—পূর্বাঞ্চল বিজয়—পশ্চিমাঞ্চল বিজয়—মুসলিম আলেকজাণ্ডার—প্রথম মুসলিম নৌবহর—কনস্টান্টিনোপল অবরোধ—ইয়াজিদের মনোনয়ন—মুয়াবিয়ার মৃত্যু—মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব—উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া—রাজনীতিবিদ মুয়াবিয়া—সমরনেতা মুয়াবিয়া—শাসক মুয়াবিয়া—সংগঠক মুয়াবিয়া।]

মুয়াবিয়া ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে কোরেশবংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবু সুফিয়ান, মাতা হিন্দা, উভয়েই নামকরা ব্যক্তি। আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত মহানবীর চরম শত্রু ছিলেন। এবং হিন্দা ওহোদ যুদ্ধে শহীদ মহাবীর আমীর হামজার কাঁচা হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খান। মহানবীর মক্কা ত্যাগের পেছনে যাদের অত্যাচার একেবারেই তুঙ্গে উঠেছিল, আবু সুফিয়ান ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

৬৩০ খ্রীস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর নিরুপায় আবু সুফিয়ান বাধ্য হয়েই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেন, সঙ্গে পুত্র মুয়াবিয়া। এরপর থেকে মহানবীর সাথে তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। মুয়াবিয়া রসুলে আকরামের (সাঃ) ব্যক্তিগত সচিবের পদও লাভ করেন, এবং 'ওহী' প্রত্যাদেশ লেখার কাজে নিযুক্ত হন। মুয়াবিয়ার ভগ্নি বিধবা উম্মে হাবিবাকে মহানবী পত্নীত্বে বরণ করে উভয় পরিবারের দূর সম্পর্ককে আরো নিবিড় করেন। পরবর্তীকালে মুয়াবিয়ার ভ্রাতা ইয়াজিদ সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মুয়াবিয়া জেলা শাসকের পদ লাভ করেন।

তখন হযরত ওমরের যুগ। সিরিয়ার শাসনকর্তা ইয়াজিদ ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হলে খলিফা ওমর মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খলিফা ওমরের পর খলিফা ওসমান মুয়াবিয়াকে এই পদে স্থায়ী করেন। মুয়াবিয়া আপন প্রতিভা বলে, কর্মগুণে সমগ্র সিরিয়াতে সুশাসন কায়েম করেন। খলিফা থেকে আরম্ভ করে সকল মানুষের নিকট হতেই তিনি সুশাসনের সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। একদিন তার চরম নির্ভিকতা ও সামরিক দক্ষতার জন্যই সিরিয়া, বাইজান্টাইন আক্রমণ থেকে রক্ষা

পেয়েছিল। খলিফা ওসমানের শাসনকালে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবহর তৈরি করেন। এবং এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ সাইপ্রাস ও রোডস মুসলমানদের দখলে আসে, এবং অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলেও মুসলিম প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে।

হযরত ওসমান হত্যার পর মুয়াবিয়া খলিফা হত্যার প্রতিশোধের জন্য জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকেন। কারণ স্বরূপ তিনি বলেন—খলিফা ছিলেন তাঁর স্বগোত্রীয় মানুষ, সুতরাং তিনি তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষপাতী, কারণ স্বরূপ তুলে ধরেন—ন্যায় বিচার পেতে হবে। কিন্তু এই দুটো ব্যতীতও মুয়াবিয়ার মনের কোণে অন্য একটি মূল কারণও দানা বেঁধেছিল, সেটা হচ্ছে—খলিফা হওয়া। তাই তিনি শহীদ খলিফার রক্তাক্ত জামা ও স্ত্রী নাইলার কর্তিত আঙ্গুল নিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকলেন। ফলে আরম্ভ হল—খলিফা আলীর সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্বের আগুন ইসলাম-জগতের বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের মহা সর্বনাশ ডেকে আনল।

সূচনা হলো ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ। সংঘটিত হল—ঐতিহাসিক সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ। অনিবার্য পরাজয়ের হাত থেকে মুয়াবিয়া রক্ষা পেলেন চরম চতুরতা ও কূটনীতির মাধ্যমে। সরল সহজ বীর আলীর খেলাফতের সমাধি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর যেন স্থাপিত হল এই সিফফিনের যুদ্ধে। চতুর আমর ইবনুল আসের তৎপরতায় দুমার মীমাংসা ছিল একটা ছলনা মাত্র। এটাকে কোন সন্ধি না বলে নির্জলা দুরভিসন্ধি বললেই ভাল হয়। মহামানব মহাবীর আলী পর পর এই দুরভিসন্ধির শিকার হলেন, অবশেষে ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে আলী হারালেন তাঁর প্রাণ, সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম হারাল তার পবিত্র যুগ, মুসলিম জাহান হারাল তার পবিত্র খেলাফত বা গণতন্ত্র।

মুয়াবিয়ার সিংহাসনলাভ ও প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন :

৬৬১ খ্রীস্টাব্দে হযরত আলীর শাহাদত বরণের পর মুয়াবিয়া ছলে-বলে-কৌশলে হযরত হোসেনকে খেলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কে মূইর বলেন— "মুয়াবিয়ার দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ খেলাফতের সমাপ্তি এবং রাজতন্ত্রের সূচনা করে।" একটা যুগের অবসান হল। একটা ইতিহাসের সমাপ্তিতে অন্য একটি ইতিহাসের সূচনা হল। এই দিক দিয়ে মুয়াবিয়া একজন ইতিহাসের স্রষ্টা। তাই তিনি তাঁর কার্য সিদ্ধির জন্য যে পথই অবলম্বন করে থাকুন না কেন, তাঁকে যোগ্য শাসক, দুরদর্শী রাজনীতিবিদ, সুনিপুণ কূটনীতিবীদ, নির্ভিক যোদ্ধা, সহনশীল মানুষ, সুচতুর সেনাধ্যক্ষ, বিজ্ঞ ও

বিচক্ষণ ব্যক্তির মর্যাদা দিতেই হবে।

মুয়াবিয়া সিংহাসন লাভ করার পর কোন অলস উচ্ছৃঙ্খল রাজকুমারের ন্যায় অলসতায় ও হেরেম-শরীফে গা ভাসিয়ে দেন নি। কেননা এ রাজ্যলাভ তাঁর কোন পৈত্রিক পাওনা বা পড়ে পাওয়া ধন ছিল না। এর পেছনে তাঁকে বহু ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে করতে হয়েছে, বহু খড়-কাঠ পোড়াতে হয়েছে, বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে নিধন করতে হয়েছে, অনেক নিষ্পাপ প্রাণকে বলি দিতে হয়েছে। এমন কি হযরত আলীর ন্যায় তুলনাহীন মানুষকেও শেষ করতে হয়েছে। সর্বোপরি মহানবীর প্রতিষ্ঠিত নীতিকে (গণতন্ত্র) নির্মম হস্তে নিঃশ্চিহ্ন করতে হয়েছে। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলেন কি করে রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, কি করে একে সমৃদ্ধশালী করা যায়, কি করে একে বিশ্বের বুকে সম্প্রসারিত করা যায়।

এই চিন্তাতেই তিনি রাজধানীকে কুফা থেকে দামেস্কে স্থানান্তরিত করেন। এই নিয়ে ইসলামি রাজ্যের রাজধানী দুবার স্থানান্তরিত হল। প্রথমবার হযরত আলী মদীনা থেকে কুফায় করেছিলেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কেননা কুফাবাসীরা ছিলেন বিশ্বাসঘাতক ও অস্থিরমতি। এই কারণেই মুয়াবিয়া সিংহাসনকে দামেস্কে নিয়ে এলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। সিরিয়াবাসীরা চিরদিন ছিলেন বিশ্বাসী ও রাজভক্ত এবং ধার্মিক। ওয়েল হাউসন বলেন—"সিরিয়ার রোমক সাম্রাজ্য ও খ্রীস্টানধর্মের ঐতিহ্য সিরিয়াবাসীদের রাজভক্ত করে তুলেছিল, অন্যপক্ষে ইরাকের অধিবাসীগণের সেরূপ কোন ঐতিহ্য ছিল না।" মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভ করার পর শুধু যে শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন হল তা নয়, শাসননীতিরও রদ বদল হল। এতে রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় নি। বরং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই পট পরিবর্তনের পর রাজ্যে ধীরে ধীরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলো। রাজ্য বহু সমৃদ্ধি লাভ করল। তাই আমীর আলী বলেন—"উমাইয়াদের সিংহাসনে আরোহণ কেবল শাসক গোষ্ঠীরই পরিবর্তন করল না, শাসন নীতিরও পরিবর্তন করল যা সাধারণ মানুষের ভাগ্য ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।"

হযরত ওসমান হত্যার পর দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভের পূর্ব দিন পর্যন্ত ছিল। তাঁর সিংহাসন লাভের পরই দেশ আবার অন্য দিকে মোড় নিল। কেননা এই কলহের মূলে একমাত্র মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভের মোহজাত চক্রান্তই ছিল মূলত দায়ী।

খারিজী বিদ্রোহ দমন ঃ

হযরত ওসমান হত্যার পর সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমালদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হল, শান্তি বিঘ্নিত হল, সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধির পথও আপাতঃ রুদ্ধ হল। হযরত আলীর আপ্রাণ চেষ্টাও সফল হল না। পরিবেশ দুর্ভাগ্যজনক পট পরিবর্তনের শোচনীয় পরিণতির দিকে দুর্বার বেগে ছুটে চলল। কেননা পরিস্থিতি নানা কারণে বড়ই জটিল রূপ ধারণ করেছিল। সিফ্‌ফিনের রণক্ষেত্রে হযরত আলীর সেনাদলের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হল, দুরভিসন্ধিমূলক দুমার মীমাংসাতে আরো জটিল আকার ধারণ করল। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর সেনাদলের মধ্যে একাংশ যাঁরা জয় নিশ্চিত জেনে যুদ্ধ থামাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁরাই পরবর্তীকালেও দুমার দুরভিসন্ধিমুলক বিচার মানতেও অস্বীকার করলেন, এবং এই অস্বীকারকারীগণই খারিজী বলে পরিচিত। এঁরা প্রথম ক্ষোভে হযরত আলীর কুফী সৈনিকদের বিরুদ্ধেই নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তরবারি ধরেন। কিন্তু পরাজিত হলেও বিদ্রোহের আগুন একেবারেই প্রশমিত হল না। তাঁরা মুয়াবিয়ার শাসনকালেও ইরানে অরাজকতার সৃষ্টি করে কালাদিয়া অধিকার করেন। মুয়াবিয়া অতি কঠোর হস্তে এই খারিজী বিদ্রোহী দমন করতে সক্ষম হন।

হিমারীয় ও মুদারীয়দের বংশ পরিচয় ও তাঁদের কলহে কার্যসিদ্ধি ঃ

মুয়াবিয়া খারিজী বিদ্রোহ দমন করার পরই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন—বিদ্রোহী হিমারীয় ও মুদারীয়দের প্রতি। মহানবীর বহু পূর্ব থেকেই আরবে এই দুই গোত্র বসবাস করত। এককথায় সমগ্র আরববাসী এই দুই ভাগেই মূলত বিভক্ত ছিলেন। একটি ছিল কাহতান বা হিমারীয় বংশ, অন্যটি ছিল—হযরত ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের বংশধর। কাহতান বংশের আদি বাসস্থান ছিল ইয়ামেন। বহুকাল পরে তাদের বংশের অন্যতম ব্যক্তি আব্দুল সামসের পুত্র হিমারের নামানুসারে তাদের হিমারীয় বলা হত। এদেরকে সাধারণত দক্ষিণ আরবের বংশধর মনে করা হয়। অপর গোত্রটি হেজাজে বসবাস করত। তারা মাদের পৌত্র মুদার বংশধর বলে মুদারীয় বলা হত। এই উত্তর আরবের অধিবাসীগণ দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের মত তেমন সুসভ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে হিট্টি বলেন ঃ "হিমারীয়গণ আরবীয় আরব, অর্থাৎ বনেদী আরব, এবং মুদারীয়গণ হিমারীয়দের ন্যায় বিশুদ্ধ আরবী রক্তের অধিকারী ছিলেন না। এই জন্য এঁদের দেশীকৃত আরব বলা হত।" পরবর্তীকালে মুদারীয়দের মধ্যে যে কয়েকটি বিশেষ গোত্রের উন্মেষ দেখা যায়, তার মধ্যে—বানু কুরায়েশ, বানু

কায়েস, বানু বকর, বানু তাগলিব, ও বানু তামীম প্রধান। কোরেশ গোত্রের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মুদারীয়গণ ছিলেন যাযাবর বা অসভ্য। কিন্তু হিমারীয়গণ ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নত ও সুসভ্য ছিলেন। কোরেশ গোত্রের আবির্ভাবের পরই মুদারীয়গণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হন। কিন্তু দুই দলের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ চলতেই থাকে। পরবর্তীকালে মহানবী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে সকলকেই ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। ঝগড়ার বহু খরস্রোত বেগবান নদীকে তিনি এক মিলন মোহনায় মিলিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁর চার সৎ খলিফাগণও ঐ একই পথ অনুসরণ করে জাতিকে ঐক্যের পথে উদ্বুদ্ধ করেন।

পরবর্তীকালে সুশাসক মুয়াবিয়া নিজ শাসন ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ কলহকে অতি সুকৌশলে আবার জাগিয়ে তোলেন। যাতে তারা কেউই মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে অবকাশ না পায়। কিন্তু চতুর মুয়াবিয়া নিজে মুদারীয় গোত্রের মানুষ হলেও কখনও হিমারীয়দের শত্রুতে পরিণত করেন নি, এটা ছিল তাঁর চরম কূটনীতি। মুদারীয়গণ বসরায় ও হিমারীয়গণ কুফায় বসবাস করত। মুয়াবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে খেলাফত লাভের পূর্বদিন পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই দুই দলকে পরিচালনা করেন। এমনকি খেলাফত লাভের পরও এক দলকে অন্য দলের উপর কোন দিনই অধিক শক্তিশালী হতে দেন নি। আমীর আলী ঠিকই বলেছেন--"ধূর্ত ও সুদক্ষ শাসক মুয়াবিয়া এই দুই গোত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হন।" যে আগুনকে জাগিয়ে রেখে সুচতুর মুয়ারিয়া আপন প্রশাসনে তাকে শীতকালের উপভোগ্য বস্তু রূপে ভোগ করে গেলেন, পরবর্তীকালে বা উমাইয়া রাজত্বের শেষের দিকে এই দুই গোত্রের অশান্তির ঐ আগুনে উমাইয়া খলিফাগণ নিজেরাই পুড়ে মরেন। মুয়াবিয়ার চরম কৃতিত্ব সকল কলহকে আপন মুঠোর মধ্যে করতলগত করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পেরেছিলেন, নিজেকে শুধু একজন সম্রাট বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নি, বিরাট সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। হিট্টি যথার্থই বলেন– "বিশৃঙ্খলতার মধ্যে মুয়াবিয়া শৃঙ্খলা আনয়ন করেন, এবং একটি শক্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।"

প্রশাসনিক পুনর্গঠন ঃ

ঐ সমস্ত বিদ্রোহ দমনের পর মুয়াবিয়া নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল

পরিবর্তন করেন। একদিন হযরত অবুবকর যেমন বুঝতে পেরেছিলেন—আরবগণকে বিশ্ব বিজয়ের পুর্বে নিজেদেরই আরবকে জয় করতে হবে। তেমনি দুরদর্শী মুয়াবিয়া বুঝতে পেরেছিলেন--সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলে সাম্রাজ্য বিস্তার বহু দুরের কথা, রাজ্য রাখাই দুরূহ হয়ে পড়বে। মুয়াবিয়ার অন্য একটি অসাধারণ গুণও ছিল—মানুষ চেনার শক্তি, যোগ্য ব্যক্তিকে তিনি অতি সহজেই চিনে নিতে পারতেন, এবং সেইভাবে কাজেও নিয়োগ করতেন। তাঁর সফলতার মূলে এটাও কিছু কম ছিল না। নচেৎ প্রাথমিক পর্যায়ে মুয়াবিয়ার পক্ষে ঐ বিরাট রাজনৈতিক ও সামরিক জয় সম্ভব হত কি না কে জানে। তাই হিট্টি বলেন—"খলিফা মুয়াবিয়ার সাফল্যের মূলে তাঁর চারিপার্শ্বের অনুচরবর্গের অবদানও কম ছিল না, বিশেষ করে উর্বর মিশরের শাসনকর্তা আমর-ইবন-আল-আস্, বিদ্রোহী বসরার শাসনকর্তা জিয়াদ ইবন-আবিহ্, এবং বিক্ষুব্ধ কুফার শাসনকর্তা আল্ মুগীরা-বিন-শুওবাহ। এই তিন জন এবং স্বয়ং মুয়াবিয়া আরব মুসলমানদের চারটি রাজনৈতিক মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত।"

আরবের তিন রাজনৈতিক মেধা :

আল্-মুগীরা :

তায়েফের অধিবাসী মুগীরা মহানবীর সময় থেকেই একজন যোগ্য শাসক ও দক্ষ কর্মীর পরিচয় দিয়েছিলেন। কর্মের দিক থেকে কর্মবীর হলেও হযরত আলী তাঁকে চরিত্রের বা নিষ্ঠার দিক থেকে কোন দিন পাত্তা দেন নি। তাই মুগীরা হযরত আলীর নিকট পাত্তা না পেলেও পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া কর্তৃক কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কুফাবাসীদের বিদ্রোহ দমনে মুগীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অস্থিরমতি কপট কুফাবাসীদের জন্য মুগীরা ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। এ ছাড়াও মুগীরা তাঁর জীবনে দুটি বিরল কাজের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথমটি ছলে-বলে-কৌশলে জিয়াদের মত ব্যক্তিকে মুয়াবিয়ার পক্ষে আনা, এবং দ্বিতীয়টি তাঁরই প্ররোচনায় ইমাম হোসেনকে তাঁর ন্যায্য খোলাফত হতে বঞ্চিত করে দুরাচার ইয়াজীদকে মুয়াবিয়ার উত্তরাধিকার নিযুক্ত করা। শুধু জিয়াদের সাথেই মুগিরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না, তায়েফের অসতী নারী জিয়াদের মায়ের সাথেও মুগীরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এই দিক থেকেও মুগীরা জীয়াদের মায়ের দ্বারাও জীয়াদকে প্রভাবান্বিত করেন। কিন্তু হযরত আলী এই সমস্ত ব্যক্তিদের তাঁর ত্রিসীমানায় কোনদিনই ঘেঁষতে দেন নি। এখানে তিনি ছিলেন আপোষহীন মহামানব। কোন লোভ কোন ভয় কোন

দিনই তাঁকে জীবনের নীতি পথে পরাস্ত করতে পারেনি।

জিয়াদ-ইবন-আবিহ্ ঃ

মুয়াবিয়ার শাসনকালে যে কয়েকজন আপন যোগ্যতা বলে খ্যাতির চিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, জিয়াদ তাঁদের অন্যতম। জিয়াদের বংশ পরিচয় মোটেই বলার মত নয়। তিনি ছিলেন মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের জারজ সন্তান। কেননা তাঁর মাতা ছিলেন তায়েফ বাসিনী অসতী নারী আবু সুফিয়ানের উপপত্নী। কিন্তু নীচ বংশে জন্ম হলেও কর্মদক্ষতায় বহু উচ্চে আরোহণ করেছিলেন। এই কর্মদক্ষতার জন্যই হযরত আলীও তাঁকে বসরার এবং ইসতাখরের (পাসিপালিস) শাসনকর্তার পদমর্যদা দান করেন। কিন্তু আপন মনের কোণে স্থান দিতে পারেন নি। যেহেতু হযরত আলী ছিলেন এক চরিত্রের মানুষ, এবং জিয়াদ ছিলেন অন্য চরিত্রের লোক। সুতরাং মনের মিল হয়নি। যার জন্যই জিয়াদ স্বভাবতই অস্বস্তি বোধ করতেন। অন্যদিকে মুয়াবিয়া কাজের লোকের সন্ধানে সদাই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর জীবনের নীতি ছিল শুধু কার্য উদ্ধার করা, সেটা যেমন করেই হোক। তাই চতুর মুয়াবিয়া মুগীরাকে চর নিযুক্ত করলেন। কুকাজে জিয়াদকে হস্তগত করার জন্য। নানা কারণে অবস্থা অনুকূলই ছিল। মুগীরা সফল হলেন। জিয়াদ মুগীরার প্ররোচনায় মূল্যবান উপঢৌকন সহ মুয়াবিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। মুয়াবিয়া তাঁকে আপন ভ্রাতা বলে স্বীকৃতি দান করেন, এবং বসরার শাসনকর্তাও নিযুক্ত করেন। গোলযোগপূর্ণ বসরার বিদ্রোহ দমনের জন্য জিয়াদ এক হাজার সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী সহ বসরায় হাজির হলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই শান্তি ফিরিয়ে আনেন। মুগীরার মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া তাঁকে এক সঙ্গে কুফারও শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজ্য সম্প্রসারণে জিয়াদ অমর কৃতিত্ব রেখে যান। কুফা ও বসরার অনাড়ম্বর মসজেদ দুটিকে বহু মূল্যবান মার্বেল পাথর দ্বারা আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলেন। জিয়াদ-ইবন-আবিহ্ শব্দের অর্থ—জিয়াদ তাঁর (মুয়াবিয়ার) পিতার পুত্র।

জিয়াদ শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরতার পরিচয় দেন, যার ফলে সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারীরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জিয়াদ তার সেনাবাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি ভাগে বিভিন্ন গোত্রের মানুষকে স্থান দেন। তাঁদের দলপতি নির্বাচনের ভার ছিল সরকারের হাতে। দেশকে শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার বেদুঈনকে খোরাসানে প্রেরণ করেন।

আমর ইবন-আল-আস ঃ

আমর ইবন-আল-আসকে উমাইয়া রাজত্বের দ্বিতীয় বা পরোক্ষ প্রতিষ্ঠাতা বললেও উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠায় আমর-এর অবদানকে অতিরঞ্জন করা হবে না। কেননা এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমরের কূটনৈতিক তৎপরতা ব্যতীত মুয়াবিয়া কোন দিনই উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। হযরত আলীর সিফফিনের যুদ্ধের নিশ্চিত জয়কে আপন শঠতা ও ধূর্ততা দ্বারা কূটনৈতিক চালে পরাজয়ে পরিণত করলেন আমর, দুমার মীমাংসায় আমর যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় রেখে মুয়াবিয়াকে সাহায্য করেন, হযরত আলীকে আঘাত হানেন, তার কোন তুলনা হয় না। হযরত ওমরের সময়েও আমর মিশর দখল করে সামান্য খ্যাতি অর্জন করেন, ফুস্তাতে নতুন রাজধানী স্থাপনও তাঁরই প্রতিভা প্রসূত কাজ, পরে তিনিই মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হযরত ওসমানের সময়ও তিনি তথাকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পরে চতুর মুয়াবিয়ার সাথে কপট আমর হাতে হাত মিলিয়ে হযরত আলীর তথা ইসলামের প্রকৃত খেলাফতের ও ইসলামি গণতন্ত্রের চির যবনিকা টানলেন।

ধূরন্ধর মুয়াবিয়া কোনদিনই ধূর্ত আমরকে বিরক্ত করেন নি। এই দুই বকধর্মী চরিত্রের মিলনটাও ঠিকই হয়েছিল। অনেক সময় দেশে এক সাথে কয়েকটি মহামানবের জন্ম লগ্ন দেশকে ধন্য করে, আবার অনেক সময় এর বিপরীত লক্ষণও লক্ষ্য করা যায়। মুয়াবিয়ার সময়টিও ঐ ভাবেই চিহ্নিত হতে দেখা যায়। যে কয়েকজন দুষ্ট মিলন মুয়াবিয়াকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিল, আমর তাদের দলপতি স্বরূপ। এই সম্পর্কে' মূইর বলে— "খেলাফতের পরিবর্তনে আমরের অপেক্ষা অপর কেহই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী, পরামর্শে ধূর্ত, কথায় কপট, কাজে কূটনৈতিক, ব্যবহারে রুক্ষ, আমরের বুদ্ধি বলেই মুরাবিয়া হযরত আলীর উপর জয়ী হন, এবং পরিণামে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।" আমর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন।

ইসলামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে ও ইসলামের খেদমতে স্বয়ং মহানবীর পার্শ্বে হযরত আবুবকরকে যেমন শোভা পায়, ঠিক তেমনি ভাবে উমাইয়া রাজত্বের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে ও উমাইয়া বংশের খেদমতে কপট মুয়াবিয়ার পার্শ্বে কুচক্রী আমরকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম দুজনের চেষ্টা ছিল ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, এবং পরবর্তী দুজনের চেষ্টা ছিল—ইসলামের

পরিপন্থী ও ব্যক্তি স্বার্থের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। তাই মুয়াবিয়া ও আমর ছিলেন ইসলামের মূল নীতির একেবারেই পরিপন্থী। মহানবীর চারজন খলিফাকে আমরা যেমন "খোলাফায়ে রাশেদীন" সৎপথে পরিচালিত খলিফাগণ বলে থাকি, তেমনি মুয়াবিয়া এবং তাঁর এই তিনজন পারিষদকে আমরা "খোলাফায়ে জালেমুন" বা "আইয়ামে জালেমুন" (অর্থাৎ অত্যাচারী খলিফাগণ বা অত্যাচারীদের) যুগ বলতে পারি। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন—"আমার বিশ্বাস কিয়ামতের (উত্থান) দিন যদি জালেমদের ফাছেক দল থেকে পৃথক করে দাঁড় করান হয়, তাহলে তাদের পয়লা কাতারে থাকবে বনু উমাইয়া। সে জালেমরাই ইসলামের এই আজাদীর গণতন্ত্রের মন্ত্রটিকে জুলুমের শিকারে পরিণত করল।"

মুয়াবিয়ার রাজ্যবিজয় (Achievements of Muawiyah as a conqueror) ঃ

মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন অন্যকে জয় করার পূর্বেই নিজেকে ও নিজ দেশকে কঠোর শাসনের ও শৃঙ্খলার শক্ত মাটিতে দাঁড় করাতে হবে, তিনি তাইই করেছিলেন। যোগ্য ব্যক্তিদের সমরে ও প্রশাসনে নিযুক্ত করে মুয়াবিয়া দূরদর্শী প্রশাসকের পরিচয় তুলে ধরেন। ফলে সমগ্র দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। এর ফলে শুধু রাজ্য সুসংহতই হয় নি, রাজ্য বিস্তারও লাভ করেছিল। হিট্টি বলেন—"মুয়াবিয়ার শাসনকালে ইসলামের খেলাফত শুধু সুসংহত হয় নি, বরং বহুগুণে ইহা সম্প্রসারিত ও হয়েছিল।"

রাজ্যবিস্তারে পূর্বাঞ্চল বিজয় ঃ

মুয়াবিয়া সিংহাসন আরোহণ করা মাত্রই রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নে যেমন মনসংযোগ করেছিলেন, তেমনি ভাবে রাজ্য বিস্তারেও মনোনিবেশ করেছিলেন। দূরদর্শী মুয়াবিয়া বুঝতে পেরেছিলেন রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য যেমন সীমান্তবর্তী বিদ্রোহী উপজাতিদের দমন করা একান্ত প্রয়োজন, তেমনি রাজ্যবিস্তারের জন্যও তাদের দমন করা একান্ত দরকার। সুতরাং তিনি তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সীমান্ত অঞ্চলে। ফলে আফগানিস্তান ও পারস্যের অধিকৃত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করে তথাকার বিদ্রোহী উপজাতিদের তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। ৬৬২ খ্রীস্টাব্দে হিরার বিদ্রোহ দমন ও দখল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। দুবছর পর অনুরূপভাবে পূর্বাঞ্চলে

বিদ্রোহ দমনে অভিযান প্রেরণ করা হয়। যার ফলস্বরূপ কাবুল, কান্দাহার, গজনী, বালখ্, বুখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ, ও ত্রিমিজ উমাইয়াদের পতাকাতলে এসে পড়ে। ৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুহল্লাবের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই ভাবে মুয়াবিয়ার শাসনকালে মুসলিম রাজত্ব পূর্ব ও দক্ষিণে সমরকন্দ বুখারা হতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

পশ্চিমাঞ্চল বিজয় ঃ

পূর্বাঞ্চলের মত পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ে মুয়াবিয়া সমান পারদর্শিতা ও কৃতকার্যতার পরিচয় দেন। হযরত ওমরের সময় আমর কর্তৃক মিশর বিজিত হয়, এবং ফুসতাত নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হতেই উত্তর আফ্রিকা জয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। অতঃপর খলিফা ওসমানের সময় মুসলিম সেনা বাহিনী বার্কা পর্যন্ত দখল করেন। এবং তদানীন্তন বাইজানটাইন সম্রাট গ্রেগীর পরাজয় বরণ করে বাৎসরিক কর দিতে বাধ্য হন। কিন্তু হযরত ওসমানের খেলাফতের শেষের দিকে পরিস্থিতি গোলযোগপূর্ণ হওয়ায় এবং হযরত আলীর খেলাফতের সময়ে গৃহযুদ্ধ ও ভীষণ গোলযোগের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে রোম সম্রাট পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলো পুনর্দখল করে তথাকার মুসলিম অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করেন।

পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মিশরের শাসনকর্তা আমর খলিফাকে একথা অবগত করার পর খলিফা সেনাপতি ওকবা বিন নাফিকে ১০ হাজার সৈন্য সহ ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। বীরবর ওকবা মুসলিম সেনা বাহিনীর শৌর্য বীর্যের চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়ে রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে পুনরায় উত্তর আফ্রিকাকে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বার্বারগণ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলে সেনাপতি ওকবা সামরিক ঘাটি রূপে কায়রোয়ান নামে একটি প্রসিদ্ধ শহর গঠন করেন এবং তথায় একটি সুবৃহৎ মসজেদও নির্মাণ করেন। গুরুত্বের দিক থেকে কায়রোয়ান উত্তর অফ্রিকা ও ইফ্রিকার রাজধানীতে পরিণত হয়।

মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে সেনাপতি ওকবার নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকা জয় ইসলামের বিজয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেখানে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পর সেনাপতি ওকবা নিজেই তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু বিজিত রাজ্যগুলো ঠিকভাবে সুসংহত করার পূর্বেই সেনাপতি ওকবা অভিযান হতে ফেরার পথে তাঁর বিশাল বাহিনীকে অন্যপথে পরিচালনা করে নিজের নিকট অতি নগণ্য সংখ্যক সৈন্য রেখে দেন। রোমান ও বার্বারগণ

এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাদের যৌথ হঠাৎ আক্রমণে সেনাপতি ওকবা পরাজিত ও নিহত হন। সেনাপতি ওকবার আকস্মিক মৃত্যুতে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম অভিযান ব্যাহত হয়, এবং মুসলমানগণ বার্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে উমাইয়া রাজত্বে খলিফা আব্দুল মালিকের সময় স্বানামধন্য সেনাপতি আব্দুর রহমান আপন ভুলের জন্য তুরসের যুদ্ধে রোমানদের নিকট পরাজিত না হলে সমগ্র ইউরোপ মুসলিম পতাকাতলে এসে পড়ত। জাতির দিক নির্ণয়ে এটাও ছিল এক চূড়ান্ত যুদ্ধ।

মুসলিম আলেকজাণ্ডার ঃ

ওকবার বীরত্ব আজও সর্বজনবিদিত। ৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে একদিন সেনাপতি ওকবা পশ্চিম দিকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করে সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী বেগবান জলধারার মত আফ্রিকার শহরগুলোকে একের পর এক জয় করে আটলান্টিক সাগরের তীরে উপনীত হলে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি তাঁর বাহিনীর দুর্বার গতিকে পথ রোধ করে দাঁড়ালে তিনি অতি আক্ষেপ ভরে বলে উঠেছিলেন—"হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যদি আজ সহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ রাশি আমার পথ রোধ করে না দাঁড়াত, তা হলে তোমার নামের মহিমা ও তোমার ধর্ম প্রচার করতে এবং তোমার শত্রুকে (অবিশ্বাসী) আঘাত করতে আরো বহু দেশ জয় করতাম।" ওকবার এই বীরত্ব ও কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেই ঐতিহাসিক গিবন তাঁকে মুসলিম আলেকজাণ্ডার (Muslim Alexander) উপাধিতে ভূষিত করেন। এই প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেন—"উত্তর আফ্রিকার হিংস্র ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি সমূহের সাথে সম্মুখ সংঘর্ষে আরবগণ যে অদম্য সাহস ও অপ্রতিহত উদ্দীপনা প্রদর্শন করে তা অন্য কোন দেশ বা কোন জাতির জন্য সম্ভব হয় নি।" সেনাপতি ওকবার সাহায্যে মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে উত্তর আফ্রিকা জয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রথম মুসলিম নৌ-বহর ঃ একথা নিঃসন্দেহে সকলকেই স্বীকাব করতে হবে, খলিফা মুয়াবিয়া মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে অসামান্য কৃতকার্যতার ছাপ রেখে গেছেন। আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ থাকাকালীন অবস্থায় কিছু দিনের জন্য বাইজান্টাইন সীমান্তে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ ছিল। যখন মুসলমানগণ বার্বারদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত, ঠিক সেই সময় গ্রীকগণ মুসলিম রাজত্বের কিছু অংশ দখল করে নেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁবা পরাস্ত হন। হযরত ওসমানের সময়ই মুয়াবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা থাকাকালীন সর্বপ্রথম একটি

শক্তিশালী ছোট নৌ-বহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই নৌ-বহরের সাহায্যে সাইপ্রাস, সিসিলি ও রোডস্ দখল করেন। এই দিক দিয়ে মুসলিম নৌ-বহরের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মুয়াবিয়ার নাম ইসলামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য অক্ষয় কীর্তি লাভ করেছে। তাই মুয়াবিয়াকে মুসলিম নৌ-বহরের জনক বলা হয়। তিনিই পরবর্তীকালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরাট নৌ-বহরের মোকাবিলা করার জন্য ৫০০ শত রণতরী সহ একটি শক্তিশালী মুসলিম নৌ-বহর তৈরি করেন। আব্দুল্লাহ-বিন-কায়েস প্রথম মুসলিম নৌ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই নৌ-বহরের সাহায্যে সিরিয়ার উপকূলভাগ সুরক্ষিত হয়।

কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ঃ

৬৬২ খ্রীস্টাব্দে মুসলিমগণ আর্মেনিয়ার রোমানদের পর্যুদস্ত করে আর্মেনিয়া দখল করেন এবং আকাবা নামক স্থানে একটি পোতাশ্রয় স্থাপন করেন। বহু দিন হতে মুয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করতেন। ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে আকাবার নবনির্মিত পোতাশ্রয় হতে রাজধানী কস্টান্টিনোপলে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন মুয়াবিয়ার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদ। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ, গ্রীকগণ 'গ্রীক অগ্নি' (Naptha) ব্যবহার করে শহর রক্ষা করতে সক্ষম হন। কিন্তু দীর্ঘদিন শহর অবরোধ করার ফলে মহামারী, খাদ্যাভাব ইত্যাদি নানা কারণে অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেবল মাত্র ৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের নিকটস্থ সিজিকাস (Cyzicus) দ্বীপ অধিকৃত হয়, এবং পরবর্তী ৭ বছর পর্যন্ত মুসলমানগণ এই দ্বীপ অধিকার রাখতে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে মুযাবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের রাজত্বকালে গ্রীকগণ পুনরায় ইহা পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। কিন্তু এই নৌবহর বার্থ যায় নি। বরং এর ফলেই ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌ-বাহিনীর তৎপরতার জন্যই কয়েকটি দ্বীপে মুসলিম পতাকা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে বলেন—কনস্টান্টিনোপল অভিযান মুয়াবিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল না। মূল লক্ষ্য ছিল দেশবাসীর বিদ্রোহমূলক মনকে অন্যদিকে পরিচালিত করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করা, যা সকল রাজা-বাদশাই করে থাকেন, তিনিও তাই করেছিলেন, এবং তাঁর কূটনীতি চরম সার্থকতা লাভ করেছিল।

উত্তরাধিকার ও মনোনয়ন, মুয়াবিয়ার মৃত্যু ঃ

দূরদর্শী মুয়াবিয়া ইসলামের খেলাফতের উত্থান-পতন শুধু লক্ষ্য করেন নি, তিনি এই অভিনয় মঞ্চে প্রধান নায়কদের একজনও ছিলেন, এমন কি

তাঁকে খেলাফতের পট পরিবর্তনের নাটকের প্রধান চরিত্র বললেও খুব বেশি বলা হবে না। তিনি লক্ষ্য করলেন হযরত ওসমানের শাহাদতের পর হতেই খেলাফতের ঝঞ্ঝাময় দিনগুলো, পরে তাঁরই কুচক্রে হযরত আলীর অবসান, এবং নিজের সিংহাসন লাভ ইত্যাদি। অতঃপর তিনি তাঁর অযোগ্য পুত্র ইয়াজীদকে তাঁর পরবর্তী খলিফা করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। সুযোগের অভাব হলো না। যে মোহাজেরীণ ও আনসারগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন, তাঁরা আজ অপাংক্তেয়, যে মক্কা ও মদীনা শহরে একদিন ইসলামের বিজয় পতাকাকে বিশ্বের দুয়ারে তুলে ধরেছিল, তাদেরও দীপশিখা আজ নির্বাপিত প্রায়। মহানবীর যে সমস্ত সত্যাশ্রয়ী যুগান্তর ও ক্ষণজন্মা সাহাবীগণ ছিলেন, তাঁরাও আজ প্রায় সকলেই ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। সুতরাং এইগুলোই ছিল সুচতুর মুয়াবিয়ার প্রধান সুযোগ। এই সমস্ত চিন্তা করে তিনি তাঁর বংশধরের মধ্যেই খেলাফতের পদকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে আপন অযোগ্য ও অপদার্থ পুত্র ইয়াজিদকে তাঁর পরবর্তী খলিফা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আপন জীবদ্দশাতেই জনগণের নিকট হতে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) আদায় করিয়ে হযরত হাসানের সঙ্গে চুক্তির কথাকে বেমালুম নোংরা কাগজে পরিণত করে এবং হযরত হোসেনের প্রতি চরম অবমাননা করেই পুত্র ইয়াজীদকে খেলাফতের উত্তরাধিকাররূপে সুনিশ্চিত করতে চাইলেন। এই কাজে তাঁকে দুজন বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন— জিয়াদ ও মুগীরা। ৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি জনগণের সম্মুখে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন, কিন্তু এর পূর্বেই তিনি গোপনে কিছুটা দালাল শ্রেণীর জনমত গড়ে নিয়েছিলেন। তাই আর কোন অসুবিধা হল না। দালালের দ্বারা (ট্রাকে না হলেও) উটের পিঠে দলে দলে ভাড়াটে মানুষ এসে তাঁর প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য জানাল।

অতঃপর মুয়াবিয়া এক সহস্র অশ্বারোহী সহ ভণ্ডামীর আশ্রয় নিয়ে উম্‌রা (ছোট হজ) পালনের নামে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন, উদ্দেশ্য ছিল মক্কা ও মদীনাবাসীদের ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্য লাভ করান। প্রথম তিনি মদীনায় গমন করেন। মদীনাবাসীদের সম্মুখে তিনি তাঁর প্রস্তাব রাখা মাত্রই সেখানকার প্রধান ব্যক্তিগণ— হযরত আলীর পুত্র হুসাইন, আবুবকরের পুত্র আব্দুর রহমান, ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ এবং জুবাইয়েরের পুত্র আব্দুল্লাহ মুয়াবিয়ার প্রতি অবজ্ঞা ভরে মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলেন; তখন বাকি সাধারণ জনগণের পক্ষে কিছু দালাল দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন সকলের আনুগত্য। এবার

মুয়াবিয়া মক্কার পথে রওনা হলেন। মক্কায় উমরার কাজ সমাধা করে মক্কাবাসীর সম্মুখে আপন আসল উদ্দেশ্যটিকে ব্যক্ত করলেন, তখন সর্বপ্রথম জুবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহ্ ব্রজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন উত্তরাধিকার মনোনয়ন ইসলামের বিরুদ্ধ নীতি, পূর্ববর্তী সকল উত্তরাধিকার সূত্রের বিরুদ্ধ রীতি। পরে সকলে এককণ্ঠে বলে উঠলেন, এই ব্যাপারে তিনটি নীতি আজ পর্যন্ত ইসলামে ও দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সুতরাং তাঁকেও ঐ তিনটির একটিকে মানতে হবে। তবেই আনুগত্যের কথা উঠবে, নচেৎ না। ঐ তিনটির প্রথমটি স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনয়নের ব্যাপারটি মদীনার জনসাধারণের উপর তুলে দিয়েছিলেন, মদীনার জনসাধারণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার তাৎপর্য ছিল—তখন মদীনা ছিল সমগ্র আরবের প্রাণকেন্দ্র। সমগ্র আরববাসী মদীনাকে মেনে নিয়েছিলেন। তাই তিনি মদীনাবাসীদের উপর পরবর্তী নেতা নির্বাচনের বা মনোনয়নের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, এর অর্থ তিনি পরবর্তী নেতা নির্বাচনের বিষয় সমগ্র দেশবাসীর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি—হযরত আবুবকর হযরত ওমরকে তাঁর পরবর্তী নেতা বা খলিফা মনোনয়ন করে জনগণের উপর ছেড়ে দেন। কিন্তু এই মনোনয়নের ব্যাপারে আবুবকরের সঙ্গে ওমরের কোন রকমেরই রক্তের বা আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং এখন যিনি বর্তমান খলিফা, তিনি যাঁরই নাম প্রস্তাব করেন, প্রস্তাবকের সাথে প্রস্তাবিত ব্যক্তির যেন কোন রূপ রক্তের সম্পর্ক না থাকে। তৃতীয়—হযরত ওমর এক নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে উত্তরাধিকার মনোনয়নের ভার ছেড়ে যান। মক্কার জনসাধারণ মুয়াবিয়াকে এই তিনটির যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তখন মুয়াবিয়া প্রমাদ গুণলেন। সবশেষে আপন হুকুম বলেই পুত্র ইয়াজিদকে খলিফার উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। এই ভাবেই রাজ-বংশ প্রতিষ্ঠা করে ৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে মহানবীর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের সমস্ত আদর্শকে একেবারেই জলাঞ্জলী দিয়ে পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ৬৮০ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে পরলোক গমন করেন।

মুয়াবিয়ার সমাধি ঃ

মুয়াবিয়া প্রায় ২০ বছরের (৬৬১-৬৮০) মত দীর্ঘকাল এক শান্তি ও সমৃদ্ধশালী রাজত্ব পরিচালনার পর মারা যান। রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর অবদান এতই অসামান্য ছিল যে, যখন উমাইয়া রাজত্বের ধবংসের পর আববাসিয়রা রাজ্য লাভ করেন, তখন উমাইয়া বংশের সকল রাজার সমাধিকে

একেবারেই ভূমিসাৎ করেছেন। কিন্তু মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় ওমরের সমাধিকে যথাযথ সম্মান দেখাতে তাঁরা ভুল করেন নি। এটা ছিল মুয়াবিয়ার কৃতকার্যতা ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় ওমরের মহানুভবতার প্রতি অকৃত্রিম সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি।

মুয়াবিয়ার চরিত্র ঃ

মুয়াবিয়ার প্রথম জীবনে ছিলেন মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ব্যক্তিগত সচিব, ও পরবর্তী জীবনে--খলিফা বা সম্রাট। মহানবী জীবনে অসংখ্য অমর বাণী রেখে গেছেন, মুয়াবিয়া ঐ সমস্ত বাণীগুলোর মধ্যে একটি মাত্র বাণীকেই তাঁর জীবনে অকৃত্রিম ভাবে প্রয়োগ করেছেন এই সংসারের সাম্রাজ্য লাভে। বাণীটি ছিল*—আদ্ দুনিয়া জু'রুন, লা ইয়াহ্ সেলো ইল্লা বেজুর, দুনিয়া প্রতারণার (বা ছলা-কলার স্থান, প্রতারণা) (বা ছলা-কলা) ব্যতীত একে জয় করা যায় না।" মুয়াবিয়ার সমগ্র জীবনের কার্যাবলী বা এককথায় তাঁর চরিত্রই মহানবীর এই কথাটির চির উজ্জ্বল উপমা ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মুয়াবিয়া তাঁর জীবনের চরম চক্রান্তের পরম ফলস্বরূপ খেলাফত লাভ করেছিলেন। এই দিকে তাঁর চরিত্রকে যে যেভাবেই দেখুন না কেন, প্রতিটি ঐতিহাসিক এক বাক্যে স্বীকার করেছেন--মুয়াবিয়া ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের এক কালজয়ী অনন্যসাধারণ প্রতিভা রাজা রূপে, শাসক রূপে, সংগঠক রূপে তিনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিরল। দেহের দিক থেকে তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও স্থূলকায় চেহারার অধিকারী, এককথায় বলিষ্ঠ দেহের মানুষ ছিলেন।

তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্পর্ক ঐতিহাসিক আল্ মাসউদী বলেন--"প্রভাতে ফজরের নামাযের পর তিনি নগরপালের নিকট হতে নগরের খবরা-খবর শুনতেন। অতঃপর কোরআন শরীফ তেলায়াত করতেন (পড়তেন)। পরে সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন। অতঃপর একজন কর্মচারী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রেরিত পত্রাদি পাঠ করে শুনাতেন। তারপর মন্ত্রীদের সাথে রাজকার্যের বিষয় আলোচনা করতেন। পরে মসজেদে মাকসুরার (একটি বেষ্টনীর) মধ্যে বসে সর্বসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। এই সময় আবার একটু প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন, এবং ঐ সময় সচিব তাঁকে বিভিন্ন চিঠিপত্র পড়ে শুনাতেন। তারপর দরিদ্র ব্যক্তিদের খাওয়ান হত! অতঃপর তিনি জোহরের (মধ্যাহ্ন) নামায পড়ে বিশেষ বিশেষ মানুষদের প্রবেশের অনুমতি

* মওলানা মোহঃ ইলিয়াস।

দিতে, যাঁরা বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ্ আসতেন। এরপর তিনি মন্ত্রীবর্গকে আবার উপদেশ দিতেন ও বহু সমস্যার মীমাংসা করতেন। আসরের (বিকাল) নামাযের পর তিনি সর্বসাধারণের জন্য আবার দরবারে বসতেন। এরপর সান্ধ্যাভোজ হত, এবং মগরেবের (সন্ধ্যা) নামায পড়তেন। এই সময় মন্ত্রীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তও গ্রহ্ণ করতেন। এশার (রাত্রির) নামাযের পর তিনি আবার একবার দরবারে যেতেন। পরে রাত্রির $^1/_3$ অংশ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজা বাদশার কাহিনী শুনতেন ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতেন। এবং সামান্য মিষ্টি খেয়ে শুয়ে পড়তেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী দেখে মনে হয়, তিনি খুবই নিয়ম মেনে চলতেন, যার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যেও আইন শৃঙ্খলার সুষ্ঠু রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়।

পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা মুয়াবিয়া চরিত্রের ভূষণ বলে পরিগণিত ছিল। তিনি যেমন নিষ্ঠুর ও কঠোর ছিলেন, তেমনি আবার উদার ও দয়ালুও ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের সর্বত্র বিনয় ও সংযমের পরিচয় রেখে গেছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। তাঁর রাজত্বে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করত। একবার ভূমিকম্পে খ্রীস্টানদের 'এডেসার' গীর্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তিনি তা আপন ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করেছেন। যে কোন ধর্মের যোগ্য ব্যক্তিকে তিনি যে কোন উচ্চপদে নিয়োগ করতে কোনদিনই কুণ্ঠা বোধ করতেন না। মানুষ চেনার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি গোঁড়া ধর্মীয় ভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেন। তাই ভনক্রেমার বলেন—"সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া উদার অন্তঃকরণ ও বড় মনের অধিকারী ছিলেন। বায়জানটাইন সীজারদের নিকৃষ্ট ধর্মান্ধতার তুলনায় খ্রীস্টানদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।" এই সমস্ত গুণের জন্যই সাম্রাজ্য গঠনে ও বিস্তারে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি।

পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা যেমন মুয়াবিয়া চরিত্রকে ভূষিত করেছিল, আপন ধর্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তেমন কিন্তু তাঁর চরিত্রকে অলংকৃত করতে পারেনি। তার পরধর্ম সহিষ্ণুতার অন্তরালে ছিল রাজ্যের প্রশাসনকে সুসংহত রাখা, এবং তাঁর আপন ধর্ম পালনের অন্তরালে ছিল বাহ্যিক ধার্মিকতা, লোক দেখান ধার্মিকতা, যাতে মুসলমানগণ তাঁকে অধার্মিক আখ্যা দিয়ে রাজ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি না করে। এই ছিল তাঁর ধার্মিক জীবনের সর্বসার কথা। তাই

তিনি প্রকাশ্যে লোক চোক্ষে শুক্রবারের খুৎবু পাঠ হতে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত (বার) নামাযও পড়তেন। কিন্তু এই লোক দেখান নামায সম্পর্কে কোরআনের কড়া সতর্কবাণী মানুষকে সাবধান করেছে—"সুতরাং ঐ সকল নামায আদায়কারীদের জন্য পরিতাপ যারা স্বীয় নামাযে অমনোযোগী, তারা শুধু (লোক) দেখানর জন্য (নামায) পড়ে।" কোরআন ঃ ১০৭ ঃ ৪—৬। তিনি পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও নিজ-ধর্মপালন উভয়কেই জগতের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের সর্বসার কথা—"নিশ্চয় কৃতকার্য তিনি, যিনি পবিত্র (নির্মল চরিত্র)।" ৮৭ ঃ ১৫। "যে নিজেকে পবিত্র করেছে, সেই সফলকাম হয়েছে, এবং যে নিজেকে কলুষিত করেছে, সেই অকৃতকার্য হয়েছে।" ৯১ ঃ ৯—১০। মহানবীর একান্ত সচিব মুয়াবিয়া যে এ কথাগুলো জানতেন না, তা হতে পারে না, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর জীবনে এগুলোকে স্থান দেন নি, সম্মান দেন নি, এমন কি অন্তরের স্বীকৃতিও দেন নি; জাগতিক কার্য উদ্ধারই তাঁর ধর্ম ছিল। পারলৌকিক কল্যাণ ও অন্তরের পবিত্রতার সাথে তাঁর ধর্মের কোন যোগ ছিল না। অথচ এইটাই বোধ করি সকল ধর্মেরই মূল কথা।

মুয়াবিয়ার চরিত্র বিচিত্র দোষ ও গুণের লালীভূমি। তিনি প্রথম জীবনে স্বয়ং মহানবীর ব্যক্তিগত সচিব। খলিফা আবুবকরের সময় সিরিয়ার জেলা শাসক, খলিফা ওমরের সময় সিরিয়ার গভর্নর, খলিফা ওসমানের সময় সিরিয়ার স্থায়ী গভর্নর। খলিফা আলীর সময় খলিফা পদের জন্য উচ্চাভিলাষী কুচক্রী মুয়াবিয়া। শাসক হিসেবে ছিলেন কঠোর, রাজনীতিবিদ হিসেবে ছিলেন দূরদর্শী, ধূর্ত, কপট, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এমন কি খুনী ও বিশ্বাসঘাতক। তবে তাঁর জীবনে কোথাও কোনদিন মদ-ভাঙ, জুয়া ও অবৈধ মেয়েছেলের সমাবেশ দেখা যায় না। এই দিক দিয়ে তাঁর ব্যক্তিজীবন কুলষিত ছিল না। তিনি অতি উচ্চাকাঙক্ষার বশবর্তী হয়ে অনেক কিছু করেছেন, এবং তাঁর অদম্য চেষ্টায় সে বাসনা-কামনা সফলতা লাভ করেছে। এই ব্যাপারে মদ ও মেয়েছেলে বিহীন চরিত্র তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। একদিন যে দোষে হাতে পাওয়া সাম্রাজ্যের পতন হল ইয়াজিদের হাতে, ইয়াজিদ অবলীলায় যেটা পেয়েছিলেন, অবহেলায় সেটা হারিয়েছিলেন। মুযাবিয়া চরিত্রে এটা ঘটে নি, সাধনায় যেটা পেয়েছিলেন, শক্ত হাতে সেটা রক্ষা করেছিলেন।

মুয়াবিয়া অনেক নুতন প্রথার প্রবর্তন করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের অনাড়ম্বর জীবনের পরিবর্তে অতি আড়ম্বরপূর্ণ জীবন, জাঁকজমক, বিলাস-

ব্যঞ্জন ও অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি। মসজেদ-মধ্যে তিনিই প্রথম মাকসুরার (নির্দিষ্ট ঘেরাস্থান) প্রবর্তন করেন। মুয়াবিয়ার পূর্বে কোন দিনই কেহই এমন কি মহানবীও নিজে শুক্রবার মসজেদে জুম্মার নামাযে বসে খুৎবা পাঠ করতেন না। মুয়াবিয়ার পূর্বে কেহই দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন নি, তাঁরা এটাকে অনৈস্লামিক কাজ মনে করতেন। মুয়াবিয়ার পূর্বে প্রত্যেকেরই সিংহাসন ছিল আল্লাহ্‌র ঘর মসজেদ, কিন্তু মুয়াবিয়া একে পারস্য ও বাইজানটাইন সম্রাটদের জাঁক-জমকপূর্ণ রাজদরবারে পরিণত করেন। তিনি নির্মম হস্তে গণতন্ত্রকে রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। মুয়াবিয়া সর্বশেষ চেষ্টা করেন মদীনার মসজেদে নববী হতে রসুলে আকরামের (দঃ) মিম্বরকে (বক্তৃতা দেওয়ার উচুঁস্থান) দামেস্কের মসজেদে স্থানান্তরিত করার। যদিও মুয়াবিয়া সক্ষম হয়েছিলেন মদীনার সিংহাসনকে দামেস্কে আনতে, কিন্তু মহানবীর পবিত্র পদ-স্পর্শ ধন্য সেই মিম্বরকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও আনতে সক্ষম হন নি। মদীনাবাসীদের ধর্মীয় তেজ ছিল এমনি অমোঘ ও অনিবার্য। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সম্মিলিত রাজসিংহাসনও মহানবীর পদ স্পর্শ ধন্য মিম্বরের নিকট অতীব নগণ্য বস্তুই ছিল তাঁদের জন্য।

একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করতে একটি মানুষের চরিত্রে যা কিছু থাকার দরকার, তা সবই লক্ষ্য করা যায় মুয়াবিয়া চরিত্রে। তাঁর সুযোগ্য শাসন নীতি, অসাধারণ বাগ্মীতা, সংগঠন ক্ষমতা, কূটনৈতিক মেধা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা সকল কিছু সম্মিলিতভাবে মুয়াবিয়াকে আরবের অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষের আসন দান করেছে। এই প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেন—"তিনি ছিলেন ধূর্ত, অসৎ তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন কৃপণ, অথচ আপন স্বার্থ সিদ্ধিতে অস্বাভাবিক উদার, যাবতীয় ধর্মীয় কাজে ছিলেন বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠাবান। কেননা যে কোনই মানবীয় বা ধর্মীয় নীতিই তাঁর কোন জাগতিক কামনা ও বাসনার চরিতার্থতায় কোন প্রকারেরই বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি তাঁর যাবতীয় পথের কাঁটাকে পথ থেকে অপসারিত করে অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে সাম্রাজ্যের বিস্তারে ও সুশাসনে আত্মনিয়োগ করেন।" সুতরাং মনুষ্যত্ব বা ধর্মতত্ত্ব এগুলো তাঁর কামনার নিকট কিছুই ছিল না। এই সমস্ত নানা কারণে ধর্ম-ভীরু মানুষ, মনুষত্বের পূজারী নরনারী, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ, গণতন্ত্রের পূজারী জনগণ, বিশেষ করে মহানবীর ভক্ত মুসলমানগণ মুয়াবিয়াকে ভাল চক্ষে দেখেন নি, এবং ঐতিহাসিকগণের প্রশংসা ভাজন অপেক্ষা

নিন্দাভাজনই বেশি হয়েছেন।

আজ আর মুয়াবিয়া নেই, মুয়াবিয়ার রাজতন্ত্র নেই, রাজসিংহাসন নেই, সিংহাসন পরিশোভিত পারিষদ নেই, অসংখ্য অশ্বারোহী আজ আর আরব-মরুপ্রান্তরকে প্রকম্পিত করে তুলে না, মহানবীর সাহাবাগণের সত্যাশ্রয়ী তিক্তময় ভাষণ আজ তাঁর অন্তরকে বিদীর্ণ করে তুলে না, আবার শত শত সভাকবিদের প্রশংসা কীর্তনে তাঁর অন্তর আর মহানন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠে না, গরিবের জন্য বাইতুল মালের অগণিত পয়সা তাঁর দুনিয়ার আকাঙক্ষার পথকে আজ প্রশস্ত করে না, আজ শুধু তার বিদেহী আত্মা দূর অতীতের আলোচনায় সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত। মহাকাল মহানবীর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের হত্যাকারী মুয়াবিয়া চরিত্রকে এইভাবেই চিত্রিত করেছে।

মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব :

মুয়াবিয়ার কৃতিত্বকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—(১) শাসন পদ্ধতিতে রাজনীতিবিদ মুয়াবিয়া, (২) প্রশাসনে শাসক মুয়াবিয়া, (৩) সমাজ সংগঠক মুয়াবিয়া।

(১) রাজনীতিবিদ মুয়াবিয়া (Achievements of Muawiyah as a politician) :

(ক) উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া : কূটনৈতিক কপটতার আশ্রয় নিয়ে মুয়াবিয়া নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সিফফিনের যুদ্ধ বন্ধ করতে চরম দুরভিসন্ধির সাথে বিশ্বাসঘাতক আমরের সাহায্যে দুমার মীমাংসায় হযরত আলীকে শুধু খেলাফত থেকে বঞ্চিতই করলেন না, বরং মহানবী প্রতিষ্ঠিত খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক পরিচালিত কোরআন ও হাদিসের নির্দেশিত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সমাধিও রচনা করে উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই অধ্যাপক মুইর বলেন—"দামেস্কে মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভ খেলাফতের সমাপ্তি ও রাজতন্ত্রের সূচনা করে।"

মনোনয়ন : পরবর্তীকালে জীবন সায়াহ্নে সেই একই পথ অনুসরণ করে মুয়াবিরা ছলে-বলে-কৌশলে ইমাম হাসানের সাথে চুক্তির চরম অসম্মান ও অবমাননা করে আপন অযোগ্য পুত্র দুরাচার ইয়াজিদকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করত অসাধুতার সকল হীনাশ্রয়ে আরব জাহানের বাহ্যিক আনুগত্য অর্জন করেন।

যোগ্যব্যক্তি : যাই হোক, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে,

এ জগতে মুয়াবিয়া একজন চরম যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যে ভাবেই হোক তিনি জাগতিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী বলেন— "আদ্‌দুনিয়া জু'রুন্ লা ইয়াহসেলু ইল্লা বিজ্ জুর। জগৎ প্রতারণার স্থান, প্রতারণা ব্যতীত ইহা জয় হয় না।" মুয়াবিয়ার জীবন এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমীর আলী বলেন—'ইমাম হাসানের পদত্যাগের পর মুয়াবিয়া ইসলামের একজন স্বঘোষিত শাসক হলেন, এবং হীন কদর্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইমাম হাসানের জীবনাবসান ঘটিয়ে অবিসংবাদী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র নৃপিত হলেন।" সকল দোষের সঙ্গে একথাও সকলকেই স্বীকার করতে হবে, অসাধারণ শক্তির অধিকারী না হলে মুয়াবিয়া মহানবীর একজন সামান্য সচিবের পদ থেকে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে সম্রাটের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হতেন না। ইসলামের মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেও মুসলমানদের তথা আপন বংশ উমাইয়াদের ৯০ বছরের জন্য এক বিশাল সমৃদ্ধশালী রাজত্বের সূচনা করে যান। হযরত ওমর ছিলেন ইসলামি খেলাফতের প্রধান নির্মাতা, ঠিক অনরূপভাবে মুয়াবিয়া ছিলেন, মুসলমানী সাম্রাজ্যের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তাই হিট্টি বলেন--"মুয়াবিয়া কেবল নতুন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, হযরত ওমরের পরে খেলাফতের (সাম্রাজ্যের) দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।"

(খ) সমর-নেতা মুয়াবিয়া ঃ আরবের সকল সম্রাটের জনক বা প্রথম সম্রাট ছিলেন মুয়াবিয়া। এই দিকে দিয়ে ইসলামি রাজত্বের সম্প্রসারণে মুয়াবিয়ার দান অনস্বীকার্য। বিশ বছর শুধু রাজত্ব করেই যান নি, যে সামরিক প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, তা তুলনাহীন। একটি সুশৃঙ্খলময় বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করে উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে যে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন, তা তাঁর সামরিক মেধার প্রত্যক্ষ পরিচয়। হযরত আলী ছিলেন বিরাট যোদ্ধা, এবং মুয়াবিয়া ছিলেন-- বিরাট সমর কুশলী। তাই হিট্টি বলেন—"যোদ্ধা হিসেবে মুয়াবিয়া হযরত আলী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হলেও সামরিক সংগঠক হিসেবে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।" তাঁরই নেতৃত্বে মুসলিম আলেকজাণ্ডার ওকবা-বিন নাফী উত্তর আফ্রিকা থেকে বায়জানটাইনদের বিতাড়িত করে কায়রোয়ানে প্রাদেশিক রাজধানী ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন।

(গ) নৌবহর প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া ঃ খলিফা ওসমানের খেলাফত কালেই বায়জানটাইন নৌবহরের মোকাবিলা করার নিমিত্ত বসুর-ইবন্ আবি অবতারের

নেতৃত্বে একটি নৌবহর গঠন করেন। পরবর্তীকালে এই নৌবহরকে আরো বৃহত্তর রূপ দান করে সেনাপতি ওকবা-বিন নাফির নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপ সিসিলি, রোড্স ও সিজিকাস দখল করেন। বিশাল পদাতিক বাহিনী দ্বারা যেভাবে বায়জানটাইন বাহিনীকে প্রতিহত করেন, ঠিক সমভাবেই তাদের সমুদ্রাভিযানকেও প্রশমিত করেন। অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপল অভিযান ব্যর্থ হলেও বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য তাঁরই সামরিক প্রতিভার প্রথম পরিচয়। সুতরাং সামরিক ক্ষেত্রে মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব ও অভূতপূর্ব অবদান তাঁকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠতম সমর নেতার সম্মানে ভূষিত করে।

(ঘ) রাজা ও রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিবিদ মুয়াবিয়া ঃ রাজা হিসেবে মুয়াবিয়ার চরিত্র ছিল অদ্ভুত। সমাজের দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিদের প্রতি যেমন তিনি কঠোর ও দৃঢ় ছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই সমাজের সোজা সরল মানুষের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয় ও উদার প্রকৃতির। এই দুই গুণের জন্য সমাজের আপামর মানুষের হৃদয়কে তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজত্বে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান ছিলেন। সুতরাং রাজা হিসেবে তিনি যে রাজোচিত মনোভাবের পরিচয় রেখে গেছেন, সেখানে মুয়াবিয়ার রাজচরিত্র প্রশংসার যোগ্য। এই গুণের জন্যই তাঁর রাজত্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত এবং রাজ্যও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছিল। তাই মুয়াবিয়ার রাজ-চরিত্র পৃথিবীর যে কোন শক্তিধর প্রথম শ্রেণী রাজার রাজ-চরিত্রের অনুপম দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

রাজনীতিবিদ ঃ রাজনীতিবিদ হিসেবে মুয়াবিয়ার জীবন চরম সার্থকতায় ভরে উঠেছিল। নিজ কার্য উদ্ধারের জন্য, সিদ্ধির জন্য, সফলতার জন্য, যে কোন প্রকারের সিদ্ধান্ত নিতে তিনি কোনদিনই দ্বিধা বোধ করতেন না। এমন কি জীবনের পথে কোন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করার জন্য বধ, খুন, জখম ও হত্যাও তাঁর নিকট কিছুই ছিল না। অবলীলাক্রমেই তিনি এসব করেছেন। জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য একদিন তিনি ইমাম হাসানের মত মানুষকেও হীন চক্রান্তে বধ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি, পরবর্তী সময়ে সেই হাসানের সাথে সম্পর্কিত সত্য ও সাধু চুক্তিকে লঙ্ঘন করতেও তাঁর মনে এতটুকু দ্বিধা জাগে নি। এক্ষেত্রে হযরত আলীর সেনাপতি মহাবীর মালিক আল্-আস্তরের গোপন প্রাণনাশ তাঁর নিকট জল-ভাত ও অতি সহজ বস্তুই ছিল। এইভাবে রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি শুধু জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বয়ং মহানবীর

দৌহিত্র থেকে শুরু করে বহুজনের প্রাণ নাশের সকরুণ সাক্ষ্য বহন করছেন। এই ছিল মুয়াবিয়া চরিত্রের একটি দিক, কিন্তু অন্য একটি দিকও ছিল, সেটা ছিল তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপরিসীম ধৈর্য, শান্ত ও ধীরমতি, পদক্ষেপে দৃঢ় চিত্ত, কার্য উদ্ধারে কখনো বা কঠোর, কখনো বা কোমল। এই সমস্ত নানাবিধ গুণের জন্যই রাজনীতিবিদ মুয়াবিয়া তাঁর রাজ্য শাসনে ও প্রজাবর্গের হিত সাধনে যথার্থ ভাবেই বিজ্ঞতার পরিচয় রেখে গেছেন। তাই তিনি রাজ্য ও রাজনীতিতে সার্থক রাজনীতিবিদ।

কূটনীতিবিদ ঃ মুয়াবিয়া শুধু একজন রাজা ও রাজনীতিবিদই ছিলেন না। একজন সার্থক কূটনীতিবিদও ছিলেন। চিরদিন আরব দুভাগে বিভক্ত ছিল– জনগণের দিক থেকে। দক্ষিণ আরবে ছিল মূল আরববাসী অর্থাৎ 'আরব বায়িদা' এবং উত্তর আরবে ছিল 'আরব আরিবা' অর্থাৎ যাঁরা পরবর্তীকালে (ভারতের আর্যদের মত) আরবে এসে আরবকে আপন দেশে পরিণত করেন, এবং সেখানকার ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন ভাষা ও সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করেন। এই দু দলে চিরন্তন বিরোধ ছিল। মহানবীর বিরাট ব্যক্তিত্বে এটা কিছুদিনের জন্য সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল। পরে আবার মাথা চাড়া দেয়। মুয়াবিয়া ছিলেন উত্তর আরবের মানুষ, তাই তিনি দক্ষিণ আরবকে তুষ্ট রাখার জন্য তার দক্ষিণ আরবের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ইয়াজীদকে ভাবী উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। এর ফলে দুই আরবের মানুষই মুয়াবিয়াকে পূর্ণ আনুগত্য দেখান। রাজ্য প্রশাসনে তাঁর এই কূটনীতি যথেষ্ট কাজ করেছিল। হিমারাইত ও মুজহারাইতদের চিরন্তন কলহকে তিনি আপন কার্যসিদ্ধির জন্য সব সময় জিইয়ে রেখেছিলেন, এ কার্য সকল ঐতিহাসিকের নিকটই অবিদিত। তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের করতলগত করতেও তিনি চরম কূটনীতিবিদের পরিচয় রেখে গেছেন।

(২) রাজ্য প্রশাসনে শাসক মুয়াবিয়া ঃ

("He was not only the first but also one of the best of Arab kings"– Achievements of Muawiyah as a Ruler and Administrator) :

(ক) শাসনকর্তা নিয়োগ ঃ মুয়াবিয়া শাসন ও রাজত্ব সম্পর্কে সর্বজনস্বীকৃত সত্য তিনি শুধু প্রথমই ছিলেন না, বরং সমস্ত আরব শাসকদের মধ্যে একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাধর শাসক বা রাজা ছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ও শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার নিমিত্ত তিনি তদানীন্তন যে তিনজন ব্যক্তিকে অতি নিকটে গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে

ঐতিহাসিকগণ ঐ তিন জনকে সেদিনের 'আরব রাজনৈতিক মেধা' বলে আখ্যায়িত করেন, যেমন মিশরের আমর ইবন্ আল আস্, বসরার জিয়াদ বিন আবিহ্, কুফার মুগীরা বিন শুবাহ্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। সেদিনের আরব-রাজনীতির গতি নির্ণয়কারীরূপে চারদিকে যে চারজন ক্ষণজন্মা রাজনীতিবিদকে পাওয়া যায়, তিন দিকে ঐ তিনজন এবং একদিকে স্বয়ং মুয়াবিয়া। তাই এই চারজন আরব রাজনৈতিক প্রতিভা দ্বারা সেদিনের আরব-রাজনীতির গতি নির্ণীত হয়েছে। এইভাবে রাজ্য রাজনীতিতে তিনি যে প্রজ্ঞার পরিচয় রেখে গেছেন, সেখানে সূক্ষ্ম ও সুদক্ষ শাসক হিসেবে মুয়াবিয়ার কীর্তি চির অক্ষয়। বংশের প্রতি তাঁর একটা পক্ষপাতিত্বের দোষ বা দুর্বলতা থাকলেও বৃহত্তর ইসলামি (মুসলিম) সাম্রাজ্য স্থাপনে তাঁর ধৈর্য, মেধা, দূরদর্শিতা, সঠিক সিদ্ধান্ত, সাধনা এক বাক্যে তাঁকে যে কোন শ্রেষ্ঠতম শাসকের ও সম্রাটের মর্যাদা দান করে। তাঁর শাসন নীতি আজও যে কোন আধুনিক শাসকেরও অনুসরণের যোগ্য। শাসনের মূল নীতি সম্পর্কে তাঁর মৌলিক অবদান মহাকালের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সারা পৃথিবীর ইতিহাসে মুয়াবিয়ার ন্যায় প্রভাবশীল দক্ষ শাসক খুবই কম লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র খেলাফত্‌টিকে উল্টাতে তাঁকে কম বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়নি। হযরত আলীর মত তুলনাবিহীন বীর ও মহামানবকে ধরাশায়ী করতে মুয়াবিয়া এই ধরার এমন কোন কৌশল নাই, যেটিকে চোখ ও কান বন্ধ করে প্রয়োগ করেন নি। যখন এই কাজে সার্থকতা লাভ করলেন ও চরম সফলতা এসে গেল দামেস্কের দরবারে, তখন তিনি আর কাল বিলম্ব করেন নি—এই পাকা শস্যকে সত্বর গোলাজাত করতে। বিচক্ষণ মুয়াবিয়া আরববাসীর নাড়ী-নক্ষত্র সবই জানতেন, কিসে আরব তুষ্ট, কিসে আরব রুষ্ট। সবই তাঁর নখ-দর্পণে। প্রথম আরব-রাজনৈতিক মেধাগুলোকে হাত করার জন্য, যেটুকু যা করার ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই তা সমাধান করেছেন। এই সমাধানেই তাঁর সফলতার সিংহভাগ এসে গিয়েছিল। বাকি ছিল শুধু আম-জনসাধারণ। তাদেরকেও হাত করা একান্ত প্রয়োজন। এ সত্যও তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞানালোকে সত্বর বিধৃত হয়েছিল। কেননা তিনি কোন দিনই ঐ তিন আরব-মেধাকে বিশ্বাস তো করতেনই না, অধিকন্তু ভালও বাসতেন না। তিনি জানতেন যে, যারা দুদিনের ক্ষণিক মোহে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে হযরত আলীর ন্যায় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে ত্যাগ করতে পারে, দুনিয়ার লোভে, ইহকালের প্রলোভনে পরকালকে প্রত্যাখান করতে পারে, বিশেষ করে মহানবীর প্রবর্তিত

নীতিমালাকে নোংরা কাগজে পরিণত করতে পারে, তারা জনগণের সামান্যতম সাহায্য পেলেই মুয়াবিয়ার মত মানুষকেও মুহূর্তের মধ্যেই ইতিহাসের সুদূর আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতেও পারে।

এই ধ্যান ও ধারণা, এই জ্ঞান ও গরিমা মুয়াবিয়াকে একদিন সাধারণ মানুষের সুখ ও দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি, সন্তোষ ও অসন্তোষ সম্পর্কে সম্যকভাবে সজাগ ও সচেতন করে তুললো। তিনি তাঁর দরবারী জীবনের শুভ সূচনাতেই প্রথম পদক্ষেপটি রাখলেন—কেবলমাত্র জনগণের জন্য। কি করলে, কোন পথে, কোন উপায়ে বিশাল জনসাধারণের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, এই ছিল তখন মুয়াবিয়ার সম্রাট হিসাবে, শাসক হিসাবে একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। তিনি কোনরূপই কালক্ষেপণ না করেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে এক সাথেই দরবারে ডাক দিলেন। বসলো আম-দরবার। ডাক দিলেন জনগণকে। সবার সম্মুখেই সকল শাসনকর্তাকেই চরম সর্তকবাণী শুনিয়ে দিলেন, আজ হতে অতি নির্মম হস্তেই শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন চলবে। বিচক্ষণ মুয়াবিয়া জানতেন যে—সমগ্র দেশে বা সমগ্র মানব সমাজেই শতকরা একজন কি দুজন দুষ্ট মানুষ থাকে। বাদবাকি সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এই দুজনকেই যথাযথভাবে পাক্‌ড়াও করতে পারলে অবশিষ্ট সকলেই শান্তিতে ও স্বস্তিতে দিন যাপন করতে পারবে। তাই তিনি অতীব কঠোর হস্তে ফরমান জারী করলেন—দেশের সকল দুরাচারকেই অনতিবিলম্বেই বন্দিগারে আনতে হবে। সারা দেশে বেজে উঠলো সুশাসনের দামামা, ঘোষিত হলো সুনীতির জয় গান। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ স্থান পেল কারাগারে। ফলে দেশের অসংখ্য নর-নরী শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সমগ্র দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চুরি নাই-চাপ্‌টা নাই। খুন নাই খারাবী নাই। দেশে যেন নিস্তব্ধ নীরব পারাবার। মুয়াবিয়া যেন সেখানে সরোবরে ফুটন্ত পদ্ম। গভীর রাত্রিতেও কোন পরমা সুন্দরী, কোন উর্বশী, কোন তিলোত্তমা একাকী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেও, কোন দুর্ধর্ষ দুরাচারেরও শক্তি বা সাধ্য ছিল না একটি আঙ্গুল হেলানর। এমনি শাসন ব্যবস্থা তিনি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন। যার ফলে মুয়াবিয়া জনগণের নিকট যেন ফেরেস্তার সম্মান লাভ করলেন। সমগ্র আরব সমাজে এরূপ কঠোর শাসন আর কখনও লক্ষ্য করা যায় না। সাগরের উত্তাল তরঙ্গরাশিকে তিনি শান্ত পারাবারে পরিণত করেছিলেন। বৈশাখীর ভয়ালরূপকে বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন, মহাবর্ষার প্রচণ্ড প্লাবনকে সুনির্দিষ্ট খালে পরিচালিত করতে সক্ষম

হয়েছিলেন। হযরত ওসমান হত্যার পর হতে হযরত আলী পর্যন্ত সমগ্র দেশে যে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, তা শুধু চিরতরে প্রশমিত ও প্রদমিতই হলো না, সেখানে দেখা দিল শাসনে-প্রশাসনে শান্তির সমীরণ ও সবুজ শালবন। দূরীভূত হলো যত আগাছা, যত অরাজকতা। তবে সত্যের অবমাননা না করলে খোলা মনে বলতেই হয়, মহামানব হযরত আলীর উৎখাতে একদিন মুয়াবিয়ার দক্ষ হাতগুলোর সুপ্ত বীজ অতি গুপ্তভাবেই সমাজে রোপন করেছিল, আজ সেই মুয়াবিয়ারই অন্য একটি সুদক্ষ হাত আপন স্বার্থেই ঐগুলোকে প্রকাশ্যে দিবালোকে দরবারী সভাতেই অগণিত জনগণের সম্মুখে শিকড় সহ একেবারেই তুলে ফেলে দিলেন।

তাই মুয়াবিয়া জগৎ-শাসনের ইতিহাসেও বিরলতম ব্যক্তিত্ব, বিরলতম দূরদর্শী, বিরলতম প্রজ্ঞা, বিরলতম প্রশাসক। একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে ও তার শৃঙ্খলাবিধানে, সমৃদ্ধি সাধনে, জনগণের নানা কল্যাণে, নানা মঙ্গলে যে জ্ঞান ও গরিমার পরিচয়, যে সাহস ও শক্তির পরিচয় বিশ্ব ইতিহাসে রেখে গেছেন, তা সত্যিই অলৌকিক না হলেও অভাবনীয় বটেই।

(খ) প্রশাসনিক রদবদল : মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী নীতিগুলোর একেবারেই রদবদল করে প্রশাসনে পূর্ণ রাজতন্ত্র কাঠামো কায়েম করেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের মজলিস-উস-শুরার বিলোপ সাধন করেন, গণতন্ত্রের পরিবর্তে মনোনয়নের প্রবর্তন করেন। এইভাবে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন ;তাই তাঁকে একটি রাজত্বের জনক (Father of a dynasty) বলা হয়।

(গ) কেন্দ্রীয় সচিবালয় : মুয়াবিয়া মজলিস-উস-শুরার পরিবর্তে কেন্দ্রে একটি সচিবালয় স্থাপন করেন, এই সচিবালয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যোগদান করে খলিফাকে নানা বিষয় অবগত করতেন, এবং খলিফার কাছ থেকে নানা বিষয়ে নির্দেশ গ্রহণ করতেন। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকেই আপন আপন কাজের জন্য খলিফার নিকট জবাবদিহি করতে হত। যার ফলে সমগ্র রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হত। যদিও কেন্দ্রীয় অফিসে আরবী ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রাদেশিক অফিসগুলোতে আপন আপন প্রাদেশিক ভাষাই প্রচলিত ছিল। এ সিদ্ধান্তটি ছিল দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের। মুয়াবিয়া তাকে অবিকৃত রাখেন। হযরত ওসমানের সময় থেকে দেশে যে অরাজকতার বা চরম উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছিল, মুয়াবিয়া তাকে দমন করতে সক্ষম হন। হিট্টি বলেন—"আপাতঃ

দৃষ্টিতে অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে তিনি একটি সুসংঘবদ্ধ মুসলিস সমাজ গড়ে তোলেন।"

(ঘ) ডাক বিভাগ ঃ মুয়াবিয়া তাঁর শাসন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম দুটি জিনিসের প্রবর্তন করেন, একটি ডাক বিভাগ, অন্যটি রেজিস্ট্রি বিভাগ। উট ও ঘোড়ার সাহায্যে তিনি এই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ডাক বিভাগ মারফত সরকারি বেসরকারি সকল পত্রই আদান প্রদান করা হত। ১২ মাইল অন্তর অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপিত হয়। এই বিভাগের প্রধানকে 'সাহিব-উল বারিদ' বলা হত। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে তিনি তাঁর প্রজাবৃন্দকে এই সুযোগ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, এটা তাঁর সুষ্ঠু শাসন নীতিরই পরিচয়।

(ঙ) রেজিস্ট্রি বিভাগ ঃ এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাও মুয়াবিয়ার প্রশাসনের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় বহন করে। কেন্দ্রীয় সচিবালয় থেকে যা কিছু প্রদেশে প্রেরিত হত, তার অনুলিপি খলিফার মোহর সহ রেজিস্ট্রিকৃত ভাবে পাঠান হত। এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনসাধারণ বহুলাংশে উপকৃত হন। এর প্রাধানকে 'দেওয়ান-উল-খাতেম' বলা হত।

(চ) রাজস্ব বিভাগ ঃ হযরত ওমরের সময় থেকেই রাজস্ব বিভাগ ভালভাবেই পরিচালিত ছিল। হযরত ওসমান কিছু স্বার্থান্বেষীর পাল্লায় পড়ে তাঁর কিছু কিছু পরিবর্তন করে বহু বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী হয়েছিলেন। মুয়াবিয়া পরবর্তীকালে এই বিভাগকে অতি সুষ্ঠুভাবেই পরিচালনা করেন। এই বিভাগের প্রধান 'সাহিব-উল-খারাজ' সরাসরি খলিফার নিকট হিসাব নিকাশের জন্য দায়ী থাকতেন।

(ছ) পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ ঃ মুয়াবিয়া কঠোর হস্তে পুলিশ বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে সমাজের সরল-সহজ-শান্তিপ্রিয় মানুষ অমাসাজিক দুষ্টু জনের শিকারে পরিণত না হয়। তাঁর এই কঠোর ব্যবস্থাপনার জন্য সমগ্র রাজ্যের মানুষ দিবারাত্রি নির্বিবাদে চলাফেরা করতে পারত। এককথায় মুয়াবিয়া-প্রশাসনে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' কথাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। গুপ্তচর বৃত্তি ছিল যাতে রাজ্যে কেউ কোন অন্তর্ঘাতী কাজ করতে না পারে এবং যদি কেউ করে, তাহলে সেটাকে যথাযথভাবে খলিফার কর্ণগোচর করাই ছিল এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। বর্তমানে যাকে আমরা I. B. বা C. I. D. বিভাগ বলে থাকি, এই বিভাগটি ছিল সেইরকম।

(জ) বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ঃ খলিফা হযরত ওমর বিচার বিভাগকে পৃথিবীর প্রশাসনের ইতিহাসে প্রথম ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য সাধারণ প্রশাসন

থেকে পৃথক করেন। এই প্রথাই পরবর্তীকালেও মুয়াবিয়ার দ্বারাও প্রচলিত থাকে। তাঁর সময়ে বিচারে মুসলমান ও অমুসলমান বলে এতটুকুও ব্যবধান ছিল না। এমন কি কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যাপারেও কোন ব্যবধান ছিল না।

(ঝ) নৌ ও সেনাবাহিনী গঠন ঃ মুয়াবিয়া তাঁর সুশৃঙ্খলিত ও সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনী ব্যতীত উমাইয়া রাজত্বের সুদৃঢ় ভূমিকা রচনা করতে পারতেন না। সিরিয়ার সেনা বাহিনীকে তিনি এমনি সুনিপুণভাবে গঠন করতে পেরেছিলেন, পরবর্তীকালে যাদের সাহায্যে তিনি অনেক অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। যথাসময়ে মুয়াবিয়া প্রাচীন গোত্র ভিত্তিক সেনাবাহিনীর পরিবর্তে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক বিশাল সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী গঠন করে তাঁর খেলাফতের সীমারেখাকে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা, পূর্বে সমরখন্দ, তাসখন্দ, বালখ, বুখারা, ও সিন্ধু নদীর অববাহিকা কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। তাঁর এই নৌ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে হিট্টি বলেন—"তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য সিরিয় সেনাবাহিনীকে ইসলামের যুদ্ধের ইতিহাসে একটি প্রথম সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত করেন।" তিনি আরও বলেন—"অন্যান্য খলিফাদের অপেক্ষা মুয়াবিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং রাজ্য ও রাজনীতিতে, শাসনে প্রশাসনে তিনি শুধু আরব রাজাদের মধ্যে প্রথমই ছিলেন না, শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন ছিলেন। মুয়াবিয়ার আপন উক্তি—"আমি আরব রাজাদের প্রথম।" একথার মর্যাদা তিনি রেখে গেছেন শাসনে শৃঙ্খলায়, শান্তিতে ও সমৃদ্ধিতে। অতএব মুয়াবিয়ার শাসন ও রাজত্বকাল ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

(৩) সমাজ সংস্কারে সংগঠক মুয়াবিয়া (Achievements of Muawiyah as an organiser) ঃ হযরত আলী ছিলেন সেনাপতি, মুয়াবিয়া ছিলেন সংগঠক। আলী ছিলেন মহামানব, মুয়াবিয়া ছিলেন সুচতুর মানব। আলী ছিলেন মহানুভব, মুয়াবিয়া ছিলেন মনুষ্যত্বহীন। আলী ছিলেন ধার্মিক, মুয়াবিয়া ছিলেন অধার্মিক। আলী ছিলেন ত্যাগী, মুয়াবিয়া ছিলেন ভোগী। আলীর দর্শন ছিল আত্মবিসর্জন, মুয়াবিয়ার দর্শন ছিল আত্মসচেতনায় ও আত্মস্বার্থে পূর্ণ।

উমাইয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও ইসলামি (মুসলিম) রাজ্যের সম্প্রসারক হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে মুয়াবিয়া চির সমাদৃত। তিনি অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তিবলে নিজ দেশকে জয় করে, দেশকে চরম অরাজকতার হাত

থেকে রক্ষা করেন, এবং সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে মুয়াবিয়া যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে যোগ্য শাসনকর্তা হিসেবে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তি স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু মুয়াবিয়া কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পছন্দ করতেন না। আপন পথের কণ্টক— যে কোন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে মুয়াবিয়ার নীতি ছিল হত্যা বা খুন। বস্তুত নিজের অবস্থাকে নিরাপদ করতে মুয়াবিয়া যে কোন অন্যায় কার্য করতে কোন প্রকারেই সঙ্কোচ বোধ করেতেন না। এই দিক দিয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী মুয়াবিয়া ছিলেন ধূর্ত, অধার্মিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানব। তাঁর নিষ্ঠুরতার নির্লজ্জ সাক্ষী নবীজীর প্রিয়তম দৌহিত্রের বিষ প্রয়োগে প্রাণনাশ, সেনাপিত মালিক আল-আসতারের জীবনাবাসন। এমন কি, আপন-উত্তরাধিকারী পুত্র ইয়াজিদের পথকে নিষ্কণ্টক করার জন্য সমগ্র আরব দুনিয়ার সম্মুখে নির্লজ্জভাবে তিনি হাসান ও হুসাইনের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। এইভাবে যে রাজবংশ তিনি প্রতিষ্ঠা করে যান, আপন বংশের মধ্যে তা নববই বছর স্থায়িত্ব লাভ করে। তাঁর এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে যে বস্তুটি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ছিল, সেটা তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা। এই সাংগঠনিক শক্তিকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে কখনও তাঁকে ধৈর্যশীল, কখনও বা বুদ্ধিমান, কখনও অধার্মিক, কখনও বা অমানুষ হতে হয়েছিল।

প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংগঠক মুয়াবিয়া প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন দেশকে শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে গেলে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন। দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে অনিবার্যভাবেই সুদৃঢ় সংগঠন থাকা দরকার, এবং এই সংগঠনকে গড়তে গেলে যোগ্য প্রশাসকের প্রয়োজন। তাই তিনি আরব রাজনীতির মেধা স্বরূপ আমর ইবন-আল-আসকে মিশরের ভাবী গভর্নর পদের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ দলভুক্ত করেন। পরে আমর ও মুগীরার সাহায্যে অন্য একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জিয়াদকেও হস্তগত করেন। জিয়াদ ছিলেন আবু সুফিয়ানের অবৈধ সন্তান, তাঁকে খুশি করে কার্য উদ্ধারের জন্য তিনি তাঁকে আপন ভ্রাতার মর্যাদা দান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এইভাবে মিশরের শাসনকর্তা আমর, বসরার শাসনকর্তা জিয়াদ ও কুফার শাসনকর্তা মুগীরার দ্বারা তিনি তাঁর সমগ্র দেশব্যাপী সংগঠনকে শক্ত হতে একটি সুরক্ষিত দুর্গ বা সেনানিবাসে পরিণত করেন।

মহানবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামিক গণতন্ত্র, সৎখলিফাগণ তাঁকেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু মুয়াবিয়া বংশ বা গোত্রীয় ভিত্তিতে একটি পার্থিব

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র আরব একদিন গোত্রীয় কলহে জর্জরিত ছিল, মহানবীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ববলে তা প্রশমিত হয়। কিন্তু পূর্বের সেই কলহ-বিদ্বেষ ও অরাজকতা মাথা চাড়া দিলে তিনি তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা দ্বারা এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের মাধ্যমে সমস্ত কিছুকে নির্মূল করেন।

আপন সংগঠনকে দ্বন্দ্বমুক্ত রাখার জন্য তিনি নিজে মুদারীয় গোত্রের মানুষ হয়েও প্রতিদ্বন্দ্বী হিমারীয় গোত্রের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে শ্রেষ্ঠ শাসক বা ন্যায়পরায়ণ বিচারকের পরিচয় দেন। এমন কি. তিনি তাঁর সংগঠনে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই হিমারীয় গোত্রের নেতা বাহাদালের কন্যা ময়মুনাকে বিবাহ করে ঐ গোত্রের জামাতার সম্মান লাভ করেন এবং তাঁদেরও আস্থাভাজন হন। পরবর্তীকালে এই মহিলার গর্ভজাত সন্তান পুত্র ইয়াজীদকে রাজ্যের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

মুয়াবিয়া আপন বংশ বা গোত্র-ভিত্তিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য একমাত্র খলিফা ওসমানের জামাতা মারওয়ানকে হেজাজের গভর্নর করা ব্যতীত তিনি তাঁর স্বগোত্রীয় কোন ব্যক্তিকেই প্রশাসনিক বা সামাজিক কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন নি। তিনি তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় বুঝতে পেরেছিলেন—আপন গোত্র একবার শক্তি স্বাদ পেয়ে গেলে তাদের আর দ্বন্দ্ব ও কলহ হতে মুক্ত রাখা যাবে না। ফলে প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। তাই প্রশাসনিক সংগঠনকে বাঁচাবার জন্য যেখানে কলহের প্রয়োজন সেখানে তিনি কলহ জিইয়ে রেখেছিলেন। মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ধারণা করেছিলেন, হয়তো এবার হিমারীয়গণ কালগর্ভে তলিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি আপন কার্যসিদ্ধির জন্য কোন গোত্রকেই কালগর্ভে তলিয়ে যেতে দেন নি, আবার শক্তির মাদকতায়, গর্বে ও অহংকারে আকাশকেও স্পর্শ করতে দেন নি। আপন বুদ্ধিবলে আপন কার্য উদ্ধারে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাদের চিরন্তন কলহকে। আমীর আলী বলেন—"মুয়াবিয়া মুদারীয়গণের সমর্থণের ওপর নির্ভর করলেও তাদের ও হিমারীয়দের মধ্যে মোটামুটিভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখেন, যাতে একে অন্যের ওপর অত্যাচর করতে না পারে, তার প্রতি তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন।" এই সমস্ত ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, শাসনে দূরদর্শিতা ও সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

শুধু রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠাতেই মুয়াবিয়ার সুনাম সীমাবদ্ধ নয়। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের কম সমাদর করেন নি। এককথায় মুয়াবিয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকেই যথার্থ সম্মান দান করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ-চেনা ছিল তাঁর চরিত্রের সাধারণ শক্তি। এই শক্তিবলেই তিনি একদিন শ্রেষ্ঠ সংগঠকদের একত্রিত করে চরম সফলতা লাভ করেন। ঐতিহাসিক শিবলী নোমানীর মতে, "তিনি বিখ্যাত খ্রীস্টান চিকিৎসক ইবন আসালকে আপন দরবারে আমন্ত্রণ করে হিমস প্রদেশের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন।" তিনি খলিফার নির্দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন, এ ছাড়াও, তিনি একজন প্রসিদ্ধ খ্রীস্টান কবি আল্-আখ্তালকে তাঁর অন্যতম সভাকবির মর্যাদা দান করেন। বহু ইউরোপীয়ান লেখকও এক বাক্যে স্বীকার করেছেন সংস্কারমুক্ত মন ও সাংগঠনিক প্রতিভা, উদারতা, সহনশীলতা, ধর্মীয় নিরপেক্ষতা, সৌজন্যমূলক ব্যবহারের দিক থেকে মুয়াবিয়াকে সমসাময়িক রোমান সম্রাট দ্বিতীয় কন্‌স্টান্‌স্ এবং গোটেনাস্ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করেছে।

মুয়াবিয়া সম্পর্কে শেষ কথা বলতে গেলে এ কথা বলতেই হয়, তাঁর রাজত্ব যেমন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধির সাক্ষী তেমনি অপরদিকেও বিদেশে রাজ্যবিস্তারের সফলতারও সমান সাক্ষী। প্রজাতন্ত্র ধবংস ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য মুয়াবিয়া দোষী সাব্যস্ত হলেও এ কথাও অনস্বীকার্য--তাঁরই প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খেলাফতের মাধ্যমে মুসলিম আধিপত্য বিশ্ব-দরবারে স্থানলাভ করে। তাঁর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কেনেথ ডব্লিউ মরগান বলেন, "খেলাফতের উত্তরাধিকার ও নির্বাচনের ব্যাপারে গৃহ-যুদ্ধ এড়াতে হলে বংশানুক্রমিক নীতি বলবৎ করা ব্যতীত আর কোন বিকল্প ছিল না।" হিট্টি বলেন, "তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য নম্রতা, উদ্যম, বিচক্ষণতা, ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার একটি অনবদ্য নজীর রেখে গেছেন।" উপসংহারে একটি কথা আমরা বলতে পারি, মুয়াবিয়া যতই অনৈস্লামিক, যতই অগণতান্ত্রিক কাজ করে যান না কেন, শাসক মুয়াবিয়া, সমরনায়ক মুয়াবিয়া ও সংগঠক মুয়াবিয়া ইসলামের ইতিহাসে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান দখল করে আছেন। তিনি আরব নৃপতিদের মধ্যে কেবল প্রথমই ছিলেন না তাঁদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠও ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮০—৮৩ খ্রীঃ)

কারবালার সকরুণ কাহিনী

কারবালা

বাঁচাইতে শিশুকুল ধরণী সম্বল
চেয়েছিলে বার বার একবিন্দু জল।
শুনিলো না পশুদল শিশুর ক্রন্দন
বুঝিলো না অমানুষ মায়ের রোদন।
নির্বিচারে পশুদল করিল কতল
চেয়েছিলো নারীকুল একবিন্দু জল।

লুটায়ে পড়িল কত শিশু-ফেরাস্তা
ওধারে পশুর দলে চরম মত্ততা।
বাঁচাইতে নারী জাত জগৎ সম্বল
চেয়েছিলে করজোড়ে একবিন্দু জল।

বাঁচাইতে শিশু যত পুষ্প সমকুল
চেয়েছিলে একবার ফোরাতের কূল।
বাঁচাইতে মনুষ্যত্ব মানব-সম্বল
চেয়েছিলে কিছু নয় একবিন্দু জল।

মনুষ্যত্ব মানবতা মরিল কখন্
মস্তকবিহীন হলো হোসেন যখন।
মোর নীতি মরণোত্তর এই কথা বলে
সজ্ঞানে সশরীরে স্বর্গে তুমি গেলে।

বাঁচাইতে মানবতা কর নাই খল
চেয়েছিলে সকরুণ একবিন্দু জল।
দেহ দিব প্রাণ দিব মাথা দিব হেথা
নানাজীর কথা মোর দেহ মনে গাঁথা।

দেখিয়াছি ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙ্গা গড়া
দেখিনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।
এ জগতের জন্ম হতে বড় যেটি ক্ষত
দুরাচার দুর্নীতির পাহাড় পর্বত।
শয়তানেরে কোন দুঃখে মারিব না লাথি
স্মরণ রাখিও আমি নবীজীর নাতি।

জীবিকা জীবন-লাগি করি বিশ্বাস
জীবনেরে করিলে না জীবিকার দাস।
দেহ মাথা সব দিলে দেখিল জাহান
রাখিতে অটুট শুধু নীতির বিধান।
তাঁবুতে বন্দী যত মানুষ উত্তম
শত্রুকুলে অমানুষ জীবের অধম।
বলেছিলে ধরো তুমি শত তরবারি
সাবধান! রক্ষা করো শিশু ও নারী।

চাও নাই রাজধানী রাজার সম্মান
বলেছিলে জল দিয়ে ভিক্ষা কর দান।
চেয়েছিলে ভিক্ষা শুধু বাঁচাতে শিশু
বুঝিলো না কোন কথা কোন নর-পশু
চাও নাই এজিদের অট্টালিকা খানি
চেয়েছিলে ফোরাতের এক কাত্‌রা পানি।

মানুষ জানে না তার উচ্চতা কত
আল্লাহর আরশ্‌ ভূমি মানুষ যত।

তুমি যে সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ মহীয়ান
নিজ হাতে নাহি কর নিজ অপমান।

মানুষ জানে না তার নীচতা কত
নরকের কীট হতেও কত সে নত। ৯৫ ঃ ৪-৫
শিবিরে যাঁরাই ছিলেন মানুষ উত্তম
শয়তান করিল তাদের তামাম খতম।

তুমি যে রসুলে-খোদা নবীর উম্মত্
হারিয়ো না কভু যেন আপন হিম্মত।
মুসলিম জাহানে এলো কত কারবালা
তবুও সাগর তারা নহে নদী-নালা
সংসারে সমরে ধরে আল্লাহ্‌র হিম্মত্
নিঃশেষ হবে না জেনো নবীর উম্মত্।

মুসলিম জাহানে এলো শত বালা
তবুও শোকের স্রোতে শীর্ষে কারবালা।
এত বড় সকরুণ এত মর্মভেদী—
আজিও শোকের সিন্ধু চলে নিরবধি।

—কাব্যকানন

।। প্রথম ইয়াজিদ ।।

প্রধান ঘটনাবলী

[ইমাম হাসানের সহিত চুক্তির অবমাননা—ইয়াজিদের সিংহাসন আরোহণ—কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কারণ ও উৎস—ইয়াজিদের সহিত ইমাম হোসাইনের বিরোধ—কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা ঃ কারবালার তাৎপর্য ও পরিণতি—ইয়াজিদের চরিত্র—মহররম ও কারবালা এক নয়।]

ইমাম হাসানের সহিত চুক্তির অবমাননা ঃ

প্রথম ইয়াজিদের পিতা মুয়াবিয়ার সিংহাসন আরোহণের সময় ইমাম

হাসানের সঙ্গে চুক্তি ছিল, মুয়াবিয়ার পর ইমাম হাসানের ছোট ভাই ইমাম হোসেন ইসলামি সাম্রাজ্যের খলিফা হবেন। কিন্তু ৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে মুয়াবিয়ার জীবনাবসান ঘনিয়ে এলে তিনি ঐ সম্মানিত চুক্তির চরম অবমাননা করে স্বীয় অযোগ্য পাপাচারী পুত্র ইয়াজিদকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। মহানবীর বংশধরগণের সঙ্গে মুয়াবিয়ার বহু খেলার মধ্যে এটি ছিল শেষ খেলা। এবং এই ইয়াজিদই ছিলেন মুয়াবিয়ার বংশধরগণের মধ্যে প্রথম ও শেষ খলিফা। মুয়াবিয়ার শত দূরদর্শিতা, কূটনীতি, ছলা-কলা-কৌশল, কপটতা, ধৃষ্টতা, ধোঁকাবাজী, বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানী, প্রতারণা, প্ররোচনা প্রভৃতি সকল কিছু একযোগেও মুয়াবিয়ার বংশধরগণকে ইয়াজিদ ব্যতীত অন্যজনকে বংশপরম্পরায়, খলিফা করতে পারে নি। মহানবীর সাক্ষাৎ সচিব হয়েও মুয়াবিয়া হয়তো শক্তির মোহে ও দম্ভে ভুলে গিয়েছিলেন পবিত্র কোরআনের অমোঘ বাণী--"হে রাজাধিপতি, তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, ও যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা প্রদান কর।" ৩ ঃ ৬

ইয়াজিদের সিংহাসনে আরোহণ ও পিতার পত্র প্রাপ্তি ঃ

৬৮০ খ্রীস্টাব্দে মুয়াবিয়া যখন মৃত্যু বরণ করেন, ঠিক সেই সময় শয্যাপার্শ্বে পুত্র ইয়াজিদ ছিলেন না, তিনি তখন শিকারের উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন পিতা পরলোকে গমন করেছেন, এবং তাঁর জন্য একটি মূল্যবান পত্র বা উপদেশবাণী রেখে গেছেন। পত্রটির বয়ান ঃ

"আমি কুরাইশ বংশের চার জন ব্যতীত তোমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আর অন্য কাউকে ভয় করি না। যাঁরা হলেন--আলীর পুত্র হুসাইন, উমরের পুত্র আবুল্লাহ, জুবাইরের পুত্র আব্দুল্লাহ ও আবুবকরের পুত্র আব্দুর রহমান। উমরের পুত্র আবুল্লাহকে ধর্মভীরুতা পেয়ে বসেছে, তিনি যদি সর্বশেষ মানুষ হন, তা হলে তিনি তোমার প্রতি আনুগত্যের শপথ নেবেন। আলীর পুত্র হুসাইন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লোক নহেন, ইরাকের মানুষ তাঁকে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য করবে। যদি তিনি বিদ্রোহী হন এবং তুমি তাঁর উপর জয়ী হও, তবে তাঁকে কোন মতেই ক্ষমা করো না, কেননা, তিনি নিকট আত্মীয়, আবার হযরত মহম্মদের বংশধর এবং একমাত্র উত্তরাধিকার। আবুবকরের পুত্র তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে যা করতে দেখবেন, তাই করবেন। তিনি শুধু নারী সাহচর্য ও খেলাধূলা পছন্দ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার জন্য সিংহের মত ওৎ পেতে বসে থাকবে, এবং শৃগালের মত তোমার বিরুদ্ধে ধূর্ত

আচরণ করবে এবং ক্ষমতা পেলে তোমাকে আক্রমণ করবেই, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইর। তুমি যদি তাঁকে কোন সময় বাগে পাও, কাবু করতে পার, সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। এবং তোমার প্রতি সর্বশেষ উপদেশ, তোমাদের লোকদের নিজেদের মধ্যে রক্তপাত হতে রক্ষা করার যথাসম্ভব চেষ্টা করবে।"

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কারণ বা উৎস ঃ (Main causes of tragedy of Karbala):

প্রথম কারণ ঃ মুয়াবিয়া ইমাম হাসানের সাথে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন—মুয়াবিয়ার পর ইমাম হাসানের ছোট ভাই হোসেন খলিফা হবেন। কিন্তু মুয়াবিয়া মৃত্যুর এক বছর পূর্বে (৬৭৯) এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আপন অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে তাঁর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। সুতরাং, মুয়াবিয়ার শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই কারবালা যুদ্ধের করুণ ঘটনাবলীর প্রথম ও প্রধান কারণ। মুয়াবিয়ার এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, অমনুষ্যত্ব ও অধার্মিকতা শুধু হাসান-হোসেনকেই বধ করল না, বধ করল ইসলামের প্রজাতন্ত্রকে, জন্ম দিল বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল মহানবীর প্রিয় শহর মদীনা। সেই মদীনা হতে রাজধানী দামেসকে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে রাজধানীর সাধু পরিবেশেরও পরিবর্তন হল। অসামাজিক কার্যকলাপে রাজধানী ভরে উঠল। একদিন মহানবী (সাঃ) জেহাদ ঘোষণা করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন বহু কুপ্রথা, যেমন—মদ্যপান, বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, জুয়া ইত্যাদি। আজ সেগুলি ইয়াজিদ-দরবারে সসম্মানে স্থান লাভ করায় মক্কা ও মদীনার সাধু পুরুষগণ মর্মে মর্মে আঘাত পেয়ে ইমাম হোসেনকে সমর্থন করেন।

তৃতীয় কারণ ঃ নবী নন্দিনী বিবি ফাতেমা তনয় ইমাম হুসাইন তাঁর মহানুভব বীর পিতা হযরত আলীর নির্ভীকতা, বীরোচিত স্বভাব, ন্যায়নিষ্ঠা, উদার ও অকপট ব্যবহার, ধর্মপ্রবণতা ইত্যাদি গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। উমাইয়া নৃপতিদের ন্যায় শঠতা ও ষড়যন্ত্রের কলা ও কৌশল তাঁর অজ্ঞাত ছিল। তাই সিডিলট বলেন, "উমাইয়া বংশধরগণ ষড়যন্ত্রমূলক কৌশলে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ইমাম হোসাইন সেই কৌশলটাই শুধু মাত্র জানতেন না।" অন্যদিকে ইয়াজিদ পিতার ন্যায় দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সুযোগ্য শাসক—কোনটাই ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁর চরিত্রও নিষ্কলুষ ছিল না। সেইজন্যও মক্কা-

মদীনার সকলেই ইমাম হোসেনকেই সমর্থন জানালেন।

চতুর্থ কারণ ঃ আবদুল্লাহ-ইবন-জুবাইর স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেনকে সর্বদা উত্তেজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে কুফাবাসীদের মিথ্যা প্রবঞ্চনামূলক প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখেও ইমাম মারাত্মক ভুল করেন, যা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহকে তরান্বিত করে।

পঞ্চম কারণ ঃ পিতা হযরত আলীর ভুলের পুনরাবৃত্তি হল পুত্র ইমাম হুসাইনের জীবনে, যার পরিণতি কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতায় কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা। সরলমতি ইমাম কথায় নির্ভর করে কুফা যাত্রা করলেন। কিন্তু কুফাবাসীদের চরম বেইমানী ও বিশ্বাসঘাতকতায় ইমামের চাচাত ভাই মুসলিম ও ইরাকের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাণ হারালেন। যার ফলশ্রুতি বা পরবর্তী ঘটনা কারবালার সকরুণ কাহিনী। সুতরাং কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসীদের বেইমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা অন্যতম কার্যকরী কারণ রূপে স্বীকৃত।

ষষ্ঠ কারণ ঃ বিশেষ ও সর্বশেষ কারণ হল, জগতের চির আদর্শ পুরুষ হযরত ইমাম হোসাইন রাজ্যের বিনিময়ে, পরিবার পরিজনের বিনিময়ে, আপন সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে, জীবনের বিনিময়ে, এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও নিজ আদর্শের বিরুদ্ধে ক্ষণিকের জন্যও অসত্য ও অসাধুতার সাথে কারবালার মরুপ্রান্তরে আপোস করেন নি। অবলীলায় অকাতরে মাথাকে দান করেছেন, কিন্তু তাকে নীচু করেন নি, নত করেন নি। কারবালা মরুপ্রান্তরে অসহায় ইমাম কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর নীতিকে, রক্ষা করেছেন তাঁর আদর্শকে, যা আজও সুরক্ষিত অসংখ্য মানবের হৃদয়দুর্গে। তাই ইমাম হোসাইন আজও বিশ্বব্যাপী আদর্শের প্রবাদ পুরুষ। জীবন বিপন্নময় অন্ধকার রাতে /সন্ধি কভু কর নাই অজ্ঞতার সাথে।

ঘটনাপ্রবাহ—ইয়াজিদের সঙ্গে ইমাম হোসাইনের বিরোধ ঃ মহানবীর দৌহিত্র এবং হযরত আলীর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসাইন ছিলেন ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, উদার, নম্র, সৎ, অকপট ও হৃদয়বান মানুষ। অন্যদিকে অত্যাচারী, অনাচারী, পাপাসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মদ্যপায়ী, নীতিজ্ঞানহীন, হৃদয়হীন। মুয়াবিয়ার মত দক্ষ রাজনীতিবিদ কি করে ইয়াজিদের মত অযোগ্য, অপদার্থ পুত্রকে ভাবী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করলেন তার সমর্থনে কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। ভন ক্রেমার ঠিকই বলেন—"মুয়াবিয়ার মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ

ব্যক্তির পক্ষে তাঁর অযোগ্য ও পাপাসক্ত পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনয়ন ঐতিহাসিকের নিকট সত্যিই দুর্বোধ্য।"

একদিকে ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই মদীনায় যারা তাঁর আনুগত্য স্বীকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন, তিনি তাঁদের নিকট হুকুমনামা পাঠালেন। উমর ও আব্বাসের পুত্রদ্বয় আনুগত্যের শপথ নেন। এবং আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইর ও ইমাম হোসাইন মক্কায় চলে যান। অন্যদিকে ইয়াজিদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তিকে আরব গোত্র ও ইমাম হোসাইন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে দামেস্কে প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইয়াজিদকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন—তাঁর উত্তরাধিকার প্রাপ্তি গণতন্ত্রবিরোধী ও মানবতাবিরোধী এবং নীতিজ্ঞানহীন পদক্ষেপ। ইসলামের জন্মভূমি ও শিশু ইসলামের পালনভূমি মদীনাকে তাঁরা ইসলামের প্রকৃত রাজধানী ও মহানবীর দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের খেলাফত লাভকে তাঁরা ন্যায়সঙ্গত দাবী বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁরা সকলেই দুরাত্মা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ও হযরত ইমাম হোসাইনের পক্ষে জনমত গঠন করতে থাকলেন। এই আন্দোলন এক ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। হিট্টি বলেন—"মৃত আলী জীবিত আলী অপেক্ষা বেশি কার্যকরী প্রমাণিত হল।"

একদিকে কুফাবাসীগণ দুনীর্তিপরায়ণ, অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠ ইয়াজিদের শাসনে ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় মদ্যপানে, পাপাচরণে একেবারেই অতিষ্ঠ হয়েই চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে উমাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে হোসাইনকে সমর্থন করে বহু পত্র দিতে থাকেন, অন্যদিকে হোসাইন ইয়াজিদের ও উমাইয়া সরকারের প্রতি শুধু আনুগত্য প্রকাশেই অনিচ্ছুক ছিলেন না, তিনি তাঁদের অনাচারী সরকার ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ খুঁজলেন। তাই তিনি এতে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ বোধ করলেন। কিন্তু ইমাম হোসাইনের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই অবস্থা ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ না করে ইমামকে কুফা রওনা হতে বার বার নিষেধ করেন, কেন না তাঁরা জানতেন—কুফাবাসীরা কত অস্থির, কত চঞ্চল, কত চটুল, এবং এই কুফা বাসীরাই একদিন ইমামের পিতা হযরত আলীকেও সিফফিনের যুদ্ধে পথে বসিয়েছিলেন, সেই অবিশ্বাসী কুফাবাসীদের উপর বিশ্বাস না করার জন্য সকলেই ইমামকে অনুরোধ করেন। শুধু মাত্র আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আপন প্রতিদ্বন্দ্বী পথের কাঁটাটাকে অপসারিত করার জন্যই হোসাইনকে কুফা যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন।

এই অবস্থায় হোসাইন কুফার অবস্থা জানার জন্য আপন চাচাত ভাই মুসলিমকে কুফায় প্রেরণ করেন। মুসলিম কুফা শহরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হানির ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মোটামুটি জানতে পারলেন অবস্থা ইমামের অনুকূলেই। বহু কুফাবাসীদের সাথে আলোচনান্তে তিনি ইমামকে কুফায় আসার জন্য গোপন পত্র পাঠালেন। ইতিমধ্যে অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসীদের দ্বারাই কুফাবাসীদের গোপন কথা ইয়াজিদের কর্ণগোচর হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ জিয়াদের পুত্র উবাইদুল্লাহকে কুফার শাসনকর্তা করে পাঠালেন। উবাইদুল্লাহ কুফা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম ও হানিকে তলব করেন, এবং উভয়কেই প্রকাশ্য দরবারে অতি নৃশংস ভাবেই হত্যা করেন। তখন বিশ্বাসঘতক কুফাবাসীরা একেবারেই নীরব। এই সময় তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই হত্যাকাণ্ডকে রুখে দিতে পারত। কিন্তু চপলমতি কুফাবাসীর অতি উৎসাহ ক্ষণিকের মধ্যেই এই ভাবেই নিস্তেজ হয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল। অকালে প্রাণ দিলেন হানি ও মুসলিম।

এদিকে ইমাম হোসাইন মুসলিমের পত্রে লিখিত অনুকূল অবস্থা চিন্তা করে নিজ পরিবারর্গ, কিছু আত্মীয়স্বজন ও কয়েকজন ভক্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে কুফার দিকে যাত্রা করলেন। সবে মাত্র নিজের জন্মভূমি আরব সীমা অতিক্রম করে ইরাকের মাটিতে পা দিয়েছিলেন-- দুঃসংবাদ বেগে ধায়। ইমামের কানে পৌঁছাল মুসলিম ও হানির হত্যা সংবাদ। তিনি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এগোবেন না পেছুবেন কোনটাই যেন ঠিক করতে পারছিলেন না। আরও বিস্তারিত সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন। ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসতেই থাকল, কুফার অবস্থা অগ্নিগর্ভ । হঠাৎ ঐ পথ দিয়ে সেকালের একজন মহাকবি ফারাজদক যাচ্ছিলেন, ইমাম তাঁকে গভীর আশংকায় জিজ্ঞাসা করলেন— কুফার অবস্থা কি ! কবি বলেন—"কুফানগরীর অন্তর আপনার পক্ষে কিন্তু এর তরবারি আপনার বিরুদ্ধে।" ইতিমধ্যে অনেক বেদুঈন সৈন্য ইমামকে ফিরে যেতে অনুরোধ করায়, তিনি ইতঃস্তত করতে থাকলে তাঁরাও সামান্য যে কয়েকজন ছিলেন, প্রায়ই সকলেই সরে পড়লেন। তখন ইমামের সাথে মাত্র ৩০ জন অশ্বারোহী ও ৪০ জন পদাতিক ব্যতীত আর কেউ থাকল না।

কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা (The tragedy of Karbala) ঃ আদর্শের পূজারী ইমাম কোনরূপেই বিচলিত না হয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চললেন। কুফা হতে যখন তিনি মাত্র ২৫ মাইল দূরে তখন তামিম গোত্রের

লোকেরা ইমামের গতি রোধ করলে ইমাম ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে তাঁবু ফেললেন। এমন সময় কুফার শাসনকর্তা দুরাচার উবাইদুল্লাহ ইমামের বিরুদ্ধে উমর ইবন সাদকে ৪০০ অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন এবং পরে স্বয়ং উবাইদুল্লাহও ইমামের তাঁবু অবরোধ করেন। তখন ইমাম শত্রুপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর তাঁদের তিনটি প্রস্তাব দিলেন এবং যে কোন একটিকে গ্রহণ করার জন্যও অনুরোধ করলেন; (১) ইমামকে মক্কায় কিংবা মদীনায় ফিরে যেতে দেওয়া হোক ;(২) নতুবা তাঁকে ইয়াজিদের সাথে আলোচনা করার জন্য দামেস্কে যেতে দেওয়া হোক ;(৩) নতুবা তাঁকে তুর্কী সীমান্তে ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেওয়া হোক, যাতে এই মরুপ্রান্তরে কোন রক্তপাত না ঘটে।

কিন্তু কুফার শাসনকর্তা নরাধম উবাইদুল্লাহ তাঁর কোন প্রস্তাবেই রাজী হলেন না। তিনি মনে করেছিলেন ইমামকে তিনি বাধ্য করবেন আত্মসমর্পণে, কেননা তিনি মোটেই জানতেন না ইমাম চরিত্র কত কঠিন কত উন্নত। তাই উমরকে আদেশ দিলেন ফোরাত নদীর কূল বন্ধ করতে। ভেবেছিলেন ইমাম তৃষ্ণায় বাধ্য হবেন আত্মসমর্পণে। কিন্তু ইমাম সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও পর্বতের ন্যায় অটল রয়ে গেলেন। তখন উবাইদুল্লাহ সীমার নামক এক কুখ্যাত পামরকে উমরের নিকট পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন—ইমামকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় কুফায় হাজির করাতে। উমর এই নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইমামকে জোর পূর্বক বাধ্য করতে প্রস্তুতি নিয়ে ইমামের শিবির অবরোধ করেন। ইমাম যুদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। পরিবার আত্মীয়-স্বজনকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু কেহই ইমামকে ত্যাগ করে যেতে সম্মত হলেন না। স্বল্পসংখ্যক অনুচরসহ ও আত্মীয়স্বজনসহ ক্ষুধা-পিপাসা ইত্যাদি নানা শারীরিক ও অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় রাত্রি কাটালেন।

জারজ পিতার নরাধম সন্তান নরপশু উবাইদুল্লাহ ফোরাত নদীর কূল বন্ধ করল। নবীজীর প্রাণের নাতি বারবার অনুরোধ করলেন—তোমরা নদী তীর বন্ধ করো না। আমাদের পানি দাও। আমরা সকলেই অত্যন্ত পিপাসার্ত, আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, আমরা চরম পিপাসাতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরাশায়ী হয়ে যাবো। তোমরা আমাদের জল দাও। যখন কোন অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়-বিনয় কোন কিছুই কাজে এলো না, তখন মহাবীর হোসাইন আবার তাঁবু হতে বের হলেন, মহিলা ও শিশুদের ক্রন্দন আর সহ্য করতে না পেরে আবার নর-পশুদের নিকট গমন করলেন, জানালেন—সকরুণ

প্রার্থনা—আমাকে ও আমার পুরুষকুলকে জল দিতে হবে না, তোমরা আমাদের মহিলাদের বাঁচাও, তাদের একটু জল দাও। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি, তারা তোমাদের সিংহাসনের কোনদিনই দাবীদার হবে না। তারা তোমাদের শত্রু নয়, তারা তোমাদের মা বোনদের মতই অবলা, নিরপরাধ। তাদের একটু জল দাও, তারা পিপাসায় বড়ই কাতর স্বরে ছটফট করছে। বাঁচার মতো একটু জল দাও। প্রত্যেককে একবিন্দু জল দাও। মহাত্মা হোসেনের সকল আবেদন-নিবেদন, সকল রকমের কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ গেল। তিনি আবার তাঁবুতে গেলেন। আবার নরাধমদের নিকট ফিরে এলেন। এবার শুধু শিশুদের জন্যই করজোড়ে অনুরোধ করতে থাকলেন—তোমরা আমাদের জল দিও না। কিন্তু আমাদের শিশুদের একুট জল দাও, তারা চরম পিপাসায় তাদের মায়ের কোলে চিৎকার করছে। তারা কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তোমরা তাদের একটু জল দাও, তাদের বাঁচতে দাও, তারা আল্লাহ্র ফেরেস্তা তুল্য, তাদের বধ করো না। তাদের একটু জল দাও। জীবন দাও। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তারা আমার পাশে কি ভীষণভাবে ক্রন্দন করছে—শুধু একটু জলের জন্য, ফোরাত নদীতে যেতে দাও! তোমরাই নিয়ে যাও। একটু জল খেতে দাও। এই মরুভূমিতে তাদের জীবন দাও।

মহাত্মা হোসেন আকুল কণ্ঠে, ব্যাকুল চিত্তে যখন আকাশ-পাতাল ভেদ করছেন, তখনও নরাধমদের বুকের কোণে একবিন্দুও করুণার উদ্রেক হয় নি, তখন তারা অট্টহাসিতে মশগুল। তখন তারা হাততালি দিচ্ছে। একদিকে জীবন-মরণ ক্রন্দনের রোল, অন্যদিকে হাসির কলরোল। ধরণী যেন নিজেকেই ধিক্কার জানাচ্ছে। এ হেন কঠিনতম, পাষাণতম, পাশবিকতম পরিস্থিতিতেও মহামানব হোসেন মৃতপ্রায় শিশুদের জন্য আশা ত্যাগ করেন নি। তিনি একের পর একটি শিশুকে নিয়ে ঐ নরাধমদের নিকট আগিয়ে এলেন, ভিক্ষা করলেন—একবিন্দু জল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াজিদের পশুদল পিপাসার্ত মরণোন্মুখ শিশুর সকরুণ মুখে একবিন্দু জল দেওয়ার পরিবর্তে অবলা শিশুর বুকে বিঁধলো শাণিত তীর ও বর্শাঘাত। স্বর্গের শিশু-মানবগুলো পিতার কোলেই ধরণীতে লুটিয়ে পড়লো। ধরিত্রীর বৃক্ষ-লতা, পাতা, জীবজন্তু সকলেই যেন আকাশভেদী আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পাতাল, পাহাড়-পর্বত, এমন কি স্বয়ং আল্লাহ্র আকাশও যেন কেঁপে উঠলো। কাঁপে শুধু পশু-মানব ইয়াজিদের রাজ-দরবার—দামেস্কের রাজ সিংহাসন। বিচার দিন বলে যদি কিছু থাকে, সেদিন জগতের সকল হিংস্র জীবজন্তুই এক সুরে প্রার্থনা জানাবে—ঐ

নরকের কীটগুলোকে আমাদের দলভুক্ত করো না। আমরা ওদের অপেক্ষা অনেক উন্নতমানের। অতঃপর নারকীয় ঘটনারাশি ঘটতে থাকলো। যে মহান নবীজী, সমগ্র কোরেশকুল সমগ্র উমাইয়া কুলকে একদিন প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে সামান্য একটু কড়া কথা বলেও আঘাত দেন নি, যে নবীজি আবু সুফিয়ানের মত চিরশত্রুকেও অবাধে ক্ষমা করেছিলেন, যে নবীজী কত পাষণ্ডকে পাশে টেনে নিয়েছিলেন,—যারা সকলেই ছিল উমাইয়া বংশোদ্ভূত। সেই চিরকুখ্যাত উমাইয়া বংশের ধড়িবাজ ধাপ্পাবাজ আবু সুফিয়ানের বংশধর আজ নবীবংশকে ধরার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করতে একেবারেই বদ্ধপরিকর হলো। কিন্তু শয়তানের দল জানতো না যে, উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ান কতবার কত চেষ্টাই করেছিল—ধরার বুক হতে আল্লাহ্র নবীকে নিশ্চিহ্ন করতে, কিন্তু একদিন তারাই নিশ্চিহ্ন ও নির্বংশ হয়েছিল। কোরআন ঃ ১০৮ ঃ ৩।

মহাসমুদ্রের মহাতরঙ্গে
ঠেলিছে কে এই ভেলা
মনুষ্য জগৎ জানে না কি কেউ
কোন্ মহানের খেলা।
কোন্ নদীতে কখন জোয়ার
কোন্ নদীতে ভাটা
একটি বারও বলতে কারো
আছে কি বুকের পাটা।
বলিলেন হেসে জগৎ মাঝি
ছুটিছে আমার ভেলা
মহাসমুদ্রের মহাতরঙ্গে
সন্ধ্যা সকাল বেলা।
দাঁড়াও তোমরা আল্লাহ্র রশি
শক্ত হাতেতে ধরি'
মহাসমুদ্রের মহাতরঙ্গে
ডুবিবে না এই তরী।
বিশ্ব ডুবিলেও ডুবিবে না যাহা
আল্লাহ্র মহাকোরআন্

সেই আল্লাহর প্রিয়তম নবী
নবীজীর খানদান্।
কোথায় ইয়াজিদ, কোথায় মুয়াবিয়া
কোথায় সুফিয়ান যত
মহানবীজীর নামটি দেখ
পূর্ণচন্দ্রের মত।
শত কারবালা এক করিলেও
বুঝেনি অধম নর
ধরার মাটিতে ধবংস হবে না
নবীর বংশধর।

৬৮০ খ্রীস্টাব্দে, ১০ই অক্টোবর, ৬০ হিজরী, ১০ই মহরম মাস, সকাল বেলায় ইমাম তাঁর সামান্য কয়েকজন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে জগতের এক কল্পনাতীত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। একদিকে মহানবীর স্নেহধন্য নাতি ইমাম হোসাইন, অন্যদিকে ইয়াজিদের নরাধম সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ও উমর, একদিকে সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক ইমাম হোসাইন, অন্যদিকে অন্যায় ও অবিচারের প্রতীক উন্মত্ত পাপীদল, একদিকে আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত কয়েকটি প্রাণ মাত্র, অন্যদিকে সমরসাজে সজ্জিত বিরাট বাহিনীর বর্বর সেনাদল। কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা ও নীরবতা বিরাজ করছিল। একে মরুভুমি, অন্যদিকে শিবিরে একবিন্দু পানি নাই, তৃষ্ণায় নারী ও শিশুর দল হাহাকার করতে থাকল। ইমাম শত্রুপক্ষের নিকট শিশুদের জন্য সামান্য পানি প্রার্থী হওয়ার পর হতেই শত্রুপক্ষের অগণিত তীর ইমামের শিবিরে ও লোকজনের উপর পড়তে আরম্ভ করল। এইবার প্রথম ইমাম হোসাইনের ১০ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম শাহাদৎ বরণ করেন। পরে পিপাসার্ত ইমাম পুত্র আসগরকে কোলে নিয়ে পানির জন্য সামান্য অগ্রসর হওয়া মাত্রই আসগরও তীরবিদ্ধ হলেন। এইভাবে একের পর এক শিবিরের সকলেই প্রায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। পিপাসার্ত ইমাম সকলের শেষে নদীতীরে যাওয়ার চেষ্টা করলে শত্রুকুল তাঁকে ঘিরে ফেললেন। তিনিও শরবিদ্ধ হয়ে ক্ষুধায় পিপাসায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ভূপতিত হলে নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ সীমার ইমামের শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হলে ইমাম তাকে তাঁর গলার পরিবর্তে ঘাড়ের উপর আঘাত হানতে নির্দেশ দেন। এইভাবে ১০ মহররম কুখ্যাত সীমার কর্তৃক

একের পর এক ৭০ জনই শাহাদৎ বরণ করেন। একমাত্র শিশুপুত্র জয়নুল আবেদিন ব্যতীত পুরুষকুলের সকলেই শহীদ হলেন।

যুর্‌য়া বিন শরীফ্ বল্লম ও তলোয়ারের আঘাতে পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ মৃত্যু পথের যাত্রী অর্ধমৃত জ্ঞানহারা, বাকহারা নবীজীর চির আদরের নাতি, বিবি ফাতেমার নয়নের মণি শেরে-খোদার প্রাণাধিক পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ)-কে বধ করলো, পরে অন্য এক পাপাত্মা খাত্‌না বিন ইয়াজিদ আস্‌বাহী ইমামের মাথাটিকে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হলে, সিনান বিন নাখ্‌য়ী তাকে সরিয়ে দিয়ে ইয়াজিদ দরবারে মহা পুরস্কারের লোভে নিজেই ঐ মহাপাপ সমাধা করলো। এবং বিদেহী কাটা মাথাটিকে খাওলাকে দিল। ইন্না.......... রাজেউন।

পরে ৭০টি কর্তিত মুণ্ড এবং স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানদের বন্দী অবস্থায় কুফায় উবাইদুল্লার নিকট প্রেরণ করা হল। যখন রসুলে আকরমের দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের রক্তাক্ত শির উবাইদুল্লার পদপ্রান্তে হাজির করা হল, তখন কুফার আকাশে-বাতাসে শুধু একটিই রব প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—হায় হোসেন, হায় হোসেন। অসতী নারীর জারজ সন্তান জিয়াদের পুত্র সমগ্র মনুষ্যকুলের মধ্যে সাক্ষাৎ-শয়তান ইবলিস্—উবাইদুল্লাহ অতি তাচ্ছিল্যভাবে যখন ইমামের পবিত্র ছিন্ন-মস্তককে একটি ছড়ির দ্বারা নাড়াচাড়া করছিলেন, তখন একজন বৃদ্ধ সহাবী গগনভেদী আর্তনাদ করে বলে উঠলেন—" ধীরে, ওহে ধীরে! এইটি হযরতের দৌহিত্র, আল্লাহর কসম, আমি স্বচক্ষে রসুলে করীম হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র মুখদ্বারা এই ওষ্ঠদ্বয়ে বার বার স্নেহ-চুম্বন করতে দেখেছি"। বৃদ্ধের মুখ দ্বারা এই কথা সজোরে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুরাত্মা উবাইদুল্লার শরীর ভূমিকম্পের মত প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল, সত্যের ঘোষণা এমনি অনিবার্য। তাই আজিও ইয়াজিদ, উবাইদুল্লাহ, উমর ও সীমার প্রমুখ নরাধমদের উপর সমগ্র মানুষ্য জগতের অভিসম্পাত শ্রাবণের বারি ধারার মত ঝরছে। এই জন্যই গীবন বলেন,—"সেই দূরবর্তী যুগের আবহাওয়ায় হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য যে কোন কঠিনতম পাঠকের অন্তরেও সমবেদনার সঞ্চার করবে।"

পরে নরাধম উবাইদুল্লাহ হোসেনের ছিন্ন মস্তক ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে রাজধানী দামেস্কে প্রেরণ করলে ইয়াজিদ ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় অতি সত্বর ছিন্ন মস্তক প্রত্যর্পণ করেন, এবং কারবালা প্রান্তরে সকলকে সমাধিস্থ করা হয়। জীবিত শিশু ও স্ত্রীলোকগণকে ইয়াজিদ সসম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেন।

কারবালার করুণতম কাহিনীর অপূর্ব তাৎপর্য (The impact of Karbala) ঃ

আদর্শের জন্য আত্মাহুতি ঃ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র ইসলামের ইতিহাসের একটি করুণতম ঘটনা। এই ঘটনা সমগ্র মুসলিম জাহানে আজও শিহরণ জাগিয়ে তোলে। অসহায় ও নিরুপায় ইমাম হোসাইনের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের সাথে কারবালার মরুপ্রান্তরে যুদ্ধের নামে উমাইয়া সরকার যে নৃশংসতা ও বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল, সে কথা দাবানলের মত মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু মুসলমান নয়, সেদিন সমগ্র মানবকুল দুটি কথা জানতে পেরেছিল,—ইমাম হোসাইন ন্যায় ও সত্যের জন্য. নিষ্ঠা ও আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিলেন, তবুও অজ্ঞতার সাথে, অসত্যের সাথে, অসাধুতার সাথে আপোস করলেন না। কারবালার মরুপ্রান্তরে ইমাম হোসাইনের এই আত্মাহুতি জগতের সমস্ত রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদদের শিক্ষা দিয়েছে—সত্য, ন্যায় ও নিষ্ঠাকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়। এ জয়ের শেষ নাই, সীমাও নাই, তাই ইমাম আজও সকল আদর্শ নর-নারীর অনুশীলনের যোগ্যপাত্র। দ্বিতীয় কথাটি জানল—বলপূর্বক খেলাফত দখলকারী দুরাত্মা ইয়াজিদের বর্বর সেনাবাহিনী যুদ্ধের নামে অসম যুদ্ধে একটি অসহায় পরিবারের প্রতি কি ধরনের পশুবৎ আচরণ করল। এ জয় উমাইয়াদের চির কলঙ্কের জয় বলে পরিগণিত হল। আর ইমামের পরাজয় হল সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য স্থান-পাত্র-কাল ভেদে এক সুমহান শিক্ষা এবং আদর্শের জন্য আত্মাহুতি।

পতনের প্রধান কারণ ঃ কারবালার বিষাদময় কাহিনী ও শোকাবহ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষণিকের জন্য, কিছুদিনের জন্য ইয়াজিদের বর্বর সেনাবাহিনী যে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে ছলে-বলে-কৌশলে ইমাম পরিবারকে নিধন করল, পরবর্তীকালে মাত্র ৬০ বছরের মধ্যেই ঐ একই অস্ত্রে উমাইয়া বংশের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল। সুতরাং উমাইয়াদের এ জয় চূড়ান্ত পরাজয়ের নামান্তর ছিল মাত্র। কারবালার এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডকে সমগ্র মুসলিম জাহান রসুলে করিমের আদর্শ ও পরিবারের প্রতি পদাঘাত বলে গণ্য করল। যার ফলশ্রুতি ছিল সুদুর প্রসারী। সুতরাং উমাইয়াগণের যে ছলে-বলে-কৌশলে, যে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার কবলে পতিত হয়ে হাশিমীরা রাজত্ব হারাল, অচিরাৎ উমাইয়াগণও আপনাদেরই সেই আবিষ্কৃত অস্ত্রের শিকারে পরিণত হল। কারবালার প্রান্তর তাদের পতন তরান্বিত করেছিল।

জাতীয় বিপদের মর্যাদা ঃ আজও বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় কারবালার বিপদকে তাদের জাতীয় বিপদ বলে মনে করে থাকেন। তাই মুসলমান জনসাধারণ কোন গুরুতর বিপদ দেখা দিলে, তাঁরা একে কারবালার সাথে তুলনা করেন। এই কারবালাকে কেন্দ্র করেই সারা বিশ্বে পরবর্তী যুগে মুসলমান লেখক-লেখিকার চিন্তাধারায়-কাব্য-কবিতা ও সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্ভার গড়ে ওঠে। শিয়া সম্প্রদায় সমগ্র বিশ্বে এই উপলক্ষে সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী ধারার ন্যায় বুক চাপড়িয়ে নিজেদের শোক প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে লঙ্গরখানা খোলা, পবিত্র কোরআন তেলোয়াৎ, এবং কৃত্রিম যুদ্ধের অপূর্ব মহড়া নিতে দেখা যায়। এদিন বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান উপবাস ব্রত পালন করেন, বহুদানী ব্যক্তি গরিবের মধ্যে দানখয়রাত করেন, বহুজন গরিবকে আহার বিতরণ করেন। বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবাদৎ বা আল্লাহ্‌র উপাসনা করেন। এইভাবে একমাত্র কারবালার করুণ কাহিনীই মুসলমান সমাজে জাতীয় বিপদের মর্যাদা লাভ করেছে।

শিয়া সম্প্রদায় ঃ শিয়া আরবী শব্দ, এর অর্থ হল দল। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার সংঘাতে সিফফিনের যুদ্ধে আলীর বাহিনী দুদলে বিভক্ত হয়ে একদল চলে গেলে, এই দলকে সিয়াতই আলী (Shiat Ali) অথবা আলীর দল বা খারেজী সম্প্রদায় (দলত্যাগী) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কারবালার পূর্ব দিন পর্যন্ত এই দুদলের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কারবালার পর হতেই শিয়া ও সুন্নী নামে দুটি বিবদমান দল দেখা যায়। হিট্টি বলেন, "হোসাইনের রক্তে তাঁর পিতার রক্ত অপেক্ষাও অধিকতর শিয়া বীজ নিহিত ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১০ই মহররম শিয়া মতবাদের জন্ম লাভ ঘটে।" শিয়াগণের মূল বক্তব্য হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর একমাত্র উত্তরাধিকার হযরত আলী ও হোসাইন। তাঁদের মতে প্রথম তিনজন খলিফা হযরত আলীকে অন্যায়ভাবে খেলাফত হতে বঞ্চিত করেন। অপরদিকে সুন্নীগণ চার জনকেই ইসলামের ন্যায়ত খলিফা বলে মনে করেন। সুন্নীগণও উমাইয়া বাদশাদের অনাচার ও অত্যাচারকে যথেষ্ট নিন্দার চোখেই দেখেছেন। যাই হোক, ১০ই মহররমকে শিয়াগণ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শোক দিবস হিসেবে পালন করতে থাকেন। তাই কারবালার মরু-প্রান্তর জন্ম দিল শিয়া সম্প্রদায়ের। এবং এইভাবেই মুসলমানগণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন— শিয়া ও সুন্নী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমগ্র বিশ্ব-মুসলমানের ঐক্যকে বিনষ্ট করল কারবালার ঘটনাবলী।

শিয়াদের মধ্যেও আজ বহু দল-উপদল। এঁদের মধ্যে যাঁরা বার ইমামকে

মান্য করেন, তাঁদের 'ইমামা আসারিয়া' বলা হয়। এই বার জন ইমান হলেন ঃ
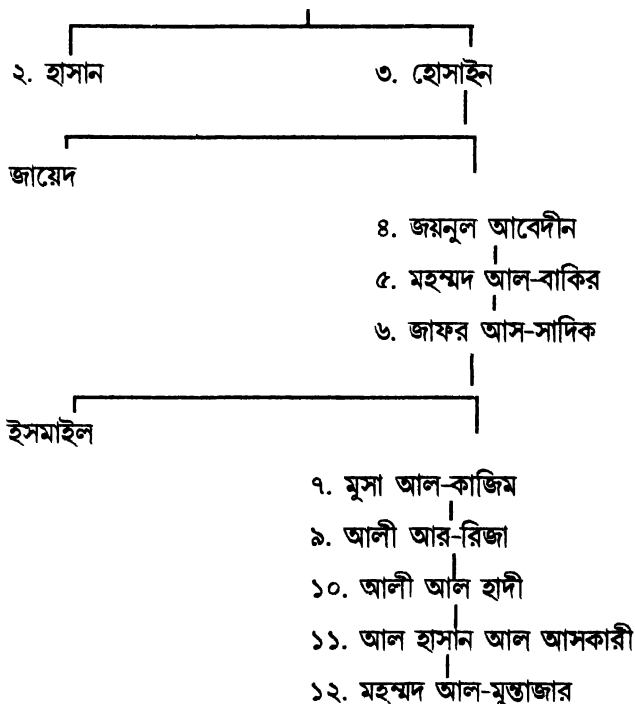
শিয়াদের মধ্যে একদল দ্বাদশ ইমাম মহম্মদ-আল-মুন্তাজার সম্পর্কে বলে থাকেন, তিনি সামাররায় অদৃশ্য হয়ে যান, কিন্তু এখনও তিনি জীবিত আছেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে একবার তিনি 'ইমাম মাহদী' নামে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং সমগ্র পৃথিবী জয় করবেন। তিনি সর্বযুগের অদৃশ্য ইমামরূপে সম্মানিত। পারস্যের সাফাবী শাসকগণ এই অদৃশ্য ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করতেন, এবং আলেম উলামাগণও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। একদল আছেন যাঁরা ইমাম জাফর আস সাদিকের কনিষ্ঠ পুত্র মুসা আল-কাজিমকে ইমাম মান্য না করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে ইমাম মনে করেন। কিন্তু ইসমাইল পিতার মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বেই মারা যান। তাই অনেকেই তাঁকে ইমাম বলতে অসম্মত। কিন্তু যাঁরা তাকে ইমাম বলেন, তাঁরা মনে করেন এই ইসমাইলই অদৃশ্য ইমাম। এঁদেরকে ইসমাইলী বলে অভিহিত

করা হয়। তাঁদের দাবী—কোরআনের গূঢ় রহস্য শুধু তাঁরাই জানেন। এই কারণে ইসমাইলী মতাবলম্বীগণকে বাতিনী ও গোপন বলা হয়।

পারস্য জাতীয়তাবাদ ঃ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাবলী ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তেমন কোন রাজনৈতিক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলেও পরবর্তী ঘটনা অতীব বিস্ময়কর। এ প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেন, "কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র চরম ত্রাসের সঞ্চার করে। এবং পারস্যে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ করে। এই চেতনা বোধ পরবর্তীকালে উমাইয়াদের ধবংস সাধনে আব্বাসীয়দের প্রভূত সাহায্য করে।" ঠিক এইরূপই মন্তব্য পোষণ করেন ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইস—"এই ঘটনার (কারবালার যুদ্ধ) কোন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এর পরবর্তী ফলাফল ছিল বিস্ময়কর।" এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় পরবর্তীকালে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আল মুখতারের ব্যর্থ বিদ্রোহ, আব্বাসীয়দের পক্ষে আবু মুসলিমের প্রচারণা এবং সর্বশেষে পারস্যে কট্টর শিয়া মতবাদের এক শক্তিশালী উন্মেষ ও সুদূরপ্রসারী উদ্ভব, এ সমস্ত কিছুই দুর অতীতের কারবালার রক্তমাখা মাটিতে জন্ম নেয়। পারস্যের মাওয়ালীগণও উমাইয়া বংশের পতন ও আব্বাসিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাকে তরান্বিত করতে কম অবদান যোগায় নি। এইভাবে কালগর্ভে কারবালার মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা জন্ম দিল পারস্য জাতীয়তাবাদের, যে জাতীয়তাবাদ একদিন উমাইয়া বংশের পতন ঘটায়।

প্রত্যক্ষ ফল ঃ কারবালার জঘন্যতম নিধন যজ্ঞ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে ইয়াজিদের প্রতি ধিক্কার উঠেছিল। যে কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইমাম সপরিবারে প্রাণ হারালেন, সেই কুফাবাসীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বসরাতে খারিজী দল ইমাম হত্যা প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হলেন। চারিদিকে যখন বিদ্রোহের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আবদুল্লাহ-ইবন-জুবাইর নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে অনেকেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ইয়াজিদ প্রমাদ গুণলেন। তিনি আব্দুল্লাহ-ইবন-জুবাইরকে দামেস্কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু আব্দুল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করে ইয়াজিদের দূতকে বন্দী করলেন।

মদীনা লুণ্ঠিত ঃ কারবালার যুদ্ধের পর দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা যায়। এর মধ্যে মদীনার বিদ্রোহ প্রথম ও প্রধান। মদিনাবাসীগণ ইয়াজিদের প্রতি অনাস্থা ঘোষণা করে তার প্রতীক স্বরূপ সকলেই মসজিদ নববীতে একত্রিত হয়ে নিজেদের গায়ের জামা-কাপড় বা চাদর দূরে নিক্ষেপ করেন। এটাই ছিল

তখনকার দিনে শাসকের প্রতি অবমাননা এবং অসম্মান দেখানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াজিদের শাসনকর্তাকে মদীনা হতে বিতাড়িতও করলেন, এমন কি, মদীনার উমাইয়াবাসীদের কিছুদিনের জন্য অবরোধ করে রাখা হয়। এই সমস্ত সংবাদ ইয়াজিদের কর্ণগোচর হওয়ামাত্রই ক্রুদ্ধ ইয়াজিদ মুসলিম-ইবন-উকবার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ৬৮৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে হাররা নামক স্থানে দু দলের ভীষণ যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধও ছিল সামরিক বাহিনীর সাথে অসামরিক মানুষের যুদ্ধ। অধিক সংখ্যকের সাথে অল্প সংখ্যকের যুদ্ধ। অতি স্বাভাবিক কারণেই স্বল্প সংখ্যক মদীনাবাসীগণ ইয়াজিদের বিশাল বর্বর সেনাবাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন। এই যুদ্ধে রসুলে আক্রম হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর বহু সাহাবী শাহাদৎ বরণ করেন। তিনদিন ব্যাপী ইয়াজিদের বর্বর বিশাল সেনাবাহিনী মদীনাবাসী নরনারীর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন করে, তা বর্ণনাতীত অচিন্তনীয়। যে শহরবাসী একদিন দীনের নবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁরা আজ আশ্রয়হীন হলেন। যে শহর একদিন মহানবীকে বক্ষে ধারণ করে সম্মানিত হয়েছিল, তা আজ অপমানিত হল, লাঞ্ছিত হল, লুণ্ঠিত হল, যে সম্মানিত সাহাবীগণ একদিন মহাবিপদে ধন-মান-প্রাণ সমস্ত কিছুকে ভুলে গিয়ে মহানবীর পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা আজ বর্বর সেনা-বাহিনীর নৃশংস শিকারে পরিণত হলেন। ইয়াজিদ বাহিনীর চরম নিষ্ঠুরতার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকল মহানবীর প্রিয় ও মুসলিম জাহানের পবিত্র মদীনা। এই প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেন, "যে শহর নবীকে আশ্রয় দান করেছিল, যা তাঁর জীবন ও নবুয়ত দ্বারা পবিত্র হয়েছিল, তা এক্ষণে জঘন্যভাবে অপমানিত হল। নবীর বিপদের সময় যারা পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা এক্ষণে জঘন্যতম নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হলেন।"

মক্কা অবরোধ ঃ মক্কায় আব্দুল্লাহ্-ইবন-জুবাইর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে সেখানকার সকলেই খলিফা বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। এদিকে ইয়াজিদের নির্দেশক্রমে তাঁর বিশালবাহিনী মদীনাকে লুণ্ঠন-ধবংস ও অপবিত্র করে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে সেনাপতি মুসলিমের মৃত্যু হলে হুসাইন-ইবন-নুমাইর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মক্কা অবরোধ করেন। মক্কায় মুসলমানগণ চিন্তাও করতে পারেন নি কোন মুসলিম সেনাবাহিনী মক্কার ক্ষতি সাধন করতে পারে। তাঁরা সকলেই অবাক বিস্ময়ে ইয়াজিদের বর্বর সেনাবাহিনীর তাণ্ডবলীলা লক্ষ্য করছিল।

আব্দুল্লাহ্-ইবন-জুবাইয়ের সামান্য সংখ্যক অনুচরবৃন্দ ইয়াজিদের ঐ বিশাল বাহিনীর নিকট নিজেদের বড়ই অসহায় বোধ করলেন। দুই মাস মক্কা শহরকে অবরোধ করার পর তৃতীয় মাসে সেনাবাহিনী পবিত্র কাবাকে ধবংস করার জন্য আগুন ধরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে দামাস্ক হতে দুরাচার ইয়াজিদের মৃত্যু-সংবাদ এসে পৌঁছালে মক্কা ও পবিত্র কাবাগৃহের উপর বর্বর সেনাদের তাণ্ডব-নৃত্য স্তব্ধ হয়ে যায় এবং পবিত্র কাবাগৃহ সম্পূর্ণ ধবংসের কবল হতে রক্ষা পায়। ভগ্নোৎসাহ সিরিয়া সেনাবাহিনী আব্দুল্লাহ্-ইবন-জুবাইরকে অনুরোধ করে সিরিয়া গিয়ে খেলাফতের ভার গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু তিনি মক্কা ত্যাগ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। বরং তিনি মক্কায় থেকে পবিত্র কাবাগৃহের ক্ষত-বিক্ষত রূপকে সংস্কারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। হিট্টি বলেন, "অবরোধের পর কাবা গৃহে অগ্নি সংযোজিত হয়, হাজার উল-আসওয়াদ—পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তর ত্রিখণ্ডিত হয়ে যায়, এবং কাবা-গৃহ ক্রন্দনরতা রমণীর ভগ্ন হৃদয়ের রূপ লাভ করে।" আল-বাখরীসহ সমস্ত ঐতিহাসিক এক বাক্যে স্বীকার করেন, দুরাত্মা ইয়াজিদ সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করে সাড়ে তিনটে জঘন্য কাজ করে গেছেন : (১) প্রথম বছর কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনকে নির্মমভাবে হত্যা, (২) দ্বিতীয় বছর পবিত্র মদীনা শহর লুণ্ঠন, (৩) তৃতীয় বছর পবিত্র কাবাগৃহে অগ্নিসংযোগ । এবং বাকি ছয় মাসে দরবারে আমদানি করেছিলেন বহু অনৈস্লামিক বস্তু ; যেমন—মদ্-ভাঙ, জুয়া, রেস, নাচ-গান, নর্তকী ইত্যাদি। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম তিনটির প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ, ভীষণ, বীভৎস ও বিষময়।

ইয়াজিদ-চরিত্র : সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করার পর ৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে ৪৩ বছর বয়সে ইয়াজিদ পরলোকগমন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ও অধার্মিক ছিলেন। নিষ্ঠুরতা, অধার্মিকতা, মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অপদার্থ ও অযোগ্য, মানুষ হিসাবে ছিলেন অমানুষ, মুসলমান হিসেবে ছিলেন সাক্ষাৎ শয়তান। তবে কারবালার হত্যাকাণ্ডের সাথে তিনি সরাসরি খুব একটা জড়িয়ে ছিলেন বলে মনে হয় না, কেননা, রাজধানী দামেস্ক কুফা হতে প্রায় ২০০ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় কি ঘটছে, সেটি তিনি হয়তো সম্যকভাবে অবগত ছিলেন না। তাই যখন ইমামের ছিন্ন মস্তক দামেস্কে পৌঁছাল, তিনি কিছুক্ষণের জন্য হতবাক বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এটা হয়তো তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা। পিতা মুয়াবিয়া যে চরিত্রের

অধিকারী ছিলেন, তিনি তা ছিলেন না। যাই হোক, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাতে কোনরূপেই তাঁকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করা যাবে না। কেননা, তাঁর মৌন সমর্থন না থাকলে দুরাত্মা উবাইদুল্লাহ এ কাজ কখনও করতে সাহস পেতেন না। এবং যদি তাঁর মৌন সমর্থন এ ব্যাপারে না থাকে তা হলে তিনি পরবর্তীকালে দুষ্কৃতকারীদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে না জানলেও সমগ্র ঘটনাটিতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল বা তাঁর পরোক্ষ ইঙ্গিতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।

বার্নার্ড লুইস বলেন, 'ইয়াজিদ রাজোচিত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এবং তাঁর পুত্র খালিদ গ্রীক বিজ্ঞানের অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ করেন।" ইবনে কাতিবের মতে, "ইয়াজিদ উদারপন্থী ও বাগ্মী ছিলেন।" পরিষ্কার নির্জলা মদেও যেমন কিছু স্বচ্ছ জলে মিশান থাকে, ইয়াজিদ চরিত্রে এগুলোও তেমনি ছিল। অসংখ্য অনৈস্লামিক কাজের দ্বারা তিনি শুধু ইসলামের মৌলিক আদর্শকেই ধ্বংস করে যান নি, সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া বংশকেও ধ্বংসের জন্য সহস্র শত্রুর জন্ম দিয়ে যান।

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ইয়াজিদ স্বর্গত পিতার পথ ভালভাবেই অনুসরণ করেছিলেন। পিতা মুয়াবিয়া হযরত আলীর সাথে সিফফিনের যুদ্ধের পূর্বে ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করেছিলেন। হযরত আলীর অনুরোধেও কর্ণপাত না করলে নিরুপায় আলী সিংহবেশে শৃগালকে চরম শিক্ষা দিয়েছিলেন। নদী যখন আপন আয়ত্তে এলো, তখন আবার ঐ শৃগালকে পানি ব্যবহারের অবাধ অনুমতি দিয়ে পুনরায় শার্দুলেরই পরিচয় দেন। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য– সিফ্‌ফিনের পূর্বাধ্যায়- হযরত আলী। পৃঃ ১১১)

একের মধ্যে তিন ঃ

মহররম ও কারবালা ঃ আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে মহররম ও কারবালার মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তাই মহররম বলতে কারবালা বা কারবালার করুণ ঘটনাবলী, এবং কারবালা বলতে মহররমকেই বোঝানো হয়। কিন্তু কারবালা ও মহররম মোটেই এক নয়। কেননা, মহররমের সময়কালের সাথে কারবালার সময়কালের আস্‌মান্‌-জমিন পার্থক্য ; আজ হতে প্রায় তিন থেকে চার হাজার বছর পূর্বে নবীবর হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সময়েও মহররমের নিশানা পাওয়া যায়, কিন্তু কারবালা সে

দিক থেকে অতি নবীন। কারবালার সময়কাল ১০।১০।৬৮০ খ্রীস্টাব্দ এবং ৬০ হিজরা মাত্র। সময়ের এই বিশাল ব্যবধান থেকেই বোঝা যায়, তারা এক নয়।

সফর ঃ মুসলমানী বছরের প্রথম মাসের নাম—মহররম। অতি প্রাচীনকালে এটা কোন মাসের নাম ছিল না। মুসলমানী যুগের বহু পূর্বে প্রাচীন মক্কাবাসীগণ তাঁদের বছরের প্রথম দুটো মাসকেই 'সফর' নামে ডাকতেন, একটি ছিল 'সফর-আওয়াল, অর্থাৎ প্রথম সফর এবং অন্যটি ছিল—'সফর সাণী' অর্থাৎ দ্বিতীয় সফর। 'জুল-হুজ্ব' আরবের পবিত্র মাস বলে পরিগণিত হত, এই মামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি নিষিদ্ধ ছিল। ঠিক অনুরূপভাবে দুটো 'সফর' মাসকেও তারা 'হারাম' বা পবিত্র মাস বলে গণ্য করতেন। পরবর্তীকালে কালক্রমে বছরের প্রথম এই দুটো 'সফর' মাসকে 'হারাম' (পবিত্র) বলে অভিহিত করতে করতে জনবরে একদিনে আপনা আপনি প্রথম 'সফর' মাসটিই শুধু 'হারাম' বলে পরিচিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এইভাবে আরবী বছরের প্রথম মাসটি 'হারাম' বা 'মহররম্' নাম ধারণ করে, এবং আজও তা প্রচলিত। সুতরাং সেদিনের সেই প্রাচীনতম 'মহররম' মাসের জন্মের সাথে আজকের নবীন কারবালার কোন যোগাযোগ নাই। তবুও উভয়ের মধ্যে এই মিলের কারণ কি? কেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিত হল? আমরা এই মিলকে coincide বা coincidence বলতে পারি, অর্থাৎ এদের মিলন যেন একই বিন্দুতে বা এদের সংগঠন একই সময়ে। তাই কারবালা যেখানে শিয়া সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান, সেখানে সুন্নীগণও কেন যোগ দিয়েছেন, এইটাই আপাতঃ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্তু সময়ের দিক থেকে সুন্নী ও শিয়া মুসলমান বা সকল মুসলমানই 'আশুরা' নামে একটি অনুষ্ঠান বা উৎসব ১০ই 'মহররম' তারিখে পালন করে আসছিলেন, পরবর্তীকালে কারবালা সংঘটিত হয় ঐ তারিখে অর্থাৎ ১০ই মহররম। তখন হতে শিয়া মুসলমানগণ ১০ই মহররম-এর তারিখে একদিকে 'আশুরা', অন্যদিকে কারবালাও পালন করতে থাকলেন। এইভাবে দুটি বিভিন্ন ঘটনার মিলন হল। পবরর্তীকালে কারবালার জাঁকজমক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য প্রাচীন 'আশুরার' অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান বা উৎসবটিকে মলিন বা অনুল্লেখযোগ্য করে দিল। ধীরে ধীরে আপামর জনসাধারণের চোখে বিধৃত হল শুধু আজকের 'কারবালা'। উভয় উভয়ের মধ্যে ভেদ হারাল, 'আশুরা' হারাল তার উল্লেখ পর্যন্তও সাধারণের মধ্যে।

কারবালা ঃ কারবালার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্বয়ং মহানবীর (সাঃ) দৌহিত্র হযরত আলী (কঃ) ও বিবি ফাতেমার কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেন (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের কারবালার মরুপ্রান্তরে ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনীর হাতে যে করুণ পরিণতি ঘটেছিল ইতিহাসে তা কারবালা নামে পরিচিত।

আশুরা ঃ আরবীতে 'আশারা' অর্থাৎ দশ। এই আশারা শব্দ হতে আশুরার উৎপত্তি, অর্থ দশম। বহু পূর্বকাল হতে মহররম মাসের দশম তারিখটিকে 'আশুরা' এই বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। মদীনার ইহুদিরাও এই দিনটিকে পালন করতেন। এমন কি, স্বয়ং মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় গমন করলেন, তখন প্রথম দিকে তিনি ইয়াসরেব (মদীনা) বাসী ইহুদিদের অনেক ভালো ধর্মীয় বিধি-বিধানকে নিজে পালন করতে থাকেন। যেমন—তাঁদের উপবাস ব্রত, আশুরা পালন। জেরুজালেমকে কেবলা করণ (অর্থাৎ ঐ মুখে দাঁড়িয়ে নামায পড়া) ইত্যাদিকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পবিত্র কোরআনে রমজান বা উপবাসের ওহি বা প্রত্যাদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদিদের (সুর্যাস্তি হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত) উপবাস ত্যাগ করেন। সূরা বকর ২ ঃ ১৮৩। ঠিক অনুরূপভাবেই যথাসময়ে কেবলাও পরিবর্তন করেন। ২ ঃ ১৪২-৪৪। কিন্তু মহানবী (সাঃ) পরবর্তীকালেও আশুরার কোন পরিবর্তন করেন নি। প্রাচীন আরবের আশুরার উপবাসের এই ধারাটি নবীন আরবেও চলতে থাকল। ইসলাম জগৎ শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করলেন—এই সময়ই হযরত নূহ (আঃ)-এর প্লাবন, এবং ঐ দিনই তিনি নাজাত বা মুক্তি পেলেন, ঐ দিনই মক্কার কাবার দ্বার উন্মুক্ত হয় ইত্যাদি বহু বিখ্যাত ঘটনা। তবে আশুরার যে উপবাস তার জন্য মুসলমানদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নাই। করলে সওয়াব (পুণ্য) আছে, না করলে বদিহ বা গোনাহ (পাপ) নেই। অর্থাৎ এই উপবাস ফরজ (অবশ্যই পালনীয়) নয়, বরং নফল, ইচ্ছানুযায়ী করা বা না করা।

মহররম ঃ সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, আদিতে মহররম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, ছিল শুধু একটি শব্দ—'হারাম' অর্থাৎ পবিত্র। সেখান হতে মহররম অর্থাৎ পবিত্র জিনিস। অতঃপর 'মহররম' প্রথম দখল করল—'প্রথম-সফর' মাসটিকে। দ্বিতীয় বার দখল করল—'আশুরার' উৎসবকে, তৃতীয়বার দখল করল—কারবালাকে। এইভাবে মহররম কালক্রমে তিনটিকেই আত্মস্থ করে একের মধ্যে তিনেরই প্রকাশ রূপ নিয়েছে। তাই বর্তমানে মুসলিম জগৎ

আরবী প্রথম মাস সফর এবং আশুরা ও কারবালা তিনটিকেই মহররম বলেই আখ্যায়িত করেন।

।। দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ।।

৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন। আবু সুফিয়ান বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ছিলেন রুগ্ন ও নম্র স্বভাবের মানুষ। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আব্দুল্লাহ্ মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ও মিশরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর আবু সুফিয়ান গোত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। মারওয়ান-বিন-হাকাম সিংহাসন লাভ করেন। ইতিহাস বিখ্যাত কূটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ মুয়াবিয়ার কত কৌশলে আপন হাতে গড়া সাধনার ও সখের সিংহাসন আজ চিরতরে হস্তান্তরিত হল। রাজ্য স্থাপনে ও পরিচালনায় মুয়াবিয়ার ইচ্ছা পুর্ণ হল না। পূর্ণ হল এক আল্লাহর ইচ্ছা "তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর, এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও।" কোরআন ঃ ৩ ঃ ২৬।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম মারওয়ান ও আব্দুল মালিক

প্রথম মারওয়ান

[৬৮৪-৬৮৫ খ্রীঃ] [৬৫-৬৬ হিঃ]

প্রধান ঘটনাবলী

[প্রথম জীবন — খেলাফত লাভ — মারওয়ান বংশ প্রতিষ্ঠা।]

প্রথম জীবন :

প্রথম মারওয়ান কর্তৃক উমাইয়া রাজবংশ আজ প্রথম দ্বিখণ্ডিত হল। সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ানী শাখা প্রতিষ্ঠিত হল এবং মুয়াবিয়া শাখা নির্বাণ লাভ করল। মারওয়ান ছিলেন হযরত ওসমানের চাচাত ভাই এবং হাকামের পুত্র, এবং মুয়াবিয়ার চাচাত ভাই। মারওয়ান শুধু হযরত ওসমানের চাচাত ভাই-ই ছিলেন না, জামাতাও ছিলেন। তিনি ছিলেন খলিফা ওসমানের প্রধান উপদেষ্টা। এই সুযোগে তিনি বৃদ্ধ খলিফা ওসমানকে বলতে গেলে পথে বসিয়েছিলেন। মারওয়ানের সমগ্র জীবন কুচিন্তাগ্রস্ত ছিল। এবং এই কুচিন্তাগ্রস্ত মানুষটির প্রভাব থেকে অতি বার্ধক্যবশতঃ খলিফা ওসমান নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। কথিত আছে, মারওয়ান মিশরীয় বাহিনীকে খলিফার প্রদত্ত চিঠি জাল করে হযরত ওসমানের খেলাফতে এক নিদারুণ অরাজকতার সৃষ্টি করেন। যার শেষ বা শোচনীয় পরিণতি হল — খলিফার শাহাদৎ বরণ। এই ভাবে খলিফা ওসমানের খেলাফতকে কালিমালিপ্ত করার পেছনে মারওয়ানের যথেষ্ট হাত ছিল। পরবর্তীকালে তিনি মুয়াবিয়ার আমলে হিজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুয়াবিয়ার জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনিই মুয়াবিয়াকে পরামর্শ দেন পুত্র ইয়াজীদকে খেলাফতের উত্তরাধিকার মনোনয়ন করতে। এর ফলে ইমাম হোসেনের ন্যায্য দাবী প্রত্যাখ্যাত তো হলই, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বা মহানবীর বা চার খলিফার আল্লাহতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র চিরনির্বাণ লাভ করল। এখানেই মারওয়ানের কাজ শেষ হয় নি। পরবর্তীকালে তিনি ইয়াজীদকেও পরামর্শ দেন— মক্কা ও মদীনা আক্রমণের জন্য। এইভাবে আমরা দেখতে পাই মারওয়ানের উপদেশ দ্বারা ইসলাম জগতের তিনটি মহা ক্ষতি হল। প্রথমটি —তাঁরই উপদেশে পরিচালিত হয়ে সরল সহজ পরোপকারী খলিফা ওসমান

অতি বৃদ্ধ বয়সে মিশরীয় বিদ্রোহীগণ কর্তৃক শহীদ হলেন। এর ফলে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়টি — তাঁরই উপদেশে প্ররোচিত হয়ে মুয়াবিয়া আপন পুত্র ইয়াজীদকে খেলাফতের ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করে ইসলাম জগতে গণতন্ত্রের সমাধি ঘটান। ইহা ছিল ইসলামের মূল নীতিতে কুঠারঘাত স্বরূপ। তৃতীয়টি— তাঁরই উপদেশে ইয়াজীদ পবিত্র মদীনা লুণ্ঠন করার নির্দেশ দেন এবং পবিত্র মক্কা ও কাবাকে দগ্ধ করেন, এগুলো ইসলামের অচিন্তনীয় নৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত ওসমান ও হযরত আলীর খেলাফত কালে ইসলামের ঘরে-বাইরে বিপদ-কলহ-অশান্তি ও অরাজকতার জন্য প্রধানত দুজন দায়ী। ঘরের জন্য মারওয়ান ও বাইরের জন্য মুয়াবিয়া। জামাতা মারওয়ান শ্বশুর খলিফা হযরত ওসমানের অতি বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে আপন স্বেচ্ছাচারিতার ফলে রাজ্য জুড়ে যে অরাজকতার সৃষ্টি করলেন, হযরত আলী ও হযরত হাসানের সময় মুয়াবিয়া তার সমাপ্তি ঘটিয়ে তার পূর্ণ ফায়দা লুটলেন। ফলে মহানবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সৎ খলিফাগণ পরিচালিত ইসলামের গণতন্ত্র নির্বাণ লাভ করল। ইসলামের ইতিহাসে এইটাই হচ্ছে মারওয়ান ও মুয়াবিয়ার কুখ্যাত অবদান। ইসলামের যে দুটো জিনিসের জন্য সাহাবাগণ বা মুসলমানগণ একদিন বিশ্বজয় করেছিলেন, সেই দুটো জিনিস মারওয়ান ও মুয়াবিয়ার স্নায়ুবিহীন লোমকেও স্পর্শ করেতে পারে নি, তাঁরা ছিলেন এমনি ক্ষণজন্মা প্রাণহীন পাথর। ইসলামের ঐ দুটো বস্তু — 'তেজ ও ত্যাগ' তাঁদের মধ্যে কার্যকরী হলে সমগ্র ইসলামের ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নিতে পারত এবং বিশ্বমানব আরো বহু নুতন কিছু লাভ করত। সুতরাং ঐ দুজন মানুষের জন্য শুধু মুসলমানগণই বহু কিছু থেকে বঞ্চিত হয়নি, সারা বিশ্ববাসীও বঞ্চিত হয়েছেন বহু কিছু হতে। তাই ইসলামের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয়বিদারক, বড়ই মর্মান্তিক। কেননা, কতকগুলো রাজা-বাদশা তৈরি করার জন্য ইসলাম পৃথিবীর মাটিতে আসে নি, বরং সে এসেছিল রাজা-বাদশা ভাঙতে, গড়তে নয়। তার বাণী ছিল সাম্যের বাণী। তার লক্ষ্য ছিল—সাম্যবাদ। সে এসেছিল মানুষে মানুষে ব্যবধানকে বিনষ্ট করতে, মানুষের শাশ্বত ব্যক্তি-অধিকারকে পাইয়ে দিতে। শোষিত সমাজকে, শোষিত মানুষকে শোষণমুক্ত করতে।

খেলাফত জীবন ঃ দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা খালিদের খলিফা হওয়ার পালা ছিল। কিন্তু খালিদ নাবালক থাকায় সকলে স্থির করলেন খালিদ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এই

গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া দরকার। তাই সকলে একমত হয়ে মারওয়ানের নাম প্রস্তাব করলেন। এইভাবে মারওয়ান ৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে খলিফা মনোনীত হন। তবে শর্ত ছিল— খালেদ সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ানকে খেলাফত ত্যাগ করতে হবে। ধুরন্ধর মারওয়ান অভ্যন্তরীণ অশান্তিকে এড়াবার জন্য ইয়াজীদের বিধবা পত্নী খালিদের মাকেও বিবাহ করেন। এইভাবে ইয়াজীদের রাজ্য ও রাজধানী উভয়কেই হস্তগত করলেন।

মারজরাহিতের যুদ্ধ ঃ এই সময় আব্দুল্লাহ ইবন্ জুবাইর হেজাজের খলিফা বলে নিজেকে ঘোষণা করেন এবং কুফা, বসরা, মিশর ও পারস্যের কিছু অংশ নিজের আয়ত্তে আনেন। তখন মারওয়ান তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন আব্দুল্লাহ্র বিরুদ্ধে। ফলে মারজরাহিত নামক স্থানে উভয়পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ বাধে। ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দের এই যুদ্ধে আব্দুল্লাহ্র সেনাপতি জাহ্হাক ইবন-কাইস আল্‌ফিহ্‌রীকে পরাজিত ও নিহত করে মারওয়ান সিরিয়া ও মিশরে পুনরায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যুদ্ধই মারওয়ানের জীবনের শেষ যুদ্ধ। পরবর্তীকালে কারবালা-ঘটনায় অনুতপ্তকারী কুফাবাসী মুদারাইতগণ উত্তর আরববাসী মারওয়ানের বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি দক্ষিণ আরববাসী হিমারাইতদের সাহয্যে তাদের দমন করতে সক্ষম হন।

মারওয়ান বংশ প্রতিষ্ঠিত ঃ

জীবন-সায়াহ্নে মারওয়ানের হাতে দূর অতীতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। একদিন এই মারওয়ানের উপদেশ ও পরামর্শ মত মুয়াবিয়া হযরত হাসানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হযরত হোসেনকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করেন এবং আপন পুত্র ইয়াজীদকে অন্যায়ভাবে খলিফা মনোনয়ন করে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঠিক ঐ একই পথ অনুসরণ করে আজ মারওয়ান দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার ভ্রাতা খালিদকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করে আপন পুত্রদ্বয় আব্দুল মালিক ও আব্দুল আজিজকে অন্যায়ভাবে যথাক্রমে খলিফা মনোনীত করে চরম বেইমানীর পরিচয় দেন। প্রথম মুয়াবিয়ার পরলোকগত আত্মা বোধ হয় আজ ঠিক উত্তরই পেল। বাইবেলে একটি কথা আছে—God sees but waits, 'আল্লাহ্ দেখেন, তবে দেরি করেন' উত্তর দিতে।

যাই হোক, আব্দুল মালিক খলিফা মনোনীত হওয়ার পরই ইয়াজীদের বিধবা পত্নী খালিদের মা ক্রোধে, ক্ষোভে, বাঘিনীর মত অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। পরবর্তীকালে খালিদ খলিফা হবে এই আশায় তিনি বৃদ্ধ মারওয়ানকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ না হওয়ায় ৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে একদিন শয়নকক্ষে

গভীর রাত্রে ক্রোধে জ্ঞানহারা রমণী বৃদ্ধ স্বামী মারওয়ানকে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মনের ক্ষোভ মিটিয়ে নেন। মারওয়ান চরিত্রের ষড়যন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে আমীর আলী ঠিক বলছেন—"বার্ধক্য মারওয়ানের ষড়যন্ত্রের প্রতিভাকে বিন্দুমাত্রও ম্লান করতে পারে নি।" জন্মগতভাবে ষড়যন্ত্রের হোতা ষড়যন্ত্রেই প্রাণ দিলেন।

।। আব্দুল মালিক ।।

[৬৮৫ - ৭০৫ খ্রীঃ] [৬৬ - ৮৬ হিঃ]

প্রধান ঘটনাবলী

[সিংহাসনে আরোহণ — ঘরে বাইরে বিদ্রোহ দমন —মুখতারের বিদ্রোহ— যাবের যুদ্ধ —মুসাব ও মুখতার — আমরের বিদ্রোহ — মুসাবের বিদ্রোহ — আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর — গোত্র কলহ — খারিজী বিদ্রোহ — সংস্কারক হাজ্জাজবীন ইউসুফ — জানাবিলের ও আসায়ব বিদ্রোহ — পূর্বাঞ্চল জয় — উত্তর আফ্রিকা পুনরুদ্ধার —উত্তরাধিকার মনোনয়ন — প্রশাসন — ডাক বিভাগ — রাজনীতি ; সংস্কার, শাসন ব্যবস্থার জাতীয়করণ; আরবী ভাষার উৎকর্ষ সাধন; আরবী মুদ্রা; চরিত্র; কৃতিত্ব — মসজেদুল আক্সা।]

আব্দুল মালিকের সিংহাসনে আরোহণ ঃ

প্রথম মারওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল মালিক ৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আব্দুল মালিকের খেলাফতের প্রথম দিকের অবস্থা লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায় তাঁকে সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বহু সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পিতা মারওয়ান পুত্রকে শত্রুবিহীন সিংহাসন দিয়ে যেতে পারেন নি, যেমন পেরেছিলেন মুয়াবিয়া পুত্র ইয়াজীদকে। মারওয়ান সিংহাসন লাভ করার পর সে সময় ও সুযোগ পান নি। জীবনসায়াহ্নে তিনি খলিফা হয়েছিলেন এবং যোগ্য পুত্র আব্দুল মালিকের হাতেই সবকিছু ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন। পুত্র পরবর্তীকালে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই যোগ্যতা তিনদিকে পরিলক্ষিত হয়েছে, প্রথম—বিদ্রোহ দমন, দ্বিতীয় — বলিষ্ঠ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, তৃতীয় — হৃত রাজ্য পুনর্দখল ও রাজ্য জয়।

রাজনৈতিক সঙ্কট ঃ আব্দুল মালিকের খেলাফত লাভের সময় রাজনৈতিক আকাশ একেবারেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল। পরিস্থিতিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কলহ। যে ইয়াজীদ বিন খালিদকে বঞ্চিত করে আব্দুল মালিক খলিফা হন, সেই খালিদকে কেন্দ্র করে আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা মাথা চাড়া দিল। আমর-বিন-সাইদ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এর মূলে ছিল রাজ মহলের অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল। এ ছাড়া, দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদবিসম্বাদ, অসন্তোষ ও অরাজকতার কোন অভাব ছিল না। স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ ইবন্ জুবাইর নিজকে হেজ্জাজ ও ইরাকের খলিফা বলে ঘোষণা

করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে মক্কা ও মদীনার মানুষও তাঁকে ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলে মেনেও নিয়েছেন। আবার অন্যদিকে খারিজীগণ আলীর সমর্থকদের সাথে এক হয়ে মদীনা-ইরাক ও পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঠিক অনুরূপভাবে কুফায় মুখতারের সাথে যোগ দিলেন কারবালা ঘটনার অনুশোচনাকারীগণ। ইরাকে মুসার ও ইব্রাহিমের বিদ্রোহও মালিককে কম বিচলিত করে নি। এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলল সিরিয়াবাসীদের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব। সমগ্র সাম্রাজ্যের এই কঠিন পরিস্থিতি যে কোন শক্তিধর সম্রাটের নিদ্রাকেও হরণ করে। দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এইরূপ জটিল, তখন এই জটিলতার সুযোগ নিতে বাইজান্টাইন সম্রাট এতটুকুও ভুল করেন নি। যার ফলে উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে বিপদের চরম সঙ্কেত দিতে থাকে। এককথায় আব্দুল মালিক যখন খলিফা হলেন তখন ঘরে-বাইরে বিপদের ঘনঘটা ও ঘোর অন্ধকার। আব্দুল মালিকের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব — তিনি বিপদের এই চরম সঙ্কট মুহূর্তেও অবিচলিত থেকে ধীর ও স্থির ভাবে সব কিছুর একের পর এক চরম সার্থকতার সাথে মোকাবিলা করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ ২০ বছর খেলাফত কালে রাজ্যের সংহতি-শৃঙ্খলা, ঐক্য-ঐতিহ্য, শান্তি-সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় যে সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা চিরস্মরণীয়।

ঘরে বাইরে বিদ্রোহ দমন ঃ

মারওয়ানের মৃত্যুর পর সমগ্র দেশে খেলাফতের জন্য চারজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের মধ্যেও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের আব্দুল মালিক, যাঁর সাহায্যকারী ছিলেন কারবালার কুখ্যাত কশাই উবাইদুল্লাহ ও নিষ্ঠুরতার চিরন্তন প্রতীক হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ, দ্বিতীয় ব্যক্তি ইরানের বসরা নগরীর মুসাব, যাঁর সাহায্যকারী ছিলেন বিখ্যাত বীর মুহাল্লাব; তৃতীয় ব্যক্তি ইরাকের কুফা নগরীর সুচতুর মুখতার, যাঁর সাহায্যকারী ছিলেন আল আসতার, চতুর্থ ব্যক্তি হেজাজের মক্কা নগরীর আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, যাঁর সাহায্যকারী ছিলেন কিছু প্রধান সাহাবী বা সঙ্গী। এইভাবে চারটি প্রদেশ থেকে চার জন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি দেশের একচ্ছত্র খলিফার আসন লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন।

দেশজুড়ে চার প্রদেশ থেকে চারজনের এই প্রবল দ্বন্দ্বটাকে আধুনিক যুগের চারটি নামী ফুটবল টিমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, প্রত্যেকেই যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ফাইনালে ওঠার জন্য, শীল্ডের (খেলাফতের)

গৌরব অর্জন করতে। তাই পরিশেষে দেখা গেল চার রাউন্ড যুদ্ধের পর সরাসরি আব্দুল মালিকের টিমই বিজয়ীর গৌরব লাভ করল ; এবং আব্দুল মালিক কিছু খ্যাতি-অখ্যাতির মধ্য দিয়ে একটানা দীর্ঘ ২০ বছর খেলাফত চালিয়ে গেলেন। মুখতারের বিদ্রোহ, আমরের বিদ্রোহ, মুসাবের বিদ্রোহ, আব্দুল্লাহ-ইবন-জুবাইয়ের বিদ্রোহ , গোত্র কলহ ও খারিজী বিদ্রোহ ইত্যাদি দমনে তিনি যে প্রতিভার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে নিঃসন্দেহে তিনি উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার সম্মান লাভ করেছেন।

মুখতারের বিদ্রোহ ঃ ধূর্ত, অস্থির-মতি, সুযোগ সন্ধানী মুখতার ছিলেন সাকীক গোত্রের আবু উবাইদার পুত্র। মতের দিকে থেকে তিনি ছিলেন শিয়ামতাবলম্বী। ইমাম হাসানের আস্থাভাজনও ছিলেন, এবং তাঁর সাথে কুফা হতে সাদাইনে গমন করেন। আবার এই মুখতারই পরবর্তীকালে কুফাতে ইমাম হাসানের দুত মুসলিমের বিরোধিতা করেন। পরে কুফার শাসনকর্তা উবাইদুল্লাহ কর্তৃক একটি চক্ষুও হারান। অতঃপর তিনি কুফা হতে হেজাজে পলায়ন করে উবাইদুল্লার উপর চক্ষু হারানোর প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি ইয়াজীদ বাহিনী কর্তৃক মক্কা অবরোধের সময় আব্দুল্লাহকে সাহায্য করে অবরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আব্দুল্লার ঘনিষ্ঠতা লাভের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে পুনরায় কুফায় প্রত্যাবর্তন করে ইমাম হোসাইনের কারবালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনুশোচনাকারীদের সঙ্গে যোগদান করেন।

একদিন সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে কুফাবাসীগণ খারেজী নাম ধারণ করে হযরত আলীকে মহাবিপদের সম্মুখে ঠেলে দিয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন! পুনরায় এই কুফাবাসীগণ হযরত হোসাইনকেও কারবালা প্রান্তরে একাকী ত্যাগ করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন নি। পরবর্তীকালে এই অস্থির-মতি অবিশ্বাসী কুফাবাসীগণ খুবই অনুতপ্ত হন। তাই তাদের তাওয়াবুন বা অনুশোচনাকারী বলা হয়। পরে তাঁরা একদিন কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের সমাধিতে একত্রিত হয়ে সারারাত্রি চরম অনুশোচনার সাথে বিলাপ করেন। অতঃপর তাঁরা সিরিয়াবাসীগণকে আক্রমণ করলে খলিফার সৈন্যবাহিনী তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। এই দলের নেতৃত্ব দিলেন মুখতার, অসংখ্য মানুষ তাঁর দলে যোগদান করে। এইভাবে কুফা তাঁরই করতলগত হয়। তিনি কুফার শাসনকর্তার মর্যাদা লাভ করেন।

মুখতারের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ও ব্যবহারে আব্দুল্লাহ সন্দিগ্ধ হয়ে কুফার শাসনকর্তা মুখতারকে তায়েফে কারারুদ্ধ করেন। সুচতুর মুখতার কিছুদিনের

মধ্যেই মুক্তিলাভ করে তাঁর বিশাল অনুশোচনাকারী দলের সাহায্যে কুফা হতে আব্দুল্লার শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করে তথায় স্বীয় প্রভূত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন। তিনি নিজেকে মহম্মদ - আল-হানাফিয়া-ইবন আলীর প্রতিনিধি দাবী করে এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। এই মহম্মদ আল হানিফ হযরত আলীর পুত্র, তবে ফাতেমার গর্ভজাত নন, বিবি ফাতেমার মৃত্যুর পর হযরত আলী হানিফা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করেন, মহম্মদ হানিফ ঐ মহিলার সন্তান। মুখতার আপন বুদ্ধিবলে শুধু আলীর প্রতিনিধিত্ব দাবী করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি গঠন করলেন অনুশোচনাকারীদের কেন্দ্র করে এক বিশাল বাহিনী, এবং এই বাহিনীকে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সুকৌশলে ইব্রাহিম-ইবন-আল আসতারের মত ব্যক্তির সাহায্য ও সাহচর্য লাভ করতেও সক্ষম হন। এটা ছিল তাঁর বিরাট কূটনৈতিক জয়। এইভাবেই তিনি কুফা হতে আব্দুল্লার আধিপত্যকে বিদায় দেন।

প্রথম যুদ্ধ (সিরিয়া ও ইরাক) -যাবের যুদ্ধ- আসতার ও উবাইদুল্লাহ ঃ (৬৮৬ খ্রীঃ) চতুর মুখতার কুফাতে বেশ কিছু শক্তি সঞ্চয় করে দামেস্কের প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল মালিককে আঘাত করার অভিপ্রায়ে মালিকের প্রধান সহায়ক কারবালার কসাই উবাইদুল্লার বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন। এই সেনাবাহিনী নগর ত্যাগ করার পূর্বেই কপট ও বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসীদের কিছু অংশ মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুখতার আসতারের সাহায্যে ঐ বিদ্রোহকে দমন করেত সক্ষম হন। এই বিদ্রোহকারীদের একদলের শ্লোগান ছিল—"ওসমান হত্যার প্রতিশোধ চাই।" অন্য দলের ছিল—"হোসাইন হত্যার প্রতিশোধ চাই।" দুই দলের ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। এই যুদ্ধে আসতার জয়লাভ করেন। ৮০০ জন মানুষ যুদ্ধে প্রাণ হারান—তাঁদের মধ্যে কারবালার হোসাইন হত্যাকারী সীমার, ওথাকার সেনাপতি উমর প্রমুখ ব্যক্তিগণ অন্যতম।

এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আব্দুল মালিক তাঁর সেনাপতি উবাইদুল্লাহকে এক বিশাল বাহিনীসহ মুখতারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন মুখতার তাঁর সেনাপতি আসতারকে এই বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। ৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তাইগ্রীস নদীর শাখা 'যাব' নদীব তীরে উভয় পক্ষ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মিলিত হল। তাই একে যাব-এর যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে কারবালার কসাই (the Butcher) উবাইদুল্লাহ সদলবলে পরাজিত ও নিহত হলেন। একদিন যেভাবে হযরত হোসাইনের ছিন্ন মস্তক উবাইদুল্লাহর নির্দেশমত দামাস্কে ইয়াজীদের নিকট প্রেরিত হয়েছিল, আজ তাঁরই ছিন্ন মস্তক সেই স্থান হতেই আল আসতারের

হুকুমে কুফাতে সুখতারের নিকট প্রেরিত হল। একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও মহাকালের নীরব উত্তর।

দ্বিতীয় যুদ্ধ (হেজাজ ও ইরাক)— মুসাব ও মুখতার ঃ যাবের যুদ্ধে আব্দুল মালিকের প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহকে পরাজিত ও নিহত করে মুখতার ইরাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন এবং মক্কার আব্দুল্লার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে আব্দুল্লাহ তাঁকে ভুল বুঝে তৎক্ষণাৎ তাঁর ভ্রাতা ও সাহায্যকারী এবং বসরার শাসনকর্তা মুসাবকে মুখতারের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। ৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে মুসাব তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাবকে সঙ্গে নিয়ে মুখতারের বিরুদ্ধে ইরাকের পথে যাত্রা করলেন। এই সংবাদ কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং মুখতার নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে মুসাবের পথরোধ করার চেষ্টা করলে পথিমধ্যেই তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। মুখতার পরাজিত হয়ে ৮০০০ সেনাসহ একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় পানি ও খাদ্যের অভাবে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অসংখ্য অনুচর বৃন্দসহ পরাজিত ও নিহত হন। এইভাবে বিনা ব্যয়ে আব্দুল মালিকের একটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মুখতার চিরতরে শেষ হয়ে গেল।

মুখতারের জীবনে একটিই মাত্র লক্ষ্য ছিল, সেটা হচ্ছে কারবালার কসাই উবাইদুল্লাহকে নিহত করা। উবাইদুল্লাহ নিহত হওয়ার পর মুখতারের আর বড় কোন অভিপ্রায় ছিল না। তাই তিনি এরপর আব্দুল্লার আনুগত্য প্রকাশ করে বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত আব্দুল্লাহ মুখতারকে বিশ্বাস করতে না পেরে বরং তাঁকে বধ করে পরোক্ষভাবে আপন শত্রু আবদুল মালিকের হস্তকে শক্তিশালী ও মজবুত করে দিলেন। যে শক্তির অব্যর্থ আঘাত পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ নিজেই সহ্য করতে পারলেন না। আব্দুল মালিক কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুললেন, সহজ সরল আব্দুল্লাহ বুঝলেন না— কোথায় ঘা দিলেন, এবং তার প্রতিঘাত কি হতে পারে।

আমরের বিদ্রোহ (৬৮৯ খ্রীঃ) ঃ দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর মারওয়ান যখন খেলাফত গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর চাচাত ভাই আমর ইবন সাইদ খলিফা হওয়ার কামনা করেন। তাঁর বদ্ধ ধারণা ছিল মারওয়ানের মৃত্যুর পর খালিদ-বিন-ইয়াজীদ কিংবা তিনি খেলাফত লাভ করবেন। কিন্তু কার্যত তা না হওয়ায় তিনি দামাস্কের শাসনকর্তার পদে না থেকে ৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে আব্দুল মালিকের সাথে তাঁর কয়েকটি সংঘর্ষ বাধে। মালিক তাঁকে পরাজিত ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে পথের কাঁটাকে নষ্ট করার জন্য আমরকে একদিন সসম্মানে দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে

চরম বিশ্বাসঘাতকতার সাথে নির্মমভাবে হত্যার নির্দেশ দেন। এরই নাম রাজ-চরিত্র—আব্দুল মালিকও এর কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না।

তৃতীয় যুদ্ধ (সিরিয়া ও ইরাক)— মুসাবের বিদ্রোহ ঃ আব্দুল মালিক ও মুসাব (৬৯১ খ্রীঃ) ঃ সিরিয়ায় আমরের বিদ্রোহ দমন করে আব্দুল মালিক ইরাকের ও বসরার মুসাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কেননা ইতিমধ্যে মুসাব মুখতারকে সদলবলে নিধন করে অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছিলেন। তাই ৬৯১ খ্রীস্টাব্দে মুসাবের বিরুদ্ধে স্বয়ং আব্দুল মালিক নিজেই এক বিশাল সেনাবাহিনী পরিচালিত করেন। স্বয়ং খলিফার সৈন্য পরিচালনায় মুসাব ভীত ও শঙ্কিত হয়ে সেনাপতি মুহাল্লাবের সাহায্য নিলেন। কিন্তু এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ইমাম হোসাইনের স্নেহধন্য জামাতা ও কন্যা সখিনার স্বামী বিখ্যাত বীর মুসাব সদলবলে পরাজিত ও নিহত হলেন। এখানে মুসাবের পুত্র ইয়াহিয়া ও আল আসতার সকলেই প্রাণ দিলেন। মুসাবের ছিন্ন মস্তক দামেস্কে প্রেরিত হল। এই যুদ্ধের ফলে আব্দুল মালিক সিরিয়া ও ইরাকের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে অপরিমিত শক্তির অধিকারী হলেন। সেনাপতি মুহাল্লাব আব্দুল মালিকের পক্ষে যোগ দিলেন।

আবদুল্লাহ-বিন যুবাইয়ের প্রচেষ্টা ও তাঁর বিফলতার কারণ ঃ

চতুর্থ যুদ্ধ (সিরিয়া ও হেজাজ)—নিষ্ঠুর হাজ্জাজ ও আব্দুল্লাহ (৬৯২ খ্রীঃ) ঃ ইসলাম জগতের সাথে আব্দুল্লার পরিচয় বড়ই নিবিড়। আব্দুল্লার পিতা ছিলেন জুবাইর, মাতা ছিলেন হযরত আবুবকরের কন্যা ঐ আসমা, যিনি মহানবীর (সাঃ) মক্কা হতে মদীনার পথে হিজরত কালে গভীর রাতে পিতা আবুবকর (রাঃ) যখন মহানবীর (সাঃ) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন, তখন তাড়াতাড়ি পিতার হাতে মহানবীর (সাঃ) জন্য কয়েকটি রুটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এবং তাঁরা গারে সওরে, অর্থাৎ সওর পাহাড়ের গুহাতে যখন গোপনে অবস্থান করছিলেন তখন এই আসমাই তাঁদের খাবার পাঠাতেন। সুতরাং সেদিনের আসমা (রাঃ) ঐ বালিকা, যাঁর সাথে ইসলামের আদি ও মূল শিকড়টা জড়িয়ে আছে আজও। আব্দুল্লাহ সেই মহীয়সী মহিলা আস্‌মার গর্ভজাত সন্তান; আর হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ চরম নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সোপানে আরোহণকারী সামান্য শিক্ষক হতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

আব্দুল্লাহ নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করে আরবের বিখ্যাত প্রদেশ হেজাজ শাসন করতে থাকেন। মুখতার ও মুসাবের হত্যার পর আব্দুল মালিকের আব্দুল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রবল শত্রু ছিল না বললেই চলে। ইয়াজিদ বাহিনী

পবিত্র মদীনাকে লুণ্ঠন ও মক্কার পবিত্র কাবাতে অগ্নিসংযোগ করার পর আব্দুল্লাই শহর দুটোকে পুনরায় পুনর্নির্মাণ করে শান্তির সাথে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু আব্দুল মালিক হেজাজকে উমাইয়া রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আব্দুল্লার বিরুদ্ধে হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ৬৯২ খ্রীস্টাব্দে হাজ্জাজ কুফা হতে তায়েফে উপস্থিত হয়ে আব্দুল্লার নিকট আব্দুল মালিকের একটি চিঠি পাঠালেন—আনুগত্য স্বীকারের জন্য। আব্দুল্লাহ্ আনুগত্য স্বীকারে দ্বিমত প্রকাশ করলে হাজ্জাজ মক্কা অবরোধ করেন। দীর্ঘ সাত মাস অবরোধ চলার কালে শহরে নিদারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয়। ফলে বহু মানুষ আব্দুল্লার দল ত্যাগ করতে থাকে। এমতাবস্থায় নিরুপায় আব্দুল্লা যুদ্ধের সংকল্প নেন। এই সময় তাঁর মহীয়সী মাতা আস্‌মা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। একদিন এই মহিলাই সমগ্র মক্কার বর্বর কোরাইশদের বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি—সেদিন মহানবী (দঃ) জীবিত ছিলেন। জীবন-সায়াহ্নে আজ সেই একই বীরত্ব দেখালেন বর্বর হাজ্জাজের সম্মুখে তাঁর সেনাবাহিনীকে। কিন্তু আজ মহানবী (দঃ)-র ঐশ্বরিক প্রেরণা অনুপস্থিত। ৬৯২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আব্দুল্লাহ্ আরাফত প্রান্তরে হাজ্জাজ বাহিনীর মোকাবিলা করে সগৌরবে প্রাণ হারালেন। তাঁর ছিন্ন মস্তক প্রথম মদীনায় ও পরে দামেস্কে শোভাযাত্রা সহকারে বিপুল আনন্দে প্রেরিত হল। প্রথমে আব্দুল্লার মস্তকবিহীন দেহকে শুলবিদ্ধ অবস্থায় নিষ্ঠুর বর্বর নরাধম হাজ্জাজ তাঁর মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে যে পৈশাচিক দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন—তা ইতিহাসে বিরল। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু হাজ্জাজ আজও সেই বিরল ইতিহাসের নায়ক।

ফলাফল ঃ আব্দুল্লাহ্ তাঁর ৯ বছর খেলাফত কালে ইসলামের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং এই চেষ্টাতেই ৭২ বছর বয়সে আত্মাহুতি দেন। আব্দুল্লার পরে সমগ্র মুসলিম রাজত্বে ইসলামের সেই পূত-পবিত্র ভাব আর কোথাও থাকল না। এর পরের ইসলামের ইতিহাস রাজ্য-বাদশাদের লোভ ও লালসার কাহিনী। হিট্টি বলেছেন, "আব্দুল্লার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন ধর্মবিশ্বাসের সাথে বর্তমানের সর্বশেষ যোগসূত্রটিও ছিন্ন হল।" সুতরাং শুধু আব্দুল্লার মাথাটিকেই তাঁর দেহ হতে ছিন্ন করা হয় নি, এর সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্ন হল — ইসলামের পবিত্রতা তার দেহ হতে। সমগ্র ইসলাম জগতে এটার মূল্য কম কিছু নয়। আব্দুল্লাহকে মক্কা ও মদীনার মুসলমানগণ এতখানি শ্রদ্ধা করতেন যে, শুক্রবারের নামাযের খুৎবায় তাঁর নামোচ্চারিতও হতো। হযরত ওসমান হত্যার পর থেকেই মক্কা ও মদীনা তার গুরুত্ব হারাল, হেজাজ হল প্রাণহীন

প্রদেশ। আব্দুল্লার চেষ্টাতেও মক্কা ও মদীনা তার সেই পূর্বতন রাজনৈতিক মর্যাদা আর ফিরে পায় নি। পরবর্তীকালেও মক্কা ও মদীনার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আব্দুল্লাহ্ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, মিতব্যয়ী। আব্দুল্লাহ্র মৃত্যুর পর আব্দুল মালিক মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি রূপে স্বীকৃতি পেলেন। আব্দুল্লার বিশ্বস্ত গভর্নর ইবন-খাজিম খোরাসানে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আব্দুল্লার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই খোরাসান উমাইয়া রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হল।

আব্দুল্লার পতনের কারণ ঃ

আব্দুল্লার পরাজয়ের আমরা কয়েকটি কারণ দেখতে পাই। প্রথম—তাঁর সরল সহজ চরিত্রই তাঁর পরাজয়ের মূল কারণ স্বরূপ বিধৃত হয়। তিনি কোন চালাকী-চাতুরী-শঠতা ষড়যন্ত্র-প্রতারণা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি জানতেন না। তাই সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন নি। দ্বিতীয়—খলিফা হওয়ার মোহে তাঁর মত চরিত্রবান ব্যক্তির পক্ষে হযরত হোসাইনকে উৎসাহিত করে ইরাকে বা কুফাতে পাঠাবার চেষ্টা করাটা ঠিক হয় নি। যার ফলে হোসাইন কারবালা প্রান্তরে প্রাণ হারালেন। তিনি তাঁকে আপন করে নিতে পারতেন, এখানে তিনি অনুদারতার পরিচয় রেখেছেন। অথচ ইমাম হোসাইনের মৃত্যুতে তাঁরই হাত দুর্বল হয়েছে। তৃতীয়,—মুখতার তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে বার্তা পাঠালে তিনি মুখতারকে সাদরে বরণ করে মিত্র করার পরিবর্তে সন্দেহের বশে শত্রুতে পরিণত করেন। শুধু তাই না, ভ্রাতা মুসাবের দ্বারা মুখতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাঁর প্রাণনাশ আব্দুল্লার ভবিষ্যৎকে একেবারেই অন্ধকার করে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি এই সত্য যথাসময়ে অনুধাবন করতে পারেন নি, এখানে তিনি চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্থ — ভ্রাতা মুসাব যখন স্বয়ং খলিফা আব্দুল মালিকের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁর জন্য ফরজ ছিল মুসাবকে যথাযোগ্য সাহায্য করে মালিককে ঠেকান। কিন্তু তা তিনি না করে শত্রু মালিককেই বলবান করেন। এটা ছিল তাঁর মারাত্মক ত্রুটি, ক্ষমাহীন অপরাধ। পঞ্চম—তিনি খোদ সিরিয়ার বিদ্রোহী আব্দুল মালিকের জাত-শত্রু আমরকেও ছলে-বলে-কৌশলে হাত করে আব্দুল মালিককে চরম শিক্ষা দিতে পারতেন। কিন্তু অবহেলায় এ সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছেন। এককথায় বয়স্ক-অভিজ্ঞ আব্দুল্লাহ্ সকলকেই একত্রিত করে এক সাথে আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে লড়াতে পারতেন, তার ফলও হত অন্যরূপ। কিন্তু তিনি নীরব দর্শকের ন্যায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে শুধু সাক্ষীগোপালের মত দেখেই গেলেন, যে ঘটনাগুলোতে তাঁর মিত্রপক্ষ দুর্বল হল, কোথাও বা ধনেপ্রাণে নিধন

হল, এবং শত্রুপক্ষ বলীয়ান হয়ে উঠল। এর ফলে পরবর্তীকালে একদিন সেই বর্বর বলীয়ান শত্রুর নিকট তিনি মাথা নত করে আত্মসমর্পণ না করলেও নিষ্ঠুর নর-পিশাচ, নির্দয়-হৃদয়হীন হাজ্জাজের হাতে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হলেন। অবলীলায় প্রতিশোধ গ্রহণের যে সুবর্ণ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, একটু ভুলের বা অদূরদর্শিতার জন্য অবহেলায় তা হারিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক মেধা, কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণের প্রজ্ঞা কাজ করে নি। তাই এই নির্মম-নির্দয়-করুণ-মর্মান্তিক হৃদয়-বিদারক ঘটনার অন্তরালে এবং একই সঙ্গে তাঁর বিফলতাও আব্দুল মালিকের সফলতার পশ্চাতে আব্দুল্লাহ-বিন-যুবাইর-এর অদূরদর্শিতা কিছু কম অবদান যোগায় নি। পক্ষান্তরে আব্দুল মালিকের জয়ের প্রধানতম কারণ বা তাঁর চরম সৌভাগ্য বলা যেতে পারে যে, তাঁর শত্রুগণ পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ে একে অন্যের শক্তি ক্ষয় করে। যার পরিণতি স্বরূপ আব্দুল মালিক সহজেই কিস্তিমাৎ করলেন। নতুবা ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখিত হত।

গোত্র কলহ ঃ আব্দুল্লার মৃত্যুর পর সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে উমাইয়াদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে রাজ্যের প্রতিটি মসজেদে খলিফার নামে খুৎবা পাঠ হতে থাকল। তাঁর খেলাফতে আরব-প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে, মুখতার মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর সেনাবাহিনী মুসাবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু মুখতারের সেনাবাহিনীতে মাত্র ৭০০ জন আরব সেনা ছিলেন, বাকি সকলেই ছিলেন অ-আরবীয়। মুসাবের নির্দেশে মুখতারের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মুখতারই প্রথম অ-আরবীয় মুসলমানদের নেতা হিসেবে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম অ-আরবীয় (মাওয়ালী) মুসলমানদের অসন্তোষ চরম বিদ্রোহ আকারে দেখা দিল। তখনও কায়েস ও কালব গোত্রের সংঘর্ষ বন্ধ হয়নি। যার ফলে বানু তাগলীব সুলাইম ও ফেজারা প্রভৃতি খ্রীস্টান গোত্রের মধ্যেও ভয়াবহ কলহ দেখা যায়। এই গোত্র-কলহ মেসোপটেমিয়াতে চরম আকার ধারণ করে। এমন কি, বসরার রাবিয়া, আজদ, তামিম ও কায়েস গোত্রের মধ্যেও যে কলহ তা খোরাসানেও প্রসারিত হয়। খলিফা আব্দুল মালিক অতি কঠোর হস্তে এই সমস্ত গোত্র-কলহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করে প্রজাবর্গের প্রশংসাভাজন হন।

খারিজী বিদ্রোহ ঃ খারিজী বিদ্রোহ দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে ৬৮৮ থেকে ৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের প্রসার ঘটতে দেখা যায়। আব্দুল মালিক নানা সময় নানা সংকটে বিব্রত থাকার সময় খারিজীগণ সারা পূর্বাঞ্চলে ত্রাসের

রাজত্ব সৃষ্টি করেন। ইরাক ও দক্ষিণ পারস্যে তাঁরা হযরত হোসাইনের হত্যার প্রতিবাদে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে নানারূপ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমন কি, নিরপরাধ জনসাধারণের উপরও তাঁরা হামলা চালাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। ইস্পাহান, কিরমান প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁদের বিদ্রোহ অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকল। কিছুদিনের জন্য মুসাব তাঁর সেনাপতি মুহাল্লাবের দ্বারা এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়া আনতে সক্ষম হন। কিন্তু খারিজীগণ উমাইয়াদের অত্যাচার ও হাজ্জাজের নৃশংসতার বিরুধে তীব্র আলোড়ন তুললেন। খারিজীগণ কতখানি শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, একটা ঘটনা হতে তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৬৮ হিজরীতে (৬৮৮ খ্রীঃ) হজের সময় মক্কার আরাফত ময়দানে চারটি দলের পক্ষ থেকে চারটি পতাকা শোভা বর্ধন করে। একটি আব্দুল্লাহ-বিন-যুবাইয়ের, একটি আব্দুল মালিকের, একটি মহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার, অন্যটি খারিজী সম্প্রদায়ের। পতাকাগুলির চারিপার্শ্বে আপন আপন সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবেত ছিলেন। পবিত্র হজের মওসুম, তাই কেউ কাউকে আঘাত করেন নি।

খারিজীগণ বহুবার খলিফাকে বিব্রত করলেও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের জন্য কোন সময়ই সংঘবদ্ধভাবে খলিফার বিরুদ্ধে অভিযান করতে সক্ষম হন নি। আবদুল্লাহ ও মুসাবের পতনের পর বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব আব্দুল মালিকের নিকট আত্মসমর্পণ করলে মালিক তাঁকে খারিজীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুহাল্লাব অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে খারিজীগণকে দমন করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। কিন্তু ৬৯৫-৯৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে খারিজীগণ পুনরায় নফি বিন আবতারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আব্দুল মালিক ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজের দ্বারা তাঁদের কঠোর হস্তে দমন করেন। এই সময় আবতার সহ বহু খারিজী হাজ্জাজের হাতে নিহত হন এবং অনেকেই প্রাণভয়ে আল আহসার মরুভূমি ও অন্যান্য স্থানে পলায়ন করে আত্মগোপন করেন।

ঐতিহাসিকগণ আব্দুল মালিককে উমাইয়া রাজত্বের স্থপতি (Architect) ও সংগঠকের সম্মান দান করেছেন। এর কারণ, আব্দুল মালিক ঘরে-বাইরে উভয় স্থানে বিদ্রোহ দমনে, সংস্কারে ও রাজ্যবিস্তারে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন, তা বর্ণনাতীত। একজন খলিফা হয়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে, স্থাপত্যে, এমন কি জটিল ভাষা সংস্কারে তিনি গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে তিনি উমাইয়া রাজত্বের যথার্থই স্থপতি ও সংগঠক। প্রথম মুয়াবিয়াকে উমাইয়া রাজত্বের জনকের সম্মান দান করলে আব্দুল মালিককে যথার্থ প্রতিষ্ঠাতার সম্মান দেওয়া উচিত।

উমাইয়া রাজত্বের সংস্কারক হাজ্জাজ বিন-ইউসুফের অবদান ঃ

সমরকুশলী সেনাপতি ও বিজেতা হিসেবে হাজ্জাজ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে অসামান্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। যখন তিনি পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা, সেই সময় শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে ওয়াসিত নামক স্থানে সেই স্থানের নামানুসারে ওয়াসিত শহরের পত্তন করেন। এবং এই শহরকেই তিনি রাজধানী রূপে ব্যবহার করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে উমাইয়া সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। একদিন তাঁরই অনুপ্রেরণায় বীর ইয়াজীদ বিন-মহম্মদ, কুতাইবা-বিন-মুসলিম ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহম্মদ-বিন-কাসেম ভারত উপমহাদেশের বিস্তৃত এলাকা— সিন্ধু -মুলতান-পাঞ্জাব উমাইয়া রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। সুতরাং বিজেতা হিসেবে হাজ্জাজের অবদান অসামান্য।

সংস্কারক হিসেবে তাঁর অবদান কম ছিল না। তিনি আব্দুল মালিককে পরামর্শ দিয়ে রাজস্ব ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেন। অ-মুসলমান প্রজাদের অনেকেই কর হতে মুক্তি পাওয়ার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। এর ফলে রাজ্যের রাজস্ব ভাণ্ডার একেবারেই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তখন হাজ্জাজ নবদীক্ষিত মুসলমানদের খারাজ ও জিজিয়া দিতে বাধ্য করেন। ফলে রাজস্ব ভাণ্ডার পুনরায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য তিনি বহু খাল কাটারও ব্যবস্থা করেন, এবং কৃষিকার্যে যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত গরু ও মহিষকে জবাই করা নিষিদ্ধ করে দেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম ছিল না। তিনি নিজে একজন শিক্ষক ছিলেন। তাই শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি যে পারদর্শিতা দেখিয়ে গেছেন, তা চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওয়েল হাউসেন বলেন—"মুদ্রা, কর, ওজন এবং কৃষিতে গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কৃত সরকারি নিয়মাবলী যুগান্তকারী বলে পরিগণিত হয়।" তিনি স্থাপত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং দর্শন ও ভাষা সংস্কারে এক অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, যা সত্যই কালজয়ী প্রতিভার পরিচায়ক। আব্দুল মালিকের পূর্বে আরবী ভাষায় কোন জবর, জের বা পেশের অর্থাৎ আকার, একার ও উকারের প্রচলন ছিল না ঃ আবার অক্ষরের মধ্যে কোন নোক্তারও ব্যবহার ছিল না। এসবই হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের অবদান। বাংলা ভাষায় যেমন "ব-র, য-য়" আছে ; আরবী ভাষায় তেমনি একটি অক্ষর শুধু মাত্র নোক্তা বা বিন্দুর ব্যবহারে তিন প্রকারে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন-বে, তে, ছে ; জিম্, হে, খে ইত্যাদি । আরবী ভাষা-সাহিত্যের এই অভাবনীয়

উন্নতি হাজ্জাজেরই অবদান।

বিদ্রোহ দমনে হাজ্জাজ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। মক্কা অবরোধের পর তিনিই হেজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি বিধান করায় দেশে অনতিবিলম্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। মক্কা-মদীনা আবার শান্ত হয়ে ওঠে, এটা হাজ্জাজেরই কৃতিত্ব। পরের বছর ৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে খারিজীগণ বিদ্রোহী হলে খলিফা সেনাপতি মুহল্লাবকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠান, এবং কুফা ও বসরার সেনাবাহিনীকে তাঁর সঙ্গে যোগদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু এই সময় কুফার শাসনকর্তার মৃত্যু হলে কুফা ও বসরার সৈন্যগণ সেনাপতি মুহাল্লাবকে ত্যাগ করেন। তখন খলিফা ইরাকবাসীদের এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন! হাজ্জাজ অনতিবিলম্বে মাত্র কয়েকজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে অতি প্রত্যুষে শিরস্ত্রাণে মুখমণ্ডল আবৃত অবস্থায় ইরাকে উপস্থিত হয়ে বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আবরণ উন্মোচন করেন। তখন ইরাকবাসী আপন সম্বিৎ ফিরে পেল। তিনি বলেন—"হে কুফাবাসীগণ, আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের মধ্যে বহু মস্তককে কাটবার উপযুক্ত দেখছি, এবং নিশ্চয়ই আমিই উহা করব অনতিবিলম্বে।" পরে তিনি তিনদিনের মধ্যে কুফাবাসীদের মুহাল্লাবের সাথে যোগদানের নির্দেশ দেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বহুলোককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ফলে ইরাকবাসী ভয়ে হোক, ভালবাসায় হোক মুহাল্লাবের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

ইরাক ও পারস্যে খারেজী বিদ্রোহ দমন হাজ্জাজের অন্যতম কৃতিত্ব। সেনাপতি মুহাল্লাব দক্ষিণ পারস্যে খারেজী দমনে ব্যস্ত আছেন, ঠিক সেই সময় মেসোপটেমিয়ায় একদল খারেজী শাবীব ইবন ইয়াজীদের নেতৃত্বে উমাইয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খাঁটি ধর্মপ্রাণ খারেজীগণ বহুক্ষেত্রে সমরে সফলতার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁদের প্রথম দিকের অভিযানগুলো প্রায় সার্থক হয়ে ওঠে। উত্তর ইরাকের কুফা ও মসুল শহর এক সময় তাঁদেরই আয়ত্তাধীনে এসে পড়ে। ৬৯৫-৯৭ পর্যন্ত হাজ্জাজ অবিরাম যুদ্ধ পরিচালনা করেও যখন খারিজী নেতা শাবীবকে দমন করেত সক্ষম হলেন না, তখন মালিকের নিকট সিরিয়া বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং পরবর্তীকালে সিরিয়া-বাহিনী কর্তৃক হাজ্জাজ দ্বারা ইরাকের খারিজী বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। এই সময় খারেজী নেতা শাবীব ইরাক হতে আহওয়াজের দিকে পলায়ন করার সময় একটি নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারান। তাবারিস্তানেও ফাতেবী দল

হাজ্জাজ কর্তৃক পূর্ণভাবেই করতলগত হয়। তখন খারেজীগণ ইরাক ও পারস্য হতে উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে বারবারদের মধ্যে বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে থাকে। এইভাবে ইরাক ও পারস্য হতে খারেজী বিতাড়ন ও দমন হাজ্জাজের অমর কীর্তি।

জানবিলের বিদ্রোহ ঃ সিজিস্তানের রাজা জানবিল কাবুল হতে কান্দাহার পর্যন্ত একটি স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন, এবং কোন একবার উমাইয়া সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানলে হাজ্জাজ তাঁর বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। জানবিল এই বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরবর্তী প্রয়াস চালাতে থাকেন। এদিকে হাজ্জাজ তাঁর পরাজয়ের গ্লানিকে মোচনের জন্য কুফা ও বসরাবাসীদের নিয়ে "ময়ূরবাহিনী' নামে এক সুবিশাল বাহিনী গঠন করেন, এবং ৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে এই ময়ূরবাহিনীকে জানবিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, এতে নেতৃত্ব দেন কুফার আব্দুর রহমান বিন-মুহম্মদ বিন আল আসাথ। ময়ূরবাহিনী জানবিলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে হৃতরাজ্য পুনরাধিকারে সক্ষম হল। অতঃপর হাজ্জাজ তাঁর জন্মগত স্বভাব অনুযায়ী জানবিলের সেনাবাহিনীর উপর অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার করার জন্য সেনাপতি আসাথকে নির্দেশ দিলেন। সেনাপতি আসাথ এই নির্দেশ অমান্য করে ইরাকের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তখন হাজ্জাজ অত্যন্ত বিরক্ত ও বিচলিত হয়ে আসাথকে একটি কড়া পত্র দিলেন। কিন্তু আসাথের সেনাবাহিনী হাজ্জাজের অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম প্রকৃতির জন্য হাজ্জাজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

আসাথের বিদ্রোহ ঃ আসাথ মহাবীর ছিলেন, তাই অন্যায়ভাবে কোন মানুষের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করাকে তিনি কোন দিনই বরদাস্ত করেন নি। ফলে নিষ্ঠুরপ্রাণ, নির্মম হাজ্জাজের সঙ্গে আসাথের বিরোধ বাধল। আসাথের বিদ্রোহে হাজ্জাজ, এমন কি স্বয়ং খলিফাও প্রমাদ গুনলেন। শুধু আব্দুল মালিক নয়, সমগ্র উমাইয়া রাজত্বের এই সময়টি ছিল অত্যন্ত সঙ্কটময় সময়। এইবার খলিফা আকীফ এবং কোরাইশ গোত্র সহ সিরিয়ার বিশাল বাহিনীকে হাজ্জাজের সাহায্যে পাঠালেন। হাজ্জাজ এই সুবিশাল বাহিনী দ্বারা ময়ূরবাহিনীকে পরাজিত করে বসরা দখল করেন। শুধু তা-ই নয়, যে নির্দেশ তিনি সেনাপতি আসাথকে দিয়েছিলেন জানবিলের উপর কার্যকরী করার জন্য, সেই নিষ্ঠুর নির্দেশ আজ নিজেই পালন করলেন আসাথের ১১০০০ নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হাজ্জাজের এই সীমাহীন বর্বরতায় দেশের মানুষ যেন একেবারেই অতিষ্ঠ হয়ে দলে দলে আসাথের সেই ময়ূরবাহিনীতে যোগদান করতে থাকলেন, এতে

ময়ূরবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল ১,০০,০০০ মত। খলিফা আব্দুল মালিক এবারও প্রমাদ গুনলেন। তিনি দেশের জনগণের মনোভাব লক্ষ্য করে দূরদর্শিতার সাথে আসাথের সঙ্গে একটি সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি ছিল— হাজ্জাজের অপসারণ, ইরাকীদের প্রতি ন্যায়বিচার, এবং আসাথকে উচ্চপদে নিয়োগ প্রভৃতি। আসাথ খলিফার এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হলেও তাঁর সেনাবাহিনীর অধিকাংশই অমত প্রকাশ করলেন। ফলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিল। খলিফা বাধ্য হয়ে পুনরায় হাজ্জাজকেই বিশাল বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন। ৭০১ খ্রীস্টাব্দে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধে বীর আসাথ পরাজিত হয়ে কুফা হতে বসরায় পলায়ন করলে হাজ্জাজ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করায় তিনি সিজিস্তানের অধিপতি জানবিলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। জানবিল তাঁকে অতি সমাদরেই আশ্রয় দেন, কেননা জানবিল জানতেন সেনাপতি আসাথের এই দুর্ভোগের একমাত্র কারণ—তিনি একদিন জানবিলের নিরপরাধ মানুষগুলোর উপর কোন অমানুষিক অত্যাচার করতে মোটেই সম্মত হন নি। পরে কিছুদিনের মধ্যেই আসাথ নিহত হন। এইভাবে উমাইয়া রাজত্ব এক ভীষণ সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে মুক্তি পেল। ধীরে ধীরে সকলেই খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করল। হাজ্জাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। বসরা-কুফা-কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলে উমাইয়া রাজত্ব সগৌরবে বিস্তার লাভ করল।

হাজ্জাজ যে পৃথিবীর একজন অন্যতম নিষ্ঠুর ব্যক্তি এ কথা প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সমগ্র জীবনের কার্যকলাপই তাঁর প্রমাণ। এইজন্যই হাজ্জাজকে আরবদের নিরো (Nero of the Arabs) বলা হয়। তাঁর অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না। যত বড় মহৎ ব্যক্তিই হন, প্রয়োজন পড়লে হাজ্জাজ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করতেন, আবার যত বেশি সংখ্যক মানুষই হোক, দরকারে সকলকেই অনায়াসে অবলীলাক্রমে বধ করতেন। উবাইদুল্লাহ ছিলেন কারবালার কসাই, এবং হাজ্জাজ ছিলেন আরবের কসাই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন— হাজ্জাজ তাঁর জীবনে দেড় লক্ষ মানুষকে বধ করেন। অবশ্যএই হত্যাকাণ্ড নিজ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঘটানো হয়নি, হাজ্জাজ যা কিছু করেছিলেন, সবই প্রভু খলিফার মঙ্গলের জন্য। তাই উমাইয়া খেলাফতে হাজ্জাজের অবদান অসীম বললেও অত্যুক্তি হয় না। জগতের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য বহু দয়ার অবতার এসে থাকেন, হাজ্জাজ এসেছিলেন উমাইয়া রাজত্বের মঙ্গলের জন্য নিষ্ঠুরতার অবতার রূপে।

হাজ্জাজ তায়েফের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে মক্কার সামান্য শিক্ষক। পরবর্তী জীবনে আপন যোগ্যতাবলে শুধু কয়েকটি প্রদেশের প্রাদেশিক

শাসকই ছিলেন না, দুজন চরম বিক্রমশালী খলিফার সময়ে সমগ্র উমাইয়া রাজত্বের পরামর্শদাতাও ছিলেন। কখনও বিদ্রোহ দমন, কখনও শান্তি স্থাপন, কখনও সংস্কারকের ভূমিকা পালন, ইত্যাদি বহুমুখী কর্মক্ষেত্রে হাজ্জাজের অবদান উমাইয়া ইতিহাস কোনদিনই ভুলতে পারবে না হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে তায়েফে জন্মগ্রহণ করে ৭১৪ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে আপন প্রতিষ্ঠিত শহর ওয়াসিতে পরলোক গমন করেন। তাঁর সম্পর্কে পরবর্তী আববাসীয় ঐতিহাসিকগণ নানা কটূক্তি করেছেন, তিনি মাত্রাহীন নির্মম ও নিষ্ঠুর রক্তলোলুপ ছিলেন। আবার ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকগণ তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তবে যাই হোক, উপসংহারে আমরা বলতে পারি—হাজ্জাজ নিষ্ঠুরতার দিক থেকে যত নিকৃষ্টই হোন না কেন, উমাইয়া রাজত্বের সংগঠনে ও সংস্কারে, দানে ও অবদানে যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার, যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, তা তুলনাহীন। মানুষ দোষে-গুণে, হাজ্জাজ সেই দোষে-গুণের অসাধারণ মানুষ।

হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার—রাজ্যজয় ঃ উমাইয়া খেলাফতের জনক প্রথম মুয়াবিয়া পরলোকগমন করলে নতুন খেলাফত অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। মুয়াবিয়ার পরবর্তী উত্তরাধিকার অপদার্থ ইয়াজীদের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে রাজ্যমধ্যে নানা বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয়, ফলে আরম্ভ হয় গৃহযুদ্ধ। এবং গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বাইজানটাইন ও বার্বারগণ সংঘবদ্ধ অভিযান চালিয়ে রাজ্যের নানা স্থানে উমাইয়া আধিপত্যকে খর্ব করে। আবদুল মালিককে সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই প্রথম আপন দেশের বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়, পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সুযোগ-সন্ধানী বাইরের শত্রুদের প্রতি।

পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ ও জয় ঃ উমাইয়াদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বাইজানটাইন মুসলিম রাজত্বের বহু স্থান দখল করে নেন। আব্দুল মালিক গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দৃষ্টি দিলেন বাইজানটাইনদের প্রতি, খলিফা তাঁর সেনাপতিদের অনতিবিলম্বে এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া ও আফ্রিকার উপকূলে হৃতরাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান চালাতে নির্দেশ দিলেন। বাইজানটাইনগণ মুসলমানদের অ্যান্টিয়ক (Antioch) দখল করলে মুসলিম সেনাবাহিনী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে ইরজিরোম পর্যন্ত বিতাড়িত করেন। এই সময় অনেক দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। পূর্বাঞ্চল অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ও ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেন, "পূর্বদিকে কাবুল অঞ্চলে রাটবিল (Ratbil) নামক যে হিন্দু যুবরাজ রাজত্ব

করছিলেন, সেই অঞ্চলও মুসলমানদের করতলগত হয়।"

উত্তর আফ্রিকা পুনরুদ্ধার :

প্রথম মুয়াবিয়ার সময় মুসলিম আলেকজাণ্ডার ওকবা বিন নাফি উত্তর আফ্রিকা জয়ে যে বীরত্ব দেখিয়েছেন তা তুলনাহীন। কায়রোওয়ানে তিনি এক বলিষ্ঠ সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে কায়রোওয়ানকে উত্তর আফ্রিকার রাজধানীতে পরিণত করেন। এই কায়রোওয়ান থেকে মুসলিম বাহিনী ওকবার নেতৃত্বে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সময় তিনি তাঁর বিশাল বাহিনীকে অন্যপথে অন্য স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে একাকী সামান্য কয়েকজন অনুচরসহ কায়রোওয়ান ফেরার পথে ৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে আলজিরিয়ার তাহুজী নামক স্থানে অতর্কিত রোমান ও বার্বারদের সংঘবদ্ধ নৃশংস আক্রমণে তাদের নেতা কুসাইলার হাতে প্রাণ হারান। এই বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতির প্রাণ বিয়োগের পর উত্তর আফ্রিকা পুনরায় বার্বার ও রোমানদের হস্তগত হয়। দীর্ঘ ১০ বছর পর আব্দুল মালিক ৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে জুহাইয়ের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। বীরবর জুহাইর সম্মুখ সমরে কুসাইলাকে পরাজিত করে হৃতরাজ্য উত্তর আফ্রিকা পুনর্দখল করেন। কিন্তু তিনিও ওকবার ন্যায় একই ভুল করেন। সমগ্র বাহিনীকে অন্যস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে অল্প সংখ্যক অনুচরসহ যখন বার্কায় অবস্থান করছিলেন, ঠিক ঐ সময় অতর্কিতে বার্বার ও বাইজানটাইনদের সম্মিলিত আক্রমণে সেনাপতি জুহাইর নিহত হন।

মুসলিম আলেকজাণ্ডার ওকবার মৃত্যুতে মুয়াবিয়া যেমন মর্মাহত হয়েছিলেন, সুদক্ষ যোদ্ধা জাহাইয়ের মৃত্যুতেও আব্দুল মালিকও তেমনি মর্মাহত হয়ে শত্রুদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাসান-বিন নোমানের নেতৃত্বে ৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী কায়রোয়ান নগর হতে কার্থেজ নগরীর দিকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিতাড়িত করে কার্থেজ, বার্কা ও অন্যান্য স্থানগুলো দখল করেন। ফলে উমাইয়াদের আধিপত্য বার্কার প্রাচীর হতে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বার্বারিগণ তাদের পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। এই সময় তাদের মধ্যে কাহিনা নাম্নী এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না মহিলার আবির্ভাব ঘটায় তারা তাঁর নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে নব উদ্দীপনায় নতুন উৎসাহে মুসলিম সেনাপতি হাসানের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ

চালিয়ে হাসানকে পরাজিত করে নিজ দেশ উদ্ধার করে দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ কাহিনাকে একচ্ছত্র রাণীর মর্যাদা দান করে। ৭০০ খ্রীস্টাব্দে খলিফা হাসানকে সাহায্য করার জন্য এক বিরাট বাহিনীকে প্রেরণ করলে সেনাপতি হাসান অমিতবেগে কাহিনার দলবলকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেন, এবং এক বিপদসঙ্কুল পার্বত্য অঞ্চলে কাহিনা সদলবলে পরাজিত হন এবং নিজে প্রাণ হারান। কাহিনার মৃত্যুতে বার্বারিগণ একেবারেই নিরুৎসাহিত হয়ে মুসলমানদের সাথে যোগদান করে। মুসলমানগণ বার্বারিদের এই বিশাল সংখ্যক (১২,০০০০) বাহিনীকে সাদরে বরণ করে মুসলিম-ভ্রাতৃত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তকে জীবন্ত রূপ দান করেন। অতঃপর হাসান উত্তর আফ্রিকা হতে সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করলে গ্রীক সম্রাট লিওন্‌টিয়াস এক বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে কার্থেজ দখল করে মুসলমানদের বার্কায় বিতাড়িত করেন। এই সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি আব্দুল মুসা-ইবন-নুসায়েবকে উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করে কার্থেজ পুর্নদখল করেন, এবং উমাইয়া আধিপত্য পুনরায় আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ঃ

মৃত্যুর পূর্বে পিতা মারওয়ান তাঁর দুই পুত্র আব্দুল মালিক ও আব্দুল আজীজকে যথাক্রমে বা পর্যায়ক্রমে খলিফা মনোনীত করে যান। কিন্তু আব্দুল মালিক আপন ভ্রাতার দাবীকে অগ্রাহ্য করে আপন পুত্র ওয়ালিদকে খলিফা মনোনীত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভ্রাতা আব্দুল আজীজ ঐ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। হাজ্জাজ এই ব্যাপারে খলিফাকেই সমর্থন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আব্দুল আজীজের মৃত্যু হলে খলিফা অতি সহজেই ৭০৪ খ্রীস্টাব্দে পুত্র ওয়ালিদকে ভাবী খলিফা মনোনীত করেন। এবং সমগ্র দেশের জনগণ ওয়ালিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কেবলমাত্র মদীনাবাসীগণ খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করলে খলিফা কঠোর হস্তে তাদের বিদ্রোহকে দমন করে সকলেরই আনুগত্য আদায় করেন। অতঃপর ২০-২১ বছর রাজত্ব করার পর ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর ৬০-৬২ বছর বয়সে আব্দুল মালিক পরলোক গমন করেন।

আব্দুল মালিকের প্রশাসন পদ্ধতি ও সংস্কার (Administrative Policy of Malik) ঃ

ভূমিকা ঃ এক নজরে আরব ইতিহাসের গতিকে ও প্রকৃতিকে একটু ধীর স্থির ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আরব ইতিহাস একটি গতিশীল নদীর

মতো—যা কখনও ধীর প্রশান্ত, কখনও বা উত্তাল, প্রচণ্ড ভয়াবহ। মহানবীর পূর্বে আরবের ইতিহাস উত্তাল-উচ্ছৃঙ্খলতায় ভয়ঙ্কর-ভয়াবহ। সে উত্তাল তরঙ্গকে মহানবী (দঃ) ধীর প্রশান্ত গতিতে ফিরিয়ে আনলেন (৫৭০-৬৩২ খ্রীস্টাব্দ)। মহানবীর পরে আবার সেই জাতীয় ইতিহাসের ভয়াবহ রুদ্রমূর্তি। হযরত আবুবকর (রাঃ) আবার তাকে ধীর গতিতে ফিরিয়ে আনেন (৬৩২-৩৪ খ্রীস্টাব্দ)। হযরত ওসমানের পর আবার সে যেন তার আপন গতিতে মেতে উঠল (৬৩৪-৬৫৬ খ্রীস্টাব্দ)। এবারে গতির রূপটা ছিল একটু অন্য ধরণের, যেন গৃহযুদ্ধের পূর্বাভাষ। হযরত আলীর সমগ্র খেলাফতটাই এই ভাবেই কাটল (৬৫৬-৬১ খ্রীস্টাব্দ)। এই উত্তাল তরঙ্গের শিকারে পরিণত হলেন শহীদ হযরত ওসমান (রাঃ), শহীদ হযরত আলী (কঃ), শহীদ ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)। এঁরা প্রত্যেকেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তার প্রচণ্ডতায় প্রাণ হারালেন, শহীদ হলেন। এ ছাড়া, অসংখ্য ব্যক্তি এই ঝঞ্ঝায় শাহাদত বরণ করলেন। এরপর এলেন উমাইয়া রাজত্বের জনক মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮১ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির হাল ধরলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আরব ইতিহাসে আবার প্রশান্ত ভাব ফিরে এল। অতঃপর মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজীদের সিংহাসন লাভের পরই আরব-ইতিহাস তার গতিতে খরস্রোত ও কোবান হয়ে উঠল (৬১-৮৩ খ্রীস্টাব্দ)। ইয়াজীদের পর দু বছরের জন্য মারওয়ানের সময়ও তাই ছিল (৬৮৩-৮৫ খ্রীস্টাব্দ)। অতঃপর ঐ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের হাল ধরলেন মারওয়ান-পুত্র আব্দুল মালিক (৬৮১-৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি জাতির এই বিক্ষুব্ধ ধারাকে ও গৃহযুদ্ধকে যে ভাবে মোকাবিলা করলেন, তা বর্ণনাতীত, পরে দৃষ্টি দিলেন শাসনে ও সংস্কারে।

ডাক বিভাগের সংস্কার ঃ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। মুয়াবিয়া সেই ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি করেন। এই বিভাগকে দিওয়ুনুল বারিদ বলা হত। খলিফা আব্দুল মালিকের সময় গৃহযুদ্ধের অবসানে রাজ্যের সীমা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। অবশ্য তখনও রাজ্যের নানা স্থানে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত ছিল। আব্দুল মালিক বুঝতে পেরেছিলেন এই ধূমায়িত বহ্নিকে সম্পূর্ণ প্রশমিত না করতে পারলে এটা আবার একদিন অগ্ন্যুৎপাতের রূপ নেবে। তাই তিনি সত্বর জানতে চাইলেন রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে। এই সত্বর সংবাদ সরবরাহের জন্যই ডাক বিভাগের দ্রুত উন্নতি ও সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাজধানী দামেস্কের সঙ্গে প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর দ্রুত যোগাযোগ রক্ষার জন্য ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করা হল। এই ক্ষেত্রে পারস্য শাসন-ব্যবস্থার প্রভাব

মুসলিম ডাক বিভাগে পরিলক্ষিত হয়। এই ডাক বিভাগের কাজ যাতে কোনরূপে ব্যাহত না হয়, তার জন্য খলিফা রাস্তা ও সড়কের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেন। রাস্তা ও সড়ক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে খলিফা প্রতিটি রাস্তার সঙ্গম স্থানে যোগাযোগ রক্ষাকারী বদলী ঘোড়ার (Relay of horses) ব্যবস্থা করেন। ডাক বিভাগের কর্মচারীগণ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ডাক পরিবেশন করতেন। যাতে যথাসময়ে সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছায়। প্রাদেশিক শহরগুলো তাদের সংবাদ সরাসরি রাজধানী দামাস্কে পাঠাতেন। এবং এই প্রাদেশিক শহরগুলো নিজেদের মধ্যেও ডাক বিনিময় করতেন। ডাক বিভাগের প্রধানকে সাহিব-উল-বারিদ বলা হত। ডাক বিভাগের কর্মচারীগণ গোয়েন্দা বিভাগেরও কাজ করতেন।

রাজস্ব সংস্কার ঃ আব্দুল মালিক খেলাফত লাভ করার পরই দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়েন। রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামও বিস্তার লাভ করে। তখন রাজস্ব আদায়ের নিয়ম ছিল—নব দীক্ষিত মুসলমান বা মাওয়ালীদের ইসলামের বিধান মত শুধু যাকাৎ নামে একটি কর দেবে। অ-মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরিবর্তে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রোমানদের প্রথামত জিজিয়া কর দিতে হয়। এবং জমি-জায়গার জন্য খারাজ নামে রাজস্ব দিতে হত। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন জিজিয়া দিতে হত না। যেহেতু তাঁদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করাটা ছিল বাধ্যতামূলক কাজ। মুসলমানদের কোন জমি-জায়গার কর দিতে হত না। কিন্তু যাকাৎ নামে একটি গরিব কর দিতে হত—শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে।

এই অবস্থা চলতে থাকায় বহুলোক ইসলামের মাহাত্ম্যে নয়, শুধু জিজিয়া ও খারাজ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যই মুসলমান হতে থাকলেন। এতে একদিকে মুসলমান বাড়তে থাকল, কিন্তু অন্যদিকে রাজকোষও শূন্য হতে থাকল। তখন খলিফা একটি ফরমান জারি করলেন—অ-আরবীয় কেউ মুসলমান হলেও তাঁকে ভূমি-রাজস্ব খারাজ দিতে হবে। এতে রাজকোষে অর্থাগমের পথ কিছুটা সুগম হলেও অন্য একটি ত্রুটিও লক্ষ্য করা গেল। হযরত ওসমান আরব মুসলমানদের অ-আরবীয় অঞ্চলে জমি-জায়গা ক্রয়ে অনুমতি প্রদান করে পরিস্থিতিকে সংকটময় করেছিলেন। মুসলমানদের যাকাৎ ব্যতীত কোন কর দিতে হত না, আবার সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য ভাতাও পেতেন। তিনি এই নিয়ম রহিত করেন এবং হযরত ওমরের নীতির পুনঃ প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ আরব মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন—তাঁরা কোন অ-আরবীয় অঞ্চলে কোন অমুসলমানের জমি ক্রয় করতে পারবে না। এইভাবে খলিফা

অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিভ্রান্তিকর রাজস্ব-ব্যবস্থার পূর্ণ সংস্কার করে রিক্ত রাজকোষকে পূর্ণ করে তোলেন। তাঁর প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থায় মোটামুটি চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : (১) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও কোন অ-আরবীয় মুসলমান বা মাওয়ালীই ভূমি-রাজস্ব বা খারাজ হতে মুক্তি পাবে না। (২) ভূমি কর যাতে হ্রাস না পায়, তার জন্য সকল আরবীয় মুসলমানের অ-আরবীয় অঞ্চলে জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করলেন। (৩) খলিফা বিনা করে দেশের পতিত ও অনুর্বর জমিগুলোকে গরিব মানুষের জন্য তিন বছরের মেয়াদে বিলি করার বন্দোবস্ত করে দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করেন। (৪) খলিফা ফরমান জারী করলেন কোন ধনী ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত কোন উর্বর ভাল জমিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখলে তা সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হবে। এইভাবে খলিফা তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদনের প্রতি অত্যন্ত জোর দেন। শাসন ব্যবস্থায় তিনি নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছাড়া হাজ্জাজের পরামর্শকেও সংস্কারের সময় গ্রহণ করেছেন, কোথাও অতীতের খলিফাগণের শাসনপ্রণালীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্তকে দেশবাসীর কল্যাণে প্রয়োগ করেছেন। যে শক্ত হাতে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক বিদ্রোহের বন্যাকে, প্রলয়ের প্লাবনকে একদিন তিনি জমাট বরফে পরিণত করেছিলেন, সেই শক্ত হাতেই আজ আবার তুলে ধরলেন শাসন ও সংস্কার, যাতে স্থান পেল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। খলিফা মুক্ত মনে তাঁর শাসনে ও সংস্কারে সবার নিকট হতে সবকিছুকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি আজও বিশ্বশাসনে ও সংস্কারে অনুসরণযোগ্য। বার্নার্ড লুইস বলেন, "আব্দুল মালিক ও তাঁর উপদেষ্টাগণ রাজস্ব ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ পথ আবিষ্কার করেন যা তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে একটি অভিনব ও বিশেষ ইসলামি কর-ব্যবস্থায় পরিণত হয়।" ভারতে শেরশাহের রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পশুশালা প্রস্তুত, ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা ইত্যাদির তিনিই ছিলেন পথিকৃত।

আব্দুল মালিকের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কার (The Socio-economic Reforms of Abdul Malik) :

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-কে বাদ দিলে দেশের সংস্কারমূলক কাজে আব্দুল মালিকের স্থান তুলনাহীন। আব্দুল মালিক যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন অমাবস্যার ন্যায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসন্তোষ, কারণে-অকারণে মারাত্মক কলহ, সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ, আত্মঘাতী অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, অন্যায়, অত্যাচার, অরাজকতা, এক কথায় দেশজোড়া ত্রাসের রাজত্ব চলছিল। এই অবস্থায় আব্দুল মালিক দৃঢ়চিত্তে এবং কঠোর হস্তে এই বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করে উমাইয়া

রাজত্বকে এক অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন। তাই আব্দুল মালিককে উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। খলিফা হিসেবে তিনি এই প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব নিয়ে অস্থিরতা দূর করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীলতা কায়েম করার জন মনোসংযোগ করেন, এবং সমগ্র দেশে সৃষ্টি করেন সংস্কারোপযোগী এক সুন্দর পরিবেশ। অতঃপর আরম্ভ করলেন এক হাতে সংস্কার, অন্য হাতে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার। অযোগ্য ও অপদার্থ খলিফা ইয়াজীদের সময় হতে যে সমস্ত বিজিত অঞ্চলগুলো হাতছাড়া হয়েছিল, সেগুলোকে তিনি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে মুসলিম রাজত্বের সীমা বৃদ্ধি করেন। এর ফলে তাঁর পুত্র প্রথম ওয়ালিদ পূর্বে আমুর দরিয়া হতে আইবেরীয়ান উপদ্বীপ পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে আমরা প্রধানত পাই শাসন-ব্যবস্থার জাতীয়করণ, আরবী মুদ্রার প্রচলন, আরবী ভাষার আমূল উন্নতিকরণ, ডাক বিভাগের উন্নতি, কৃষিবিভাগের উন্নতি, রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্তন ইত্যাদি, যার দ্বারা তিনি ইসলামের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন। ঐতিহাসিক স্ফুলার যথার্থই বলেছেন, "আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ ছিল।" সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দমন, গোত্রে-গোত্রে গৃহযুদ্ধের অবসান, শাসনে শান্তি প্রতিষ্ঠা, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে বলিষ্ঠ সংগঠন ও উপযুক্ত সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি সমাজের সংস্কার দ্বারা জাতীয় জীবনের উত্থান ইত্যাদি খলিফা আব্দুল মালিকের অক্ষয় অমর কীর্তি।

শাসন-ব্যবস্থার জাতীয়করণ ঃ মহানবী (দঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র শুধুমাত্র আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই সেদিন শাসনে-প্রশাসনে কোন ভাষা-সমস্যা দেখা দেয় নি। খলিফা-ওমরের (রাঃ) সময় মুসলিম সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃতি লাভ করলেও খলিফা সকল দেশকেই আপন আপন ভাষাতেই শাসনকার্য পরিচালনার অনুমতি দিলেন। কেননা, পরিস্থিতি তখন এমন ছিল— সুদূর মক্কা বা মদীনা থেকে আরবীয় ভাষার মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলগুলোকে শাসন করা সম্ভব ছিল না। যার জন্য ইরাক ও পারস্যে পাহ্লভী, মিশরে কপটিক, সিরিয়ায়—সিরিয়ক, বাইজানটাইনে (রোমে)—গ্রীক প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত অঞ্চলের প্রশাসনে আঞ্চলিক লোকেদেরই নিযুক্ত করা হত। যাতে সেখানে নব অধিকৃত অঞ্চলসমূহের প্রজাবর্গের অসুবিধা না হয়। ধর্মপ্রাণ খোলাফায়ে রাশেদীন (সৎখলিফাগণ) এই প্রথাই প্রচলিত রেখেছিলেন। উমাইয়া খেলাফতের জনক মুয়াবিয়াও ঐ একই প্রথা প্রচলিত

রাখেন। এমন কি মুয়াবিয়া তাঁর কেন্দ্রীয় রাজধানীর রাজকার্য পরিচালনাতেও যোগ্য রোমান, গ্রীক, খ্রীস্টান, অ-মুসলমানদেরও নিযুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। যোগ্যতার জন্য খ্রীস্টান ইবন উথালকে তিনি তাঁর গুরুত্বপুর্ণ দপ্তরের রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করেছিলেন।

আব্দুল মালিক সমগ্র রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাকে সুসমঞ্জস্যভাবে পরিচালিত করার জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন সমগ্র সাম্রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় ভাষা থাকা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রীয় ভাষা রূপে তিনি তাঁর মাতৃভাষা আরবীকে গ্রহণ করেন। এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা একটি প্রশিক্ষণ শিবির খোলেন। যে প্রশিক্ষণ শিবির অসংখ্য যোগ্য প্রশাসকের জন্ম দেয়। অতঃপর ৬৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দে আরবী ভাষাকে সমগ্র সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। আরবী ভাষাকে সরকারি ভাষা করার মূলে প্রধানত কয়েকটি কারণ দেখা যায়, যেমন— (১) সমগ্র রাজ্যে একই ভাষার মাধ্যমে একই শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন, (২) কেন্দ্রের সঙ্গে প্রাদেশিক যোগাযোগকে সহজ করা, (৩) এক প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা অন্য প্রদেশের কর্মচারীদের সহজে বোধগম্য না হওয়ায় প্রশাসনের সকল শাখায় যে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল, তার দুরীকরণ, (৪) কোন বিশেষ যোগ্য প্রশাসককে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করা বা কেন্দ্রে আনয়ন করা, (৫) শাসিতের ভাষার উপর শাসকের ভাষাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া ও আরবী ভাষাকে রাজ-সম্মান দান করা। শাসন-ব্যবস্থাকে আরবীকরণ করার মূলে এই সমস্ত কারণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশাসনে আরবী ভাষাকে জাতীয়করণ করার সঙ্গে সঙ্গে একদিনের অসভ্য আরবদের আরবী ভাষা সভ্য মিশর, আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। রাজশক্তি, রাজ-আদেশ এমনি অনিবার্য যেমন হয়েছিল ভারতে একদিন পারস্য ভাষা, এবং আজও ইংরেজী ভাষা। আজও ভারতে এমন অনেক সুশিক্ষিত মানুষ আছেন, যাঁরা আপন ভারতীয় ভাষা ভাল ভাবে জানুন আর নাই জানুন, ইংরেজী ভাষাতে চোস্ত পণ্ডিত। ইংরেজী যদি এইভাবে তাঁর আপন মাতৃভাষাকে তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিকড় গাড়িয়ে না যেতেন, তাহলে ইংরেজীও আজ আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করত না। এইভাবে আরবী ভাষা খলিফা আব্দুল মালিকের প্রচেষ্টায় নতুন গৌরব লাভ

করল। পবিত্র কোরআন আরবী ভাষাতে অবতীর্ণ হওয়ায় আরবী ভাষা বিশ্ব-মানবের নিকট বিশ্ব-মর্যাদা লাভ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আরবী ভাষা গৌরব লাভ করল খলিফা আব্দুল মালিকের হাতে। তাই যতদিন পবিত্র কোরআন আছে, তত দিন আছে আরবী ভাষা, এবং ততদিন থাকবে খলিফা আব্দুল মালিকের অমরত্ব । বার্নার্ড লুইস বলেন, " আরব ঐতিহাসিকদের মতে আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে সংগঠন ও সুবিন্যস্ত নামে একটি পন্থা প্রচলিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে প্রবর্তিত পুরাতন শাসন-ব্যবস্থাব. পরিবর্তে আরবীকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দান করে খলিফা একটি নূতন আরব-রাজকীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করেন।" এই শাসন-ব্যবস্থার জাতীয়করণ করার পর হতেই খলিফা সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার সাথে সরাসরি আলোচনার সুযোগ পেলেন। সুতরাং শাসনক্ষেত্রে খলিফার এটা এক যুগান্তকারী সংস্কার।

আরবী অক্ষরের উৎকর্ষ সাধন ঃ খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আরবী বর্ণমালার উন্নতি সাধন। প্রথমে আরবী বর্ণমালার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হত না। যার ফলে একই শব্দের বিভিন্ন ধরণের উচ্চারণের সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয়, আরবী অক্ষরে পূর্বে কোন নোক্তার বা বিন্দুর ব্যবহার না থাকায় অ-আরবীয় মুসলমানগণ অক্ষরের পার্থক্য করতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতেন। তৃতীয়, পূর্বে আরবী অক্ষরে কোন হরকতের বা জেরজবর ও পেশের অর্থাৎ আকার, একার, ও উকারের প্রচলন না থাকায় মুসলমানদের পক্ষে আরবী পড়া অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। এই কয়েকটি প্রধান অসুবিধার জন্য খলিফা তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হাজ্জাজ-দ্বারা আরবী ভাষাতে সর্বপ্রথম নোক্তা ও হরকতের প্রচলন করেন। নোক্তা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বিন্দু, যেমন— য এবং য়, ব এবং র ইত্যাদি। আরবীতে— বে, তে, ছে, নু, জিম, খে, ইত্যাদি। হরকত্ অর্থাৎ বাংলার আকার, একার, উকার।

আজকের দিনে সারা বিশ্বে মুসলমানের ঘরে ঘরে (মূল আরবী) পবিত্র কোরআন শুধু প্রচলিতই নয়, বরং পঠিতও। এই পাঠ করাটা ধর্মপ্রাণ মুসলমান নর-নারীর নিকট ধর্মীয় কাজ। তাই এমন অসংখ্য মুসলমান আছেন, যাঁরা নিজের মাতৃভাষাও পড়তে পারেন না, কিন্তু কোরআন শরীফ পড়তে পারেন। এ আক্ষরিক জ্ঞান তাঁদের আছে। এখন জিজ্ঞাসা—যদি বর্তমানের আরবী কোরআন শরীফে কোন নোক্তা বা বিন্দু না থাকত, কোন হরকত বা আকার-একার-উকার না থাকত, তা হলে সারা বিশ্বের কতজন নিরক্ষর ব্যক্তি বা মুসলমান কোরআন

শরীফ পড়তে বা তোলায়াৎ করতে পারতেন। লাখে বা কোটিতে একজন ভাল ভাবে পারতেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহের কথা। সুতরাং লাখে লাখে মানুষকে যিনি কোরআন শরীফ পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁর গৌরব নিঃসন্দেহ কম নয়। মুসলিম জাহানে নিরক্ষরতা দূরীকরণেও খলিফার অবদান কম নয়। কেননা, মুসলিম জাহানে নিরক্ষর নর-নারী খুবই কম। বিশেষ করে নিরক্ষর নারী নেই বললেই চলে। অতি গরিবের মেয়েও তার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত যার কাছেই হোক, যেমন করেই হোক কোরআন শরীফটা পড়া শিখে নেয়। তাই মুসলমানদের অধিকাংশই এই কোরআন শরীফের মাধ্যমে আক্ষরিক জ্ঞান লাভ করেছেন। এবং এই কোরআন শরীফকে যার মাধ্যমে সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছেন, সেটা আব্দুল মালিকেরই অসামান্য কীর্তি ও আবিষ্কার—"নোক্তা ও হরকতের" প্রচলন। নিঃসন্দেহে আরবী ভাষাতে এই সংস্কার ও সংযোজন এক অসামান্য আবিষ্কার। খলিফা আব্দুল মালিকই এই অসামান্য গৌরবের অধিকারী। ধর্মীয় দিক থেকে দেখতে গেলে এর মূল্যায়ন আরো অনেক বেশি। মহানবী (দঃ) বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি বিনা জাগতিক স্বার্থে কোন ব্যক্তিকে কোরআন শরীফ পড়া শিখিয়ে দেন, তাহলে ঐ ব্যক্তি যত দিন কোরআন শরীফ পড়বেন এবং পড়ার জন্য যত নেকী (পুণ্য) পাবেন, তাঁর শিক্ষকও ঠিক তত পূণ্যই পাবেন"। এই হাদিস মূলে খলিফা আব্দুল মালিক বিশেষ করে পবিত্র কোরআন থেকে যে পূণ্য পাবেন, মহানবীর (দঃ) আর ক'জন উম্মৎ বা শিষ্য তা পাবেন সে কথা বলা অত্যন্ত শক্ত। অতএব, আরবী ভাষার উৎকর্ষ সাধনে খলিফা আব্দুল মালিকের যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, তা নিঃসন্দেহে এক অসামান্য অমর অবদান ও অক্ষয় কীর্তি। বর্তমান বিশ্বের বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ভারতের জাতীয় অধ্যাপক আমার স্বর্গত পূজনীয় শিক্ষক আচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোরআন শরীফ আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—"আব্দুল মালিক বর্তমান আরবী ভাষার জনক, তাঁর প্রচেষ্টা ব্যতীত আরবী ভাষা কোন দিনই বর্তমান বিশ্বে এত সহজে প্রসারলাভ করত না। আল্লাহর ও হযরত মহম্মদ্ (দঃ)-এর বাণীকে ভাষা সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের নিকট পৌঁছবার পথকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়ে গেছেন। তাঁকে আমরা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের জনক বাদশাহ হোসেন শাহের সাথে তুলনা করতে পারি। দুজনেই দুটি সম্পদশালী ভাষাকে সমৃদ্ধশালী ও প্রাণবন্ত করে গেছেন, আপন আপন সংস্কারের মাধ্যমে তাদের শ্রীবৃদ্ধি করে গেছেন। দুজনেই মহৎ।" তাই আরবী ভাষার সংস্কারক আব্দুল মালিক আজও আরব দুনিয়ার তথা সারা দুনিয়ার বরেণ্য পুরুষ।

আরবী বা মুসলমানী মুদ্রার প্রচলন ঃ মহানবী (দঃ)-এর সময় হতে আব্দুল মালিকের পূর্ব পর্যন্ত আরবদের কোন নিজস্ব মুদ্রা বা টাকশাল ছিল না। সে সময় দেশে প্রচলিত ছিল রোমান ও পারসিক মুদ্রা, কোথাও কোথাও হিম্যারী রৌপ্য মুদ্রারও প্রচলন ছিল। হযরত ওমরের (রাঃ) সময়ও রোমীয় স্বর্ণমুদ্রা ও সাসানীয় রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার ছিল। বিজিত অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা আপন আপন টাকশালে মুদ্রার উপর কোরআন শরীফের আয়াত (বাক্য) বা কলমা খোদাই করা থাকত। কিন্তু সারা সাম্রাজ্য জুড়ে একই রকম নীতি পালন করা হত না। এমন কি, মুদ্রার ছাপ, ওজন, আকৃতি এবং মূল্যও সর্বত্র এক ছিল না। উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার পরও মুয়াবিয়ার মত খলিফাও প্রাচীন রোমান স্বর্ণমুদ্রা দিনারিয়াস (Denarius) ও সাসানীয় রৌপ্যমুদ্রা ড্রাকমার ব্যবহার চালু রাখেন। কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ রদবদল করেছিলেন। তবে তা অতি নগণ্য।

আরব জাহানে জাতীয় টাকশালের প্রবর্তন খলিফা আব্দুল মালিকের অপর এক অমরকীর্তি। ৬৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি দামেস্কে একটি জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। এবং সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে সম্পূর্ণ আরবী অক্ষরযুক্ত নির্দিষ্ট একই মানের দিনার স্বর্ণমুদ্রা, দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা, ও ফালুস্ তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। পরবর্তীকালে হাজ্জাজকেও কুফা হতে দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা ছাপার অনুমতি দেওয়া হয়। সমগ্র দেশে একই মানের একই মুদ্রা প্রচলিত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করে। দেশের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধে প্রসার লাভ করায় সাধারণ মানুষ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই মুদ্রা ছাপার দায়িত্ব পেল। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে খলিফা প্রয়োজনবোধে অনুমতি দিতেন মাত্র। দূরদর্শী খলিফা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিলেন যাতে কোথাও কোন জাল মুদ্রার আবির্ভাব না ঘটে। তাঁর এ পদক্ষেপ সফল ও সার্থক হয়েছিল। প্রতিটি মুদ্রায় কয়েকটি জিনিস মুদ্রিত হত, বিশেষ করে কল্‌মা, টাকশালের নাম ও মুদ্রাঙ্কনের তারিখ থাকতই। খলিফা আব্দুল মালিক সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে এই যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা তাঁর মূল কাজকে অর্থাৎ আরবী শাসন-ব্যবস্থার প্রচলনকে অনেকখানি ত্বরান্বিত ও সহজ করেছিল। আরব জাতীয় টাকশাল তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। মুদ্রা সংস্কার খলিফার চরম রাজনৈতিক মেধার স্বর্ণস্বাক্ষর।

একটি কথা উল্লেখ না করলে এই প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একটা দেশের সংস্কার ও সংস্কৃতি ঐ জিনিস, যা সকল দেশের সুন্দর ও শোভনীয় জিনিসগুলিকে আপন ঐতিহ্যের সাথে একত্রিত করে। খলিফা আব্দুল মালিক

ঐ ভাবে বহু দেশের বহু সুন্দর জিনিসকে এক করেছেন, একত্রিত করেছেন আপন দেশে। তাই আরবী মুদ্রাতে আজও লক্ষ্য করি বাইজানটাইন ও সাসানীয় প্রভাব। বাইজানটাইনের দিনারিয়াম আরবে হল দিনার, সাসানীর ড্রাকমা হল দিরহাম। বিশুদ্ধ আরবী মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিলমান বলেন, "আব্দুল মালিকের রাজত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই সময় সারাসেনগণ সর্বপ্রথম নিজেদের জন্য মুদ্রা তৈয়ার করেন।" এই অধ্যায়ে লক্ষণীয়—সংস্কারক মালিক শাসক মালিককেও যেন অতিক্রম করেছেন।

আব্দুল মালিকের চরিত্র ঃ

খলিফা আব্দুল মালিককে উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার গৌরব দান করলেও অনেক ঐতিহাসিক তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন; বিশেষ করে আববাসীয় যুগের ঐতিহাসিকগণের অনেকেই অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এটা মনে হয় তখনকার জ্ঞাতিহিংসা বা গোত্রকলহের জের। তাই তাঁরা রক্তলোলুপ বিশ্বাসঘাতক খলিফা বলে তাঁর চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। তাঁদের কথাগুলো অতিরঞ্জিত হতে পারে, তবে মিথ্যা নয়। ঐতিহাসিক মাসুদীর মতে —"আব্দুল মালিকই সর্বপ্রথম খলিফা যিনি বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে হত্যা করেন।" তিনি বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে হত্যা করেছেন, এ কথা সত্য হতে পারে কিন্তু আব্দুল মালিকই এই ব্যাপারে প্রথম খলিফা একথা আদৌ সত্য নয়। যিনিই নিরপেক্ষভাবে হযরত ওসমান হত্যার পর হতে আব্দুল মালিকের পিতা মারওয়ান পর্যন্ত ইতিহাস লক্ষ্য করবেন, তিনি এ কথা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেন না। মুইর বলেন, "আসর-ইবন সাইদ ছাড়া কোন ব্যক্তির প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা আব্দুল মালিক গ্রহণ করেন নি। কোন বিদ্রোহী শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তিনি বার বার আত্মসমর্পণের ও অনুকম্পা গ্রহণের সুযোগ দিতেন।" আমীর আলী বলেন, "তিনি নিশ্চয়ই জার্মানীর শার্লেমেন অপেক্ষা কম নিষ্ঠুর ছিলেন।" (He was certainly less cruel than Charlemagne)

খলিফা আব্দুল মালিককে অনেকেই রক্তলোলুপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তিনি নাকি তাঁর আপন চাচাত ভাই ও একসময় দামাস্কের শাসনকর্তা আমর-বিন সাইদকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেই অতর্কিতে হত্যা করেন। হাজ্জাজ-বিন ইউসুফের বর্বরতা নিষ্ঠুরতাকে আব্দুল মালিকের খেলাফতের কলঙ্ক বলেই অভিহিত করা হয়। "আরবনিরো" হাজ্জাজ নাকি এক হাতে দেড় লক্ষ মানুষকে হত্যা করেন। এবং অসংখ্য মানুষকে কারারুদ্ধ

করেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ও ৫০,০০০ নর-নারী কারারুদ্ধ ছিল। আব্দুল মালিকের খেলাফতে যে মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাত ঘটতে দেখা যায় তার পেছনে প্রধানত দুটো কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি তদানীন্তন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, কলহ, সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ। বিদ্রোহের প্রচণ্ড প্রতাপ, অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদিকে দূর করে রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কায়েম করার জন্যে তিনি হয়তো বাধ্য হয়েছিলেন ঐরূপ কঠোরতা অবলম্বন করতে। নচেৎ উমাইয়া রাজত্বের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছিল। দ্বিতীয়টি পরিবেশের প্রভাব। আব্দুল মালিক বাল্যকালে দেখলেন হযরত ওসমান হত্যা, কারবালার করুণতম দৃশ্য, পরিণত বয়সে দেখেছেন ইয়াজীদ কর্তৃক মদীনা লুঠ, মক্কার পবিত্র কাবাতে অগ্নিসংযোগ, আপন ঘরে সৎ-মা কর্তৃক পিতা মারওয়ান হত্যা ইত্যাদি ঘটনাগুলো তাঁর মনের উপর স্বভাবতই প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে তাঁর অবচেতন মন এই প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। পবিত্র মানব মহানবী রসুলে আকরম হযরত মহম্মদ (সাঃ) বাল্যকালে মা হালিমার গৃহে অবস্থানকালে তাঁর ছেলে-মেয়েদের সাথে পশু চরাতেন। পরবর্তীকালে এই পশু-প্রাণীদের প্রতি কোথাও নির্মম ব্যবহার দেখলে মহানবী তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যেতেন, রুখে দাঁড়াতেন তার বিরুদ্ধে। মানুষ পরিবেশ গড়ে, আবার পরিবেশও মানুষ গড়ে। আব্দুল মালিকের চরিত্রে দুটোই সত্য। যদিও মহানবীর (দঃ) সাথে কারো তুলনা চলে না। কেননা তিনি রাহ্‌মাতাল্লিল আলামিন—'বিশ্ব-করুণা'।

জীবনসায়াহ্নে উত্তরাধিকার মনোনয়নে আব্দুল মালিক বিশ্বাসভঙ্গের সেই একই পরিচয় রেখে গেছেন। পিতা মারওয়ান অন্তিমকালে পুত্রদের উপদেশ দিয়ে গেলেন—তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম পুত্র আব্দুল মালিক খলিফা হবেন। তাঁর পরে খলিফা হবেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল আজিজ। কিন্তু আব্দুল মালিক তাঁর জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পিতার এই উপদেশের মর্যাদা না দিয়ে ভ্রাতা আব্দুল আজিজকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করে আপন পুত্র ওয়ালিদকে ফেলাফতের উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। এ শিক্ষা তাঁর বংশেরই শিক্ষা। উমাইয়া রাজত্বের জনক মুয়াবিয়া হযরত হাসানের সঙ্গে পবিত্র হলফনামাকে নোংরা কাগজে পরিণত করে হযরত হোসাইনের ন্যায্য দাবীকে অগ্রাহ্য করে আপন অযোগ্য পুত্র ইয়াজীদকে ভাবী খলিফা মনোনয়ন করে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-বিশ্বাসঘাতকতার সিংহদ্বার উন্মোচন করে যান। ঐ একই পথ অনুসরণ করেন প্রথম মারওয়ান ইয়াজীদ-পুত্র খালিদকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করে। যার ফলে খালিদের মা কর্তৃক মারওয়ানের প্রাণনাশ ঘটে। মারওয়ান প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন একজন নারীর নিকট। ইয়াজীদের বিধবা পত্নী খালিদের মা কখনও

এমন একজন বৃদ্ধ কে পতিরূপে বরণ করতেন না—যাঁর এক পা ঘরে, এক পা গোরে, যদি না কথা পেতেন—পুত্র খালিদকে খলিফা করা হবে। পিতার পথ অনুসরণ করে পুত্র আব্দুল আজিজকে খেলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। এটা শুধু আব্দুল মালিকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য নয়, এটা ছিল সমগ্র উমাইয়া বংশেরই চরিত্র। একমাত্র এই আব্দুল আজিজের পুত্র দ্বিতীয় ওমর ছিলেন এর বিরল ব্যতিক্রম।

অনেকের মতে আব্দুল মালিক প্রথম জীবনে খুবই ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু সিংহাসন লাভের পর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রদর্শন করেন। অনেকে বলেন, তিনি যখন খলিফা হওয়ার সংবাদ পান তখন কোরআন শরীফ পড়ছিলেন, এবং বললেন—"তোমার (কোরআন) সাথে আমার এই শেষ দর্শন (This is my last time with you)।" আবার কেউ বলেন—তিনি নাকি বলেছিলেন, "কেহ যেন সুবিচার ও আল্লাহর ভয়ের জন্য আমাকে আদেশ না করে, অন্যথায় আমি তার ঘাড় হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করব।" আমাদের মনে হয় এ সবই অলীক কথা —একেবারেই অতিরঞ্জিত কাহিনী।

আব্দুল মালিকের চরিত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক নানা মত পোষণ করেন। তবে তিনি যে উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এ বিষয়ে সকলেই একমত। আবার তিনি যে সংগঠক হিসেবে অসাধারণ ছিলেন, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি যে উদার ছিলেন, ও ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে শিক্ষিত মার্জিত রুচিসম্পন্ন, সাহিত্যানুরাগী, এবং সংস্কারক, এ কথাতেও সকলেই একমত। সুতরাং আরব জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ আব্দুল মালিকের সাহস, উদ্যম, সংযম, ন্যায়নিষ্ঠ মন, তাঁর লোভ-লালসা ও নিষ্ঠুরতাকে যে অতিক্রম করেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাই মুইর বলেন, —" আব্দুল মালিকের রাজত্বের বা চরিত্রের সর্বদিক বিচার করলে রায় অবশ্যই তাঁর অনুকূলে যাবে।"

আব্দুল মালিকের কৃতিত্ব : উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতিরূপে আব্দুল মালিক (Abdul Malik as the Architect of Umayyad Power) :

উমাইয়া রাজত্বে যে চারজনের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, তাঁরা—মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক , আল ওয়ালিদ ও দ্বিতীয় ওমর। মুয়াবিয়া ইসলামের প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসকারী ও রাজতন্ত্রের সুচনা বা সৃষ্টিকারী এবং উমাইয়া রাজত্বের জনক স্বরূপ। আব্দুল মালিক উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং ওয়ালিদ

উমাইয়া রাজত্বের একমাত্র কলঙ্কহীন ও তুলনাহীন মানব ও মানবতার শ্রেষ্ঠতম পূজারী ছিলেন।

৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত কৃতকার্যের সঙ্গে ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পিতা মারওয়ান মারওয়ানী রাজত্বের যে শিশু বৃক্ষটিকে রোপণ করে গিয়েছিলেন, পুত্র আব্দুল মালিক অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এক মহীরুহতে পরিণত করেন। বহু বিদ্রোহ ঐ চারা বৃক্ষটিকে শিকড় সহ উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আব্দুল মালিকের প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। এটাই তাঁর সফলতার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোপান।

বিদ্রোহের সূচনা ও বিদ্রোহ দমন ঃ আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র রাজ্যে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এই বিদ্রোহ, এই অশান্তি কোন একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না। কোথাও মুসলমান-অমুসলমানে যুদ্ধ, কোথাও আরব অ-আরবে যুদ্ধ, কোথাও গোত্র কলহ, চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র, কোথাও বিদেশী আক্রমণ, সবের উর্ধ্বে কয়জনকে খলিফা হওয়ার মোহ একবারেই পাগল করে তুলেছিল। সবকিছু মিলে এই গৃহযুদ্ধ উমাইয়া রাজত্বকে একেবারেই ধ্বংসের মুখে নিয়ে আসে। রাজ্যের এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ইত্যাদি ফিরিয়ে আনার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন মনে করেছিলেন, তিনি তাই-ই করেছিলেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে আব্দুল মালিক কোথাও কর্মঠ, কোথাও নিষ্ঠুর, কোথাও অধার্মিক, কোথাও ষড়যন্ত্রকারী। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে একজন সার্থক ও সফল শাসক হিসেবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

ইরাক ও ইরানের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কুফার মুখতারের নেতৃত্বে হোসাইনের জন্য অনুশোচনাকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী দল বিদ্রোহ করলে আব্দুল মালিকের পরম শত্রু মক্কায় আব্দুল্লার ভ্রাতা বসরার গভর্নর মুসাব কর্তৃক মুখতার নিহত হলে খলিফার এক শত্রু কর্তৃক অন্য শত্রু বিনষ্ট হয়। পরবর্তী সময়ে স্বয়ং খলিফা নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে বসরার মুসাবকে পরাজিত ও হত্যা করেন। খলিফার একান্ত সাহায্যকারী সুযোগ্য শাসক, নিষ্ঠুর হাজ্জাজ কর্তৃক অতি নৃসংশভাবে আব্দুল্লাহ নিহত হলে খলিফা আপন রাজ্যে কণ্টকমুক্ত হলেন। তখন থেকেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের শেষ রশ্মিটুকু ও চিরতরে নির্বাপিত হল, আব্দুল মালিক মুসলিম রাজত্বের একচ্ছত্র অধিপতির আসন লাভ

করেন। পথের কাঁটা সবই প্রায় অপসারিত করে ফেলেছেন। বাকি শুধু খারিজী বিদ্রোহ যা একবার উমাইয়া রাজত্বের ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে খলিফা দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। একজন স্বনামধন্য হাজ্জাজ, অন্যজন আব্দুল্লার ও মুসাবের বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব যিনি পরবর্তীকালে খলিফার আনুগত্য স্বীকার করলে খলিফা কর্তৃক উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। এইভাবে খারিজীদের দলপতি আইবাক্ সহ অনেকেই নিহত হন, অনেকে আত্মসমর্পণ করেন, অনেকে আত্মগোপনও করেন। ফলে খারিজীদল নির্মূল হয়ে যায়। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-কলহ-গৃহযুদ্ধ-গোত্রদ্বন্দ্ব ইত্যাদি দমনে খলিফা যে অসাধারণ কর্মদক্ষতা, অসীম সাহস, অদম্য সংকল্প ও অপরিসীম রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, ইতিরাসে তার তুলনা বিরল। তাই আমীর আলী বলেন—"আব্দুল মালিক ছিলেন একজন আদর্শ স্থানীয় উমাইয়া—তিনি কর্মঠ, ষড়যন্ত্রকারী, এবং অধার্মিক ছিলেন, এবং অসাধারণ দক্ষতার সাথে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান।" দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যপারে তার সার্থক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর তিনি বহির্দেশের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। তখন উত্তর আফ্রিকার বারবারগণ উমাইয়াদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ওদিকে বাইজানটাইনগণও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। আফ্রিকার পায়্থনগণ এবং এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলা 'কাহিনা'-ও তাঁর দলবল সহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। খলিফা তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি হাসান ইবন-নোমানকে প্রেরণ করে উত্তর আফ্রিকা দখল করেন এবং কায়রোয়ানে নতুন সেনানিবাস তৈরি ক'রে একের পর এক কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহকে ধূলিসাৎ করেন। এইভাবে ঘরে-বাইরে যখন বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্জ্বলিত, অরাজকতা, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা সমগ্র উমাইয়া রাজত্বকে যখন রাহুগ্রাসে গিলতে বসেছে, ঠিক সেই সময়ে আব্দুল মালিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ উমাইয়া রাজত্বকে শুধু আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই করল না, ত্রাসের রাজত্বে আনল—অনাবিল শান্তি, বিশৃঙ্খলায় আনল—বিশুদ্ধ শৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তায় আনল—রাজ্যের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা। আব্দুল মালিকের এই অভাবনীয় সফলতা, তাঁর অপরিসীম জ্ঞানগরিমা, অসাধারণ যোগ্যতা-দক্ষতা অবর্ণনীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। ঘরে-বাইরের এই বিপদবন্যা, প্রলয়ঝঞ্ঝা, ঝড়ঝটিকা কোন সময়ই তাঁকে হতোদ্যম বা নিরাশ ও নিরুৎসাহিত করতে পারে নি। উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সংস্কারের যোগ্যতা, সবের উপর তাঁর আপন আত্মনির্ভরতা ও

নির্ভিকতা তাঁর কৃতিত্বের প্রধান বাহন ছিল।

সংস্কারমূলক কাজ ঃ সমগ্র সাম্রাজ্যে আব্দুল মালিক যে সংস্কারমূলক কাজের ছাপ রেখে গেছেন, সেগুলি তাঁর অক্ষয় কীর্তি। শাসন সংস্কারে তাঁর প্রধান অবদান ছিল—আরবী ভাষাকে জাতীয়করণ করা বা সকল অফিসের সরকারি ভাষা রূপে প্রচার করা। তাঁর পূর্বে সরকারি কাগজ-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ আপন অপন প্রাদেশিক ভাষায় সম্পন্ন হত। যার ফলে কেন্দ্রের সাথে প্রাদেশিক রাজধানীগুলির যোগাযোগ যথাযথ হত না। তাই শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ এবং সুসামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য খলিফা সরকারি কাজে রোমান, পাহলবী, সিরাইক ও হিম্যারী প্রভৃতি ভাষার প্রচলনকে রহিত করে এক মাত্র আরবী ভাষার প্রবর্তন করেন। শাসনকার্যে তাঁর এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে নীরব বিপ্লব এনেছিল। আরবী ভাষার ব্যাপক প্রচলনের ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র একাত্মবোধ জেগে উঠেছিল। তাঁর এই নীতি পরবর্তীকালে সকল শ্রেষ্ঠ শাসকের অনুশীলনের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

আরবী লিপির সংস্কার ঃ ভাষা আন্দোলনে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল আরবী লিপির সংস্কার। আরবী এই সংস্কার দ্বারা সম্রাট আব্দুল মালিক সত্যিকারেই এক যুগান্তকারী ভাষা বিজ্ঞানীর পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি শুধু আরব সাম্রাজ্যকেই শক্ত, সুসংহত ও সুসংবদ্ধ এবং সমৃদ্ধিশালী করে যান নি, আরবী ভাষাকেও বিশ্ব ভাষাসাহিত্যের দরবারে কয়েক হাজার বছরের জন্য এগিয়ে দিয়ে আরবী ভাষার যে সমৃদ্ধি সাধন করে গেছেন, যে সহজ রূপ দান করে গেছেন, যে সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে তাকে উন্নতির জোয়ারে বেগবান করেছেন, তা বর্ণনাতীত। এজন্য আরবী ভাষা চিরদিন আব্দুল মালিকের নিকট ঋণী থাকবে। খলিফা দুর্বোধ্য আরবী ভাষাতে প্রথম নোক্তা অর্থাৎ বিন্দু এবং হরকত্ অর্থাৎ (জের-জবর-পেশ) আকার, একার ও উকার-এর প্রচলন করে আধুনিক আরবী ভাষার জনকের স্থান লাভ করেছেন।

মুদ্রা সংস্কার ঃ আরব সাম্রাজ্যে মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে খলিফা আব্দুল মালিক মুদ্রা সংস্কারের সম্মানও লাভ করেছেন। কারণ তার পূর্বে আরবদের নিজস্ব কোন মুদ্রাই ছিল না। তখন সেখানে বাইজানটাইন ও সাসানীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঐ মুদ্রার-প্রচলন রহিত করে খাঁটি আরবীয় মুসলিম মুদ্রা প্রবর্তন করেন, যার উপর খোদিত থাকত ইসলাম ধর্মের মূল মন্ত্র "কলমা" 'লা ইলাহা-ইল্-লাল্ লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। সঙ্গে থাকত সন তারিখ ইত্যাদি। এই মুদ্রা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আপন

টাক্‌শাল্ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখান হতে প্রস্তুত হতো দিনার, দিরহাম ও ফানুস অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা। তাই খলিফা আব্দুল মালিক আরবী মুদ্রার শুধু সংস্কারকই নন, আবিষ্কারকও বটেন।

ডাক বিভাগের সংস্কার ঃ ডাক বিভাগের সংস্কারেও আব্দুল মালিকের যে নিরলস সাধনা তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তা অনতিবিলম্বে জানার জন্য খলিফা যে ডাক-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তা আজও অনুকরণের যোগ্য।

রাজস্ব বিভাগের সংস্কার ঃ রাজস্ব প্রথার আমূল পরিবর্তনে শূন্য রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। আবাদী-অনাবাদী সকল জমি থেকে প্রচুর শস্য উৎপাদন হতে থাকে, অনারব, আরব, অমুসলমান-মুসলমান মাওয়ালী-খারিজী সকলেই সমব্যবহার পেতে থাকলেন। জোতদারী জমিদারী পাটে উঠল। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কায়েম হল, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হল। সমস্ত কিছুই দৃঢ়চিত্ত আব্দুল মালিকের দূরদর্শিতা ও কর্ম-কুশলতার পরিচয় বহন করে।

শিল্প ও সাহিত্য ঃ শিল্পসাহিত্যেও খলিফা আব্দুল মালিক চরম গুণগ্রাহীর পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর সময় শিল্পসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। খলিফা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করতেন। তাঁর রাজ-দরবার নানা জাতির নানা বর্ণের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা শোভিত হয়ে উঠেছিল। তায়াযুক নামে একজন খ্রীস্টান তাঁর চিকিৎসক ছিলেন, তাঁর প্রধান উপদেষ্টা সারজিয়াস ছিলেন জাতিতে খ্রীস্টান। সে যুগের বিখ্যাত কবি জারির, আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক তাঁর সভাকবি ছিলেন।

শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে খলিফা স্থাপত্য শিল্পেরও প্রতি দারুণ পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়েছেন। ৭৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি জেরুজালেমে স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ সর্বপ্রথম একটি দৃষ্টি আকর্ষণী ইমারত তৈরি করেন। মহানবী (দঃ) তাঁর 'মিরাজ'-এর (স্বর্গারোহণ) সময় মদীনা থেকে জেরুজালেমে এসে যে প্রস্তরটির উপর পদচিহ্ন রেখে ঊর্ধ্বগগনে গমন করেন, সেই ঐতিহাসিক পাথরটিকে কেন্দ্র করে খলিফা একটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট অতুলনীয় স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জেরুজালেমে হজ পালনের উদ্দেশ্যে ডোম-অব-দি-রক বা কুববাতআস-সাখরা নামে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। খলিফা জেরুজালেমকে মক্কার পরিবর্তে ও ডোম-অব-দি-রক-কে কাবার পরিবর্তে প্রচলন করতে ব্যর্থ হলেও তাঁর ডোম নামক অপূর্ব স্মৃতি সৌধটি আজও উন্নত

মানের মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের চির স্বাক্ষর বহন করছে। এ ছাড়াও তিনি মসজেদুল আকসার পুননির্মাণ করেন। স্থাপত্য শিল্পের বহু কালজয়ী নিদর্শনও তিনি রেখে গেছেন।

মসজেদুল আক্সা ঃ কোন কোন লেখক "মসজেদুল-আক্সা"-কে আব্দুল মালিকের দ্বারা নির্মিত বলে মতামত দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআন অনুযায়ী এই মতামত অতি বিভ্রান্তিকর। কেননা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল ৬৮৫-৭০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু পবিত্র কোরাআনে উল্লেখ পাচ্ছি—"তিনি পবিত্রতম—যিনি একদা নিশীথে তাঁর সেবককে পবিত্র মসজেদ হতে মসজেদুল আকসা (দুরবর্তী মসজেদ) পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার সীমাকে আমি সৌভ্যযুক্ত করেছি, যেন তাঁকে আমার কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করি (সূরা বনি ইসরাইল, ১৭ ঃ ১)"।

পবিত্র কোরআনের এই ঘটনার সময়কাল ছিল ৬২১ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের এক বছর পূর্বে ২৭শে রজব মিরাজে (উধর্ব গগনে) গমন করেন। পবিত্র কোরআনের এই ঘটনা হতে পরিষ্কার জানা যায়, এই সময় মহানবী (দঃ) মক্কা হতে বায়তুল মোকাদ্দসের দূরতম মসজেদে গমন করেন। আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল ৬৮৫-৭০৫ খ্রীস্টাব্দ হলে তিনি কিভাবে ৬২২ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী মসজেদ নির্মাণ করতে পারেন। সুতরাং আব্দুল মালিক "মসজেদুল আকসা" নির্মাণ করেন নি, বরং এইটাই সত্য হওয়া স্বাভাবিক তিনি মসজেদটির বিশেষ সংস্কার সাধন করেছিলেন।

মসজেদুল আকসার আদি ইতিহাস আলোচনা করলে তাই প্রমাণিত হয়। জেরুজালেম বা জেরুসালেম শব্দটি হিব্রু কথা। জেরু অর্থ স্থান এবং সালেম অর্থ শান্তি, সমগ্র শব্দটির অর্থ—শান্তিনিকেতন। পরবর্তী সময়ে আরবীতে এই জেরুজালেমকে আল-কুদ্স্ বলা হয়, যার অর্থ 'পবিত্র'। উভয়ের অর্থ একই হয়, শান্তির স্থান বা পবিত্র স্থান। পবিত্র কোরাআনেও এ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—রুহ্-উল-কুদুস—পবিত্র আত্মা। প্রাচীন লেখকদের কেউ কেউ বাইত্-আল-মাকদিস, কেউবা বাইত-আল-মোকাদ্দাস বলেন। যার অর্থ পবিত্র ঘর। তখনও বাইত-আল-মোকাদ্দাসের অর্থ দাঁড়ায়—পবিত্র স্থানের ঘর। সুতরাং পবিত্র কোরআন মতে ও ইতিহাস মতে এই ঘরের বা 'মসজেদুল আক্সার' বা বাইত্-আল-মোকাদ্দাসের নির্মাণকারী কোন মতেই আব্দুল মালিক হতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন এই মসজেদ বা গীর্জাটির নির্মাণকারক

ছিলেন—জাস্‌টিনিয়ান (Justinian) যা পরবর্তীকালে খলিফা আব্দুল মালিক কর্তৃক পুনর্নির্মিত হল। পরবর্তীকালে আব্দুল মালিকের পুত্র আল-ওয়ালিদ এর সংস্কার করেন।

লৌহমানব : মুয়াবিয়া তার অসামান্য সাধনার দ্বারা উমাইয়া রাজত্বের জনকের স্থান অধিকার করেছেন। আব্দুল মালিক নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অসীম কর্মদক্ষতা, অসামান্য ধৈর্য, অপরিমিত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দ্বারা উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা অর্জন করেছেন। তাঁর অপূর্ব কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে—গৃহযুদ্ধ দমনে, অভ্যন্তরীণ গোলযোগের অবসানে, শান্তি-শৃঙ্খলার প্রবর্তনে, শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে। জাতীয়তাবাদী আদর্শ স্থাপনের জন্য এক স্বয়ং মহানবীকে (দঃ) বাদ দিলে ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় মানুষ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যেখানে পথিকৃৎ বা জনক, আব্দুল মালিক সেখানে আরব জাতীয়তাবাদের লালনে স্নেহময়ী জননীর আসন লাভ করেছেন। এই জাতীয়তাবাদের ফলে সৃষ্টি হল আরব-সভ্যতার নতুন কৃষ্টি, স্থাপিত হল টাকশাল, প্রচলিত হল আরব-কৃষ্টির ছাপ নিয়ে আপন মুদ্রা। প্রতিষ্ঠিত হল স্থাপত্য শিল্পের অবিস্মরণীয় বহু সৌধ। খলিফা আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র (Father of kings) বলা হয়, কেননা তাঁর সুযোগ্য চার পুত্রের (আল-ওয়ালিদ ৭০৫-১৫ ; সুলাইমান ৭১৫-১৭ ; দ্বিতীয় ইয়াজিদ ৭২০-২৪ ; হিশাম ৭২৪-৪৩ খ্রীস্টাব্দ) প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে খেলাফতের গৌরব লাভ করেন। তারা শুধু খেলাফত লাভই করেন নি, খেলাফতের বিশেষ উন্নতি সাধনও করেছেন। হিট্টি বলেন—"দামেস্কের রাজবংশ আব্দুল মালিক ও তাঁর উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকালে শৌর্য-বীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে পৌছায়।" বস্তুত উমাইয়া-রাজত্ব আব্দুল মালিকেরই অবদান। আরবের কৃষ্টি মালিকেরই সৃষ্টি।

[**উপসংহার :** ইসলামি রাজত্বের জনক স্বয়ং মহানবী রসুলে আক্‌রম্ হযরত মহম্মদ (দঃ)।

ইসলামি রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা—ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল-মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)।

উমাইয়া রাজত্বের জনক—প্রথম মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান।

উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা—আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান।]

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫—৭১৫ খ্রীঃ)

প্রধান ঘটনাবলী

[সিংহাসনে আরোহণ—রাজ্যবিস্তার—হাজ্জাজের পূর্বাঞ্চল জয়—সিন্ধু বিজয়—আফ্রিকা বিজয়—স্পেন বিজয়—মুসা ও তারিক—সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা—অভিযান—ফলাফল—চরিত্র—কৃতিত্ব।]

সিংহাসনারোহণ ঃ ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে পিতা আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর তার যোগ্যপুত্র প্রথম ওয়ালিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মারওরানের মনোনয়ন অনুযায়ী আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা আবদুল আজীজ সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন। কিন্তু আব্দুল মালিকের জীবিতকালেই আব্দুল আজীজ পরলোক গমন করায় আব্দুল মালিক তার জোষ্ঠ পুত্র ওয়ালিদকে ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

হাজ্জাজ ওমর-মোহাল্লাব ঃ সিংহাসনে আরোহণ করে ওয়ালিদ নিজ হস্তে রাজকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল মালিক হাজ্জাজকে পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পুত্র ওয়ালিদ তাঁকে ঐ পদেই বহাল রাখলেন। হাজ্জাজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিম ভারত ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। এই কারণেই তিনি হাজ্জাজকে ঐ পদেই বহাল রাখেন।

ওমরের পদচ্যুতি ঃ আব্দুল আজীজের বংশধরের প্রতি ন্যায় বিচার করার জন্য ওয়ালিদ ওমর ইবন-আব্দুল আজীজকে হেজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ধর্মপ্রাণ দ্বিতীয় ওমর সম্পূর্ণভাবে খোলাফায়ে রা'শেদীনকে অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন। তিনি উমাইয়া বংশের মধ্যে প্রথম মজলিস-উশ-শুরার প্রবর্তন করেন। যদিও তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, তবুও সমগ্র দেশের গণ্যমান্য গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা গঠন করেন এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঐ সভার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। শাসকরূপে ওমর তাঁর প্রথম কাজ আরম্ভ করেন মক্কা মদিনার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে। ইয়াজিদে ও আব্দুল মালিক কর্তৃক এই শহর দুটির যে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তিনি তার সংস্কার করেন। সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য অসংখ্য রাস্তাঘাট, কূপ ইত্যাদি নির্মাণ করে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ করেন। দেশের

বিখ্যাত কারিগরদের সহায়তায় মসজেদই নববীকে তিনি নতুনরূপে তৈরি করেন। এই মসজেদ-ই নববীতে ইসলাম জগতের প্রথম অভ্যুদয়ের সূচনা। এই মসজেদ প্রাঙ্গনেই মহানবীর আশ্রয়-ঘর। তার পাশে ছিলেন সৎ খলিফা চতুষ্টয়। শাসক ওমর মসজেদের সংস্কারের সময় ঐ সমস্ত বাড়িঘরগুলোকে মসজেদের অন্তর্গত করেন এবং সমগ্র প্রাঙ্গণটিকে শোভনীয় করে তোলেন। এটাই ছিল মহানবীর প্রতি ওমরের শ্রদ্ধার অপূর্ব নিদর্শন। তিনিই সর্বপ্রথম মদিনা মসজেদে একটি ফাঁকা মিহ্‌রাব (concave mihrab) তৈরি করেন, তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে রাজ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ। এর জন্য তিনি প্রথম হেজাজের বিভিন্ন শহরগুলো হতে মক্কা ও মদিনার সংযোগ রক্ষাকারী বহু রাস্তা তৈরি করে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। মক্কা ও মদিনা হতে কেন্দ্রীয় রাজধানী দামেস্কের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী দুটি বিরাট রাস্তা নির্মাণ করে তার দু-পার্শ্বে কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিকদের সুবিধার জন্য পান্থশালা নির্মাণ ইত্যাদি কাজের দ্বারা ওমর অল্পদিনের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তার এই অতি জনপ্রিয়তাই তাঁর কাল হয়ে ওঠে। নিষ্ঠুর হাজ্জাজ শাসিত ইরাক হতে মানুষ দলে দলে হেজাজে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেন।

ওমরের জনকল্যাণমূলক কাজে শুধু জনগণই খুশী হল না, স্বয়ং খলিফা ওয়ালিদও উচ্ছ্বসিত ভাবে তার প্রসংশা করেন। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমে জটিল আকার ধারণ করে। ইরাক জনশূন্য হতে আরম্ভ করে, ওধারে হেজাজে জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে। ওমর বাধ্য হলেন হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতার কথা খলিফাকে জানাতে। যার ফলে জনগণ হাজ্জাজের এলাকা থেকে ওমরের এলাকায় চলে আসছিল। হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতা ও ওমরের ন্যায়পরায়ণতা ছিল এই ব্যাপক দেশত্যাগের মূলে। রক্তলোলুপ স্বৈরাচারী, ধুরন্দর হাজ্জাজ খলিফার নিকট ওমরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনলেন। হাজ্জাজের বক্তব্য ছিল—যারা খলিফার বিরুদ্ধচারণ করছে, হাজ্জাজ তাদের কড়া শাস্তিদানের বিধান করলে ওমর বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে খলিফার বিরুদ্ধে একটি নতুন দল গড়ে তুললেন মৃত পিতা আব্দুল আজীজের খেলাফতের দাবী আদায়ের জন্য। অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও প্ররোচনামূলক। ওয়ালিদের দুর্বল মন এই প্ররোচনামূলক অভিযোগ সহজেই বিশ্বাস করে এবং ৭১১ খ্রীস্টাব্দে তিনি সমগ্র উমাইয়া যুগের গৌরব দ্বিতীয় ওমরকে পদচ্যুত করেন। জনগণ ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়ল। অপসারিত ওমর নির্বিকার রয়ে গেলেন—সত্যের উদঘাটনের জন্য। নিরাপরাধ ওমর তার সৎকাজের ও সততার

মূল্য ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি আজও বিশ্ববরেণ্য ও নন্দিত, চির বন্দিত কিন্তু নিন্দিত হাজ্জাজ আজও নিন্দিত—চির নিন্দিত। ৭০১ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আবুল মালেক ইয়াজিদ বিন-মুহাল্লাবকে তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইয়াজিদ ছিলেন হিমারীয় গোত্রের লোক। হাজ্জাজ ছিলেন মুদারীয় গোত্রের। অধিকন্তু ইয়াজিদ কোন দিনই হাজ্জাজকে কুর্ণিশ করতেন না। এই সমস্ত নানা কারণে ইয়াজিদ হাজ্জাজের রোষদৃষ্টিতে পতিত হন। ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে হাজ্জাজ তাকে খোরাসনের শাসনকর্তার পদ হতে অপসারিত করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অপব্যবহারের দায়ে তাঁকে ও তাঁর ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করেন। খলিফা ওয়ালিদ ও সুলাইমানের হস্তক্ষেপে তাঁরা মুক্তি পান। অতঃপর নিরাপরাধ ইয়াজিদ প্যালেস্টাইনে যাত্রা করেন এবং ঐ স্থানে কোতাইবা নিযুক্ত হলেন।

ওয়ালিদের রাজ্যবিস্তার ঃ

সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে খলিফা আল্ ওয়ালিদের কৃতকার্যতার কথা স্মরণ করে অধ্যাপক মুইর বলেন—"ওয়ালিদের রাজত্বকাল দেশে-বিদেশে উভয় স্থানে খুবই গৌরবময় ছিল"—(**The reign of Walid was glorious both at home and abroad**)। ইসলামের ইতিহাসে যে কয়েকজনের নাম চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে আল্ ওয়ালিদ তাঁদের অন্যমত। জয় ও খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন তিনি। সাম্রাজ্য বিস্তারে ওয়ালিদের গৌরব ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষারে লেখা থাকবে। খলিফা ওমর ও খলিফা ওসমানের সময় বিজয়ের যে সূচনা হয়েছিল, তার সার্থক রূপ দেখা যায়—আব্দুল মালিক ও তাঁর পুত্র ওয়ালিদের সময়। এই সময় মুসলিম আধিপত্য—এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপকে গ্রাস করেছিল। দক্ষিণ-পূর্বে আমুর দরিয়া হতে উত্তর-পশ্চিমে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এই সুবিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারে হাজ্জাজ, কুতাইবা, মহম্মদ-বিন কাশেম, তারিক ও মূসা প্রমুখ ব্যক্তিগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। শূন্যহাতে আরম্ভ করে এই জগৎ বিখ্যাত বীরগণ যে রণকৌশল, যে শৌর্য বীর্যের পরিচয় রেখে গেছেন, তা জগতের ইতিহাসে সত্যই বিরল। ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ওমর ফারুক যে বিজয়োম্মাদনার সৃষ্টি করেছিলেন ওয়ালিদ তার উত্তরসাধক রূপে দেখা দিলেন।

হাজ্জাজের পূর্বাঞ্চল বা মধ্য এশিয়া বিজয় ঃ খলিফা ওয়ালিদের সুযোগ্য পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বদিকে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এর পেছনে খলিফার কোন আক্রমণাত্মক

মনোভাব ছিল না। তুর্কীগণ বার বার তাঁর সীমান্তে আঘাত হানতে আরম্ভ করলে খলিফা বাধ্য হয়েই হাজ্জাজকে অনুমতি দিলেন বাধা দিতে ও অগ্রসর হতে। এইভাবেই মধ্য এশিয়ার মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের নব দিগন্ত সূচীত হয়। ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে হাজ্জাজ ইয়াজিদ-বিন-মুহাল্লবের স্থানে কুতাইবা-বিন মুসলিমকে নিযুক্ত করে তুর্কীদের বিদ্রোহ দমনে অনুমতি দিলে কুতাইবা ৭০৬ খ্রীস্টাব্দে বল্খ তুখারিস্তান ও ফরগণার দিকে এক বিরাট বাহিনীসহ অগ্রসর হন। এই বাহিনীর কাছে তুর্কীরা পরাজিত হলে সেনাপতি কুতাইবা তাদের খলিফার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এটা ছিল কুতাইবার পূর্বাঞ্চলে একটি সার্থক প্রথম অভিযান। মধ্য এশিয়া অথবা ট্রান্সঅক্সিয়ানায় তখন বলখ, তুখারিস্তান, বোখারা ও খারিজম প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যগুলি অবস্থান করছিল। অতঃপর সেনাপতি কুতাইবা আমুর দরিয়া বা অক্সাস নদী অতিক্রম করে বুখারা আক্রমণ করেন। সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র এক বিরাট বাহিনীসহ মুসলিম সেনাপতির গতি অবরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে বুখারা সৈন্যগণ সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ফলে বুখারা-রাজ ওয়ারদান রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলে বুখারা মুসলিম বাহিনীর করতলগত হয়।

অতঃপর শীতের আগমনে তুখারিস্তানের বিদ্রোহীগণ মুসলিম বাহিনীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। সেনাপতি কুতাইবা এদের যোগ্য মোকাবিলা করার জন্যে পারস্য হতে সৈন্য সংগ্রহ করে বিদ্রোহীগণকে ফরগণা উপত্যকার মধ্যে বিতাড়িত করেন। এই সংঘর্ষে শত্রুপক্ষের নেতাসহ ৭০০ জন প্রাণ হারান। ফলে তুখারিস্তান মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এই সংঘর্ষের ভয়াবহ পরিণাম লক্ষ্য করে খারিজীমের শাহ্ মুসলিম সেনাপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে তাঁকে খারিজিমে আমন্ত্রণ করেন। সেনাপতি কুতাইবা তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করলে বিনা সংঘর্ষে খারিজিমের শাহ্ মুসলিম সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি করেন। ঠিক একই কারণে সমরখন্দের-রাজা মুসলিম সেনাপতিকে সন্ধির প্রস্তাব দেন। এইভাবে ৭১০ থেকে ৭১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্য বিনা যুদ্ধে সমরখন্দ ও খারিজিমে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়। বিনাযুদ্ধে এই বিজয়ের ফলে সেনাপতি কুতাইবার ভাগ্য ফিয়ে যায়। তিনি বিনা ব্যয়ে বহু সম্পদ ও সৈন্যলাভ করেন। বিজিত অঞ্চলের এই সম্পদ ও সেনাবাহিনী নিয়ে সেনাপতি কুতাইবা ৭১৫ খ্রীস্টাব্দে খোজান্দা, শাশ ও তাসখন্দ এবং ফরগণার অন্যান্য শহরগুলো অধিকার করে কাশগড় ও চীন সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু সংবাদ সেনাপতি কুতাইবার দুর্বার অভিযানকে ক্ষান্ত করে। একদিন মসলিম আলেকজাণ্ডার ওকবা বিন নাফি বলেছিলেন—-বিশাল আটলান্টিক

মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ তাঁর দুর্বার গতিকে বাধা না দিলে তিনি তার বিজয়বাহিনীকে—আল্লাহর বাণীকে পৃথিবীর প্রান্ত ভাগে নিয়ে যেতেন। অনুরূপভাবেই বলেছিলেন সেনাপতি কুতাইবা কোন শত্রু নয়, খলিফার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদই তার গতিকে রোধ করল। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে কুতাইবার দুর্বার অভিযান মধ্য এশিয়ায় মুসলিম উপনিবেশ গড়ে তোলে। যার ফলে শুধুমাত্র রাজ্য বিস্তারই নয়, মুসলিম সংস্কৃতিও বহু জাতি, ও বহু ধর্মের মধ্যে যথেষ্টভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। আমীর আলী বলেন—কুতাইবা একজন সুযোগ্য সমরবিদ এবং দক্ষ সেনাপতি (An able strategist and a consummate general) ছিলেন।

সিন্ধু বিজয় ঃ খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বের ইতিহাসে সিন্ধু বিজয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খলিফা ওমরের খেলাফতকালে আরব সেনাবাহিনীর কিছু অংশ ৬৩৬-৩৭, ৬৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম-ভারতের কোন কোন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। কিন্তু খলিফার নির্দেশ না থাকায় তখন কোন অভিযান প্রেরিত হয় নি। পরবর্তীকালে খলিফা ওয়ালিদের সময় অভিযান প্রেরিত হয় এবং তা সফলও হয়।

অভিযানের কারণ ঃ আরবের সাথে সিংহলের সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। একবার সিংহলের রাজা আরব খলিফা ওয়ালিদের সম্মানার্থে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান। সেই জাহাজটি দেবলের জলদস্যুরা লুঠ করলে সেই সংবাদ আরব বণিকগণ হাজ্জাজ ও খলিফার কর্ণগোচর করেন। সিংহলের রাজাও এর প্রতিকারার্থে খলিফা ওয়ালিদ ও রাজা দাহিরের নিকট পত্র দেন। খলিফা পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজকে এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়ায় হাজ্জাজ দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন। দেবলরাজ দাহির হাজ্জাজের বা সিংহলের রাজার কথায় কর্ণপাত না করায় হাজ্জাজ বাধ্য হলেন ৭১২ খ্রীস্টাব্দে তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মহম্মদ বিন-কাসেমের নেতৃত্বে দাহিরের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযান পাঠাতে। এই অভিযানের মূলে আরো কিছু কারণ ছিল—যেমন, (১) ভারতীয় রাজাগণ মুসলিম অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করে খলিফার বিরাগভাজন হন ; (২) হাজ্জাজের অত্যাচারে বহু ইরাকবাসী অতিষ্ঠ হয়ে সিন্ধু অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করলে হাজ্জাজ সিন্ধু-রাজকে ওদের প্রত্যার্পণ করতে বলেন, কিন্তু সিন্ধু-রাজ দাহির তা প্রত্যাখান করে হাজ্জাজের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। (৩) ভারতবর্ষের সাথে আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে

থাকাকালীন আরবগণ ভারতীয় সম্পদ সম্পর্কেও বেশ সচেতন হন। ভারতীয় সম্পদ সিন্ধু অভিযানকে তরান্বিত করে। আরবের দুর্বল অর্থনৈতিক কারণও তাদের অভিযান প্রেরণে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে। সবশেষে খলিফা ওয়ালিদও বোধ হয়, কোন একটা যোগ্য কারণ পেতে চাইছিলেন সিন্ধু অভিযান ও আক্রমণের জন্যে। এটা ছিল খলিফার সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতির অঙ্গ। যাই হোক, সিন্ধু অভিযানের আশু কারণ ছিল জলদস্যুদের আরব জাহাজ লুঠ এবং এর প্রতিবিধানে সিন্ধু-রাজ দাহিরের নিষ্ক্রিয়তা।

অভিযান : ৭১০ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ বিন-কাশেম ৬০০০ উষ্ট্রারোহী, ৬০০০ সিরিয় অশ্বারোহী ও ২০০০ ভারবাহী পশুর সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে বিনা যুদ্ধে মাকরান ও বেলুচিস্তান অধিকার করে ৭১২ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুতে উপনীত হন। কথিত আছে, এই বাহিনীতে মুসলিম নারীরাও যোগদান করেছিলেন। ঐ বাহিনীতে নানাপ্রকার অস্ত্রের সাথে 'দূলহান-আরুস' নামক একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছিল। এই অস্ত্রটি চালনা করতে ৫০০ লোকের প্রয়োজন হত। স্থানীয় জাঠ ও মেড জাতীয় লোকেরা দাহিরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিল। তাই ঐ দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা দাহিরের বিরুদ্ধে মহম্মদকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আরব সেনাবাহিনী দেবল বন্দরে পৌঁছিয়ে লক্ষ্য করল সেখানকার মন্দির চূড়ায় একটা লালপতাকা শোভা বর্ধন করছে। তারা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল—সিন্ধুবাসীদের বিশ্বাস মন্দিরে যতক্ষণ ঐ পতাকা শোভা বর্ধন করেছে তক্ষণ তাঁদের পরাজয়ের কোন ভয় নেই। তাই আরব সেনাবাহিনী প্রথমেই ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পতাকাটিকে অবনমিত করে। ঐ পতাকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সমস্ত মানুষ তাঁদের নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রায় বিনা যুদ্ধে দেবল বন্দর অধিকার করে। পরে মহম্মদ নিরুণ সিহওয়ান সিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। অতঃপর মহম্মদ বিন-কাসেম সিন্ধু নদ অতিক্রম করে দাহিরকে রাওর নামক স্থানে আক্রমণ করেন। রাজা দাহির প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হন। তখন দাহিরের পত্নী রাণীবাঈ ও অন্যান্য রমণীগণ জহরব্রত পালন করে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। রাওর অধিগ্রহণের পর ব্রাহ্মণাবাদ ও আলোর দুর্গ অধিকৃত হয়। অতঃপর মূলতান ও উচ-এর পতন ঘটে। ফলে সমগ্র সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ মুসলিম পতাকার অধীন হয়ে পড়ে। অতএব পূর্বাঞ্চলে মুসলিম রাজ্য স্থাপনে হাজ্জাজের অবদান এক অক্ষয় কীর্তি স্বরূপ। রাজনৈতিক দিক থেকে সিন্ধু বিজয় কিছুটা নিষ্ফল হয়েছিল। কেননা ৭১২ খ্রীস্টাব্দে বিজয়ের সূচনা থেকে ঐ অঞ্চলে মাত্র ৩০ বছর অর্থাৎ ৭৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম আধিপত্য

বলবৎ ছিল। তাই লেনপুল বলেন—'ভারত এবং ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান বিশেষ। ইহা একটি নিষ্ফল বিজয়। কিন্তু ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।' ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী মানুষকে শুধু মুগ্ধই করেনি, বশীভূতও করেছিল। অতঃপর ইসলামের ফকির দরবেশ ও সূফীগণ যখন হিন্দুদের বর্ণ-বৈষম্যে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন, তীব্র সমালোচনা করতে থাকলেন, তখন নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করল। ইসলামের এই সূফীকুল যেখানেই মানবতার পতন ঘটেছিল, সেখানেই ছুটে গিয়েছিলেন—মানবতার উত্থানে, দুর্গত মানুষ সেবায়। সুতরাং মুসলমানদের সিন্ধু বিজয় ভারতের সঙ্গে ইসলামের সূফীকুলের একটি সম্পর্ক গড়ে তোলার পরিবেশ দান করে। এ ছাড়াও মুসলমানগণ সর্বপ্রথম দেবলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং তখন থেকে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের সাথে মুসলমানদের একটা পরিচয় গড়ে ওঠে। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্যের সংমিশ্রণে এক নতুন স্থাপত্যের জন্ম হয়। আরবীয়গণ ও ভারতীয় ধর্ম-দর্শন, গণিত; ভেষজ ও অন্যান্য শাস্ত্র হতে প্রভূত জ্ঞান আহরণ করেন। মহাকবি আল বিরুনী ও আমীর খসরু তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পূর্বাঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের ফলেই এই সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্ভব হয়েছিলো, এবং এর জনকরূপে হাজ্জাজের অবদান চিরদিন অনস্বীকার্য।

আফ্রিকা বিজয় ঃ পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারে হাজ্জাজ যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, পশ্চিমাঞ্চলে মুসা ইবন-নুসাইর ঠিক তেমনি ছিলেন। খলিফা ওয়ালিদ ৭০৭ খ্রীস্টাব্দে মুসা ইবন-নুসাইরকে ইসান-বিন নোমনের স্থলে আফ্রিকা উত্তর অফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুয়াবিয়ার সমরে মুসার পিতা সাহেব উল-সুরতা বা পুশিল প্রধান ছিলেন। মুসা তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর আফ্রিকাকে মিশরের আওতা হতে সরাসরি দামাস্কের অধীনে নেন। খলিফার এই ইচ্ছাকে তিনি প্রথম পূরণ করেন। পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্রের দ্বারা বর্বর বারবারদের যথোচিত শিক্ষা দিয়ে কঠোর হস্তে দমন করলে তাদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং অনেকেই পালায়ন করেন। এই বারবার ও বাইজানটাইনদের মিলিত শক্তিকে বীর মুসা পরাজিত করে মরক্কো ও তাঞ্জিয়ার সহ সমগ্র আফ্রিকাতে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর বাইজানটাইনগণ ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল হতে বার বার মুসলিস সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে মুসা বাধ্য হন প্রতি আক্রমণ করতে এবং এর ফল স্বরূপমেজর্কা, মির্ণকা ও শক্তিশালী আইভিকা দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম আধিপত্যের বিস্তার ঘটে। এই সমস্ত অভিযানে মুসাকে সাহায্য করেন স্বনামধন্য যোদ্ধা

তারিক-ইবন-জিয়াদ। মুসা তারিককে পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে রাজধানী কায়রোয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন।

মুসলিম বিজয়গুলির একটি সাধারণ লক্ষণ সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের অভ্যুদয় এক অভুতপূর্ব ঘটনা, যখনই অতীতের অসভ্য বর্বর আরব মাথা চাড়া দিল, তখন কেউই তার শক্তির পরিমাণ করতে পারে নি বা করার চেষ্টাও করে নি। তাই যখনই সংঘর্ষ বেধেছে, তারা এগিয়ে এসেছিল অহমিকা ভরে, দাম্ভিকভাবে, তাচ্ছিল্য ভরে, কোথায় বা বড় জোর মান-সম্মানের জন্য। কিন্তু আরব এগিয়ে গেছে আপন অস্তিত্বের জন্য—জীবন-মরণ পণ করে। যুদ্ধের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আরবদের জয় ও অন্যান্যদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

স্পেন বিজয় ঃ আল-ওয়ালিদের সময় মুসা ও তারিক কর্তৃক স্পেন বিজয় ও তার ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে বলা যায় খলিফা ওয়ালিদ তার রাজত্বকালে যত জয় করেছেন, তার মধ্যে সিন্ধু বিজয় চমকপ্রদ, এবং তা অপেক্ষাও চমকপ্রদ স্পেন বিজয়। স্পেন বিজয় ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই স্পেন বিজয়ের মূলেও ছিল—স্পেন রাজাদের দুর্ব্যবহার ও নিজেদের মধ্যে কলহ। সেনাধ্যক্ষ মুসা উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আইবেরিয়ান উপদ্বীপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। সুযোগ আপন হতেই দেখা দিল।

প্রাক-মুসলিম স্পেনের অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ এই সময়ে স্পেনে উইতিজা নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। হঠাৎ রাজা উইতিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রোডারিক নামক একজন সিংহাসন অধিকার করেন। রোডারিক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী। যার ফলে সিংহাসনচ্যুত সম্রাট সিংহাসন হারাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও হারালেন। আইবেরিয়ান উপদ্বীপ কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজাগণ রোডারিকের এই দুর্ব্যবহার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে পছন্দ করেন নি। কেননা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, যে কোন দিন তাঁদের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে, আর এই কারণে সকলেরই কাম্য ছিল রোডারিকের আশু পতন। অন্যদিকে আপন সভাসদবৃন্দও সিংহাসন লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। বস্তুত স্পেনের তৎকালীন রাজনৈতিক চালচিত্রে চরম অস্থিরতা বিরাজমান ছিল।

সামাজিক অবস্থা ঃ স্পেনের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। স্পেনের গথিক রাজার নিদারুণ অত্যাচার-অবিচারে নিপীড়ন-নির্যাতনে সমগ্র দেশবাসী আর্তনাদ করছিল। সামাজিকভাবে স্পেন তখন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) অভিজাত শ্রেণী, এদের কোনরূপ কর দিতে হত না। সমাজে এরাই ছিলেন একমাত্র সুখ ভোগ কারী শ্রেণী; (২) গরিব ও মধ্যবিত্ত গরিব, এদের সকল প্রকারের কর দিতে হত, এবং কোনরকম ব্যক্তি স্বাধীনতাও এদের ছিল না। এককথায় এরা ছিল অর্ধদাস; (৩) দাস শ্রেণী--সর্বাপেক্ষা অবহেলিত শ্রেণী। সমাজে এরাই ছিল সর্বাপেক্ষা অবহেলিত শ্রেণী। সামাজিক জীবন বলতে এদের কিছুই ছিল না। এমন কি তারা প্রয়োজন মত বিয়েও করতে পারত না। এই শ্রেণীর পুরুষ ও রমণীরা সকলেই ছিল অভিজাত শ্রেণীর মনোরঞ্জনের উপায় স্বরূপ। তাদের মহিলাগণ অভিজাত শ্রেণীর মালিকের ভৃত্য উৎপাদনের ক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হত। গথিক শাসকদের হাতে ইহুদিগণও কম নির্যাতন ভোগ করেন নি। এইভাবে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ক্রীতদাসগণ যখন অত্যাচারী গথিক রাজার অচিন্তনীয় অত্যাচারে নিষ্পেষিত হচ্ছিল ঠিক সেই সময় অতর্কিতে আশাতীতভাবে তাদের উদ্ধারকল্পে আবির্ভূত হলেন আল্লাহর আশীর্বাদ স্বরূপ সেনাধ্যক্ষ মূসা।

ধর্মীয় অবস্থা ঃ খ্রীস্টিয় ধর্মের তখন এক শোচনীয় অবস্থা—ক্ষমার পরিবর্তে প্রতিহিংসাই তখন হয়ে উঠেছে ঐ ধর্মের মূলকথা। মানুষ মানুষকে তার কামনার দাস করেছে। ধর্মের মধ্যে মানবতার চিহ্নমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। এককথায় খ্রীস্টানেরা তখন দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ঃ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মের ঐ অবক্ষয়ের সময় মূসা কোরআনের বাণী সহ হাজির হলেন—"লা তাজলেমুনা, ওয়ালা তুজলামুন"—"অত্যাচার কর না এবং অত্যাচারিত হয়ো না।"

অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ ঃ

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি অত্যাচারী রোডারিক সম্রাট উইতিজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তার সিংহাসন দখল করেন। অতঃপর রোডারিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রতি। রোডারিক প্রথম আক্রমণ করেন স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে সিউটা দ্বীপের স্বাধীন রাজা কাউন্ট জুলিয়ানকে। জুলিয়ান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। রোডারিক ছিলেন অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল। তাই জুলিয়ানের রাজ্য জয়েই তাঁর পিপাসার নিবৃত্তি হল না। তিনি পরাজিত জুলিয়ানের বিবাহযোগ্য পরমাসুন্দরী কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে

জোরপূর্বক হরণ করে তার শ্লীলতা হানি করলে পিতা জুলিয়ান দারুণভাবে মর্মাহত হন। রাজ্য হারানোর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হলো কন্যার অবমাননা। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং রোডারিক নামক নরপশুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জুলিয়ান মুসা-ইবন-নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। মুসা অনেক দিন ধরে এইরূপ একটি আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ঘটনা ঃ মুসা স্পেনের অবস্থাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ৭১০ খ্রীস্টাব্দে তারিফ নামক একজন দূতকে কয়েকশত সৈন্যসহ স্পেনে প্রেরণ করেন। তারিফ স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের পরিস্থিতি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ নিয়ে মুসার নিকট প্রত্যাবর্তন. করেন। তখন মুসা খলিফা ওয়ালিদের আদেশানুক্রমে ৭১১ খ্রীস্টাব্দে প্রখ্যাত সেনাপিত তারিক-ইবন-জিয়াদের নেতৃত্বে ৭০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী স্পেনে প্রেরণ করেন। তারিক সর্বপ্রথম জুলিয়ানের দেওয়া চারটি জাহাজ যোগে প্রণালী অতিক্রম করে একটি পাহাড়ী অঞ্চল অধিকার করেন। সেনাপতি তারিকের নামানুসারে পরবর্তীকালে এই পর্বতকে জুবালুত তারিক—তারিকের পাহাড় বা জিব্রালটার নামে অভিহিত করা হয়। এ সংবাদ স্পেনের উদ্ধত শাসনকর্তা রোডারিকের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিলেন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। অন্যদিকে সেনাপতি তারিকও তাঁর অভিযানকে স্পেনের মুল ভুখণ্ডের দিকে পরিচালনা করার জন্য সেনাধ্যক্ষ মুসার নিকট আরো কিছু সেন্য পাঠাতে অনুরোধ করলে সেনাধ্যক্ষ মুসা পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। সর্বোমোট ১২০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি তারিক রোডারিকের রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হলেন। ৭১১ খ্রীঃ ১৯শে জুলাই গোয়াডিলেট নদীর তীরে সেনাপতি তারিক রোডারিকের সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এই যুদ্ধে রোডারিকের কয়েকজন শত্রু প্রথম দিকে তারিকের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, কেননা তাঁরা ভেবেছিলেন--রোডারিক পরাজিত হলে আরব সেনাপতি তারিক কিছু সম্পদ সহ আপন দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন আরব সেনাপতি দেশে ফিরে যাবেন না, সঙ্গে সঙ্গেই তারাও দলবল সহ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। ভীষণ যুদ্ধে রোডারিকের সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। স্বয়ং রোডারিক প্রাণভয়ে গোয়াডিলেট নদী অতিক্রম কালে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারান। তখন বিজয়দীপ্ত তারিক বাহিনী একে একে কারমোনার, সিডোনিয়া, কর্ডোভা, মালাগা, গ্রানাডা ও ইজিসা বা একিজা

(Echijah) দখল করেন। এইভাবে গথিক রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই মুসলিম আধিপত্য কায়েম হয়।

অতঃপর সেনাপতি তারিক স্পেনের রাজধানী টলেডো আক্রমণ করেন। প্রাণভয়ে সমস্ত খ্রীস্টান অধিবাসী নগর ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেন। শুধুমাত্র নির্যাতিত-নিষ্পেষিত অত্যাচারিত-অবহেলিত ইহুদিগণ সারা শহরে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা নগর ত্যাগ করেন নি কারণ তাদের ধারণা ছিল এই শহরে যাঁরাই আসুন বা যাঁরাই এই শহরের মালিক হন, তাদের প্রতি নবাগতদের অত্যাচর খ্রীস্টানদের অপেক্ষা বেশি হবে না। তাঁরা মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে খ্রীস্টানদের অত্যাচার হতে রক্ষা পেলেন। স্পেনের বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণকারী স্পেনের অসহায়-অত্যাচারিত সাধারণ মানুষদের নবজীবনের বাণী শুনিয়ে মুসলমান বিজয়ীরা তাদেরও শহরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। পরিশেষে অভিজাত কুলও ফিরে আসেন। এইভাবে সেনাপতি তারিক মধ্য-পূর্ব স্পেন জয় করে স্পেনে মুসলিম পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হন। তারিকের শাসনাধীনে স্পেনের সাধারণ মানুষ বস্তুত এই আক্রমণকে তাদের কাছে আশীর্বাদ রূপে গণ্য করেছিল। সেনাপতি তারিকের সফলতার বীজমন্ত্রটি এইখানেই।

ফলাফল ঃ

১। মুসার অভিযান ঃ বলিষ্ঠ রাজনৈতিক পদক্ষেপ ঃ সেনাপিত তারিকের এই বিজয় সংবাদ, এই বিরাট সফলতা সেনাধ্যক্ষ মূসার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি আনন্দে উন্মাদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি এই বিরাট বিজয়ে অংশীদার হওয়ার জন্যে ১৮০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সহ ৭১২ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের মাটিতে পদার্পণ করেন এবং মেডিনা, সিডোনিয়া, কারমোনা, সিভাইল মেরিডা, তালাভেরা প্রভৃতি স্থান জয় করে রাজধানী টলেডোতে উপস্থিত হন। সেনাপতি তারিক এখানে মুসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরে তারা সম্মিলিত-ভাবে—গ্যালিসিয়া, লিওন, এ্যাস্টুরিয়াস, সারাগোসা, আরাগণ, ক্যাটালোনিয়া, বার্সিলোনা ও অন্যান্য শহরগুলো অধিকার করে উত্তরে পিরীনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত অগ্রসর হন। মোটামুটি দু বছরের (৭১২-১৪) মধ্যে খ্রীস্টান স্পেনের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মুসলিম পতাকাতলে আসে।

মুসলমানদের স্পেন বিজয় বিশ্ব-ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে উমাইয়া রাজত্বের পরিসীমাই শুধু বিস্তৃত হয়নি বরং সমগ্র ইউরোপে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাত্রা বৃদ্ধি

পেয়েছিল। এইদিক থেকে তাই স্পেন বিজয়ের ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। এই বিজয় আরো বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারত, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ যখন এই দুই মুসলিম অজেয় বীর মূসা ও তারিক একসাথে দণ্ডায়মান হয়ে হাতে হাত দিয়ে পিরীনিজ পর্বত হতে ফ্রান্স তথা ইউরোপ অভিযানের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ঠিক তখনই খলিফা ওয়ালিদ তাঁদের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। এই আদেশের ফলে ইউরোপে ইসলামের বিজয় জোয়ারে এল ভাটা, বিস্তৃতি হল ব্যাহত। সেনাধ্যক্ষ মূসা ও সেনাপতি তারিক ঐ দিন বাধা প্রাপ্ত না হলে হয়তো ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সহ সমগ্র ইউরোপে মুসলিম প্রাধান্য স্থাপিত হতে পারত।

এই ঘটনার দীর্ঘ ১৮ বছর পর ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে সেনাপিত আব্দুর রহমান দক্ষিণে ফ্রান্সের টুরস (Tours) শহরে অভিযান চালিয়ে চার্লস মার্টেলের (Charles Martel) নিকট তুরসের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। খুব সম্ভব এটাই মুসলিম বিজয় সৈন্যবাহিনীর সর্বদূরবর্তী সীমানা নির্ধারণ করে।

২। **সামাজিক গুরুত্ব ঃ** স্পেন বিজয় নিঃসেন্দেহে যেমন একটি সফল সামরিক বিজয়, তেমনি অনিবার্যভাবেই একটি সুষ্ঠু সামাজিক বিপ্লব। এই বিজয়ের ফলে স্পেনে--অরাজকতার বদলে আইনের শৃঙ্খলা স্থাপিত হলো। অসন্তোষ, সংকীর্ণতা, অত্যাচার, অন্যায়, নির্যাতন, নিপীড়ণের স্থলে এল সন্তোষ, উদারতা ও ন্যায় বিচার। সবের উর্ধ্বে স্পেনের জনসাধারণ ফিরে পেল তাদের শাশ্বত ব্যক্তি স্বাধীনতা। কৃষক তার অপরিমিত কর ভার থেকে নিষ্কৃতি পেল, ক্রীতদাস তার গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেল। ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণীর মিথ্যা আভিজাত্য এবং শাসনের নামে শোষণ লোপ পেল। স্পেনে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে মুসলমানদের নিকট স্পেন বিজয় শুধুমাত্র সামরিক জয় হলেও স্পেনবাসীদের নিকট তা ছিল সামাজিক জয়।

৩। **ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ** ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইসলামের একটি অমোঘ বিধান। পবিত্র কোরআন কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছে—ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই। সুতরাং যে কোন ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানগণ নির্বিঘ্নে আপন ধর্ম পালন করতে পারে। স্পেনের অধিবাসীগণও স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম পালন করার সুযোগ পেল। ইসলাম মানুষে মানুষে কোন ব্যবধান স্বীকার করে না। তাই স্পেনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একই ব্যবহার পেত। মুসলমানদের উদার ও প্রগতিশীল ব্যবস্থার ফলেই স্পেনে একদিন জন্ম নিল--স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টি।

৪। **সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ঃ** স্পেনে শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যে প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করে, সমগ্র ইউরোপ তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে। তাই ডোজী (Dogy) বলেন—"কর্ডোভায় মুরগাণের বিস্ময়কর সংগঠন মধ্যযুগের একটি অলৌকিক ঘটনা। সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বরোচিত অজ্ঞানতা ও দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত তখন কর্ডোভা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল ও দীপ্ত মশাল বহন করে।" মানবজাতির উন্নতিকল্পে স্পেনের মুসলিম শাসন এতই নির্মল ও কার্যকরী ছিল যে, আমীর আলী বলেন—"স্পেনের মুসলিম শাসন হতে বর্তমান কালের বহু সরকারের শিক্ষা করার অনেক কিছু আছে।"

ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির শ্রেষ্ঠতম নজীর বিধৃত হয়ে আছে খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে। নানা বিজয়ের মধ্যে স্পেন বিজয় শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করে আছে। স্পেন বিজয়ের স্থপতি হিসেবে সেনাধ্যক্ষ মূসা ও সেনাপিত তারিকের নাম চিরদিন স্বার্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মুসার প্রত্যাবর্তন ঃ সেনাধ্যক্ষ মুসা দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর পুত্র আব্দুল আজিজকে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং পুত্র আবদুল মালিককে মরোক্কোর গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।

মূসা স্থলপথে স্পেন থেকে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। মূসা মুকুট পরিহিত, বহু মূল্যবান সাজে সজ্জিত, সাথে বহু পরাজিত রাজ-রাজড়া, অগণিত ক্রীতদাস, অসংখ্য যুদ্ধবন্দী ও অপরিমিত মালপত্র নিয়ে বিজয়ী বেশে উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়ে দামেস্কে রওনা হন। অনেক ঐতিহাসিক তাঁর এই বিজয় মিছিলকে প্রাচীন রোমক সম্রাটদের বিজয় মিছিলের সাথে তুলনা করেন। সেনাধ্যক্ষ মূসা রাজধানী দামেস্কে পৌঁছলে স্বয়ং খলিফা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান। সেনাধ্যক্ষ মূসা খলিফাকে দান করলেন—একটি বিরাট দেশ, সঙ্গে বহুমূল্য বস্তু—'সুলাইমানের নির্ঘণ্ট'। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন—সেনাধ্যক্ষ মূসা রাজধানী দামেস্কে পৌঁছাবার পূর্বেই খলিফা আল্ ওয়ালিদ পরলোক গমন করেন।

আল ওয়ালিদের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

ওয়ালিদের চরিত্র ঃ ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বিজেতা হিসেবে প্রথম ওয়ালিদ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকলেও পিতা আবদুল মালিকের মতো কূটনৈতিকে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অবশ্য সাম্রাজ্য বিস্তারে ও সমগ্র দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পারদর্শিতায় তিনি পিতাকেও অতিক্রম করেছেন। পিতা আবদুল

মালিক ও পুত্র আল্ ওয়ালিদের পরিস্থিতি ও পরিবেশ এক ছিল না। আপন আপন পরিস্থিতি ও পরিবেশে পিতা ও পুত্র উভয়েই সমান পারদর্শিতার পরিচয় রেখে গেছেন। পিতা সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছেন, পুত্র সেই সাম্রাজ্যের সম্প্রসারকের গৌরব লাভ করেছেন।

ইতিহাস আল ওয়ালিদকে অত্যাচারী দুরাত্মা নৃপতি বলে অঙ্কিত করেছে। ঐতিহাসিক মাসুদী ও ইবনে আতর ওয়ালিদ চরিত্রকে ঐ ভাবেই চিত্রিত করেছেন কিন্তু আমরা মনে করি খলিফা ওয়ালিদ আরবদের নিরো হাজ্জাজকে পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত করায় অনেকেই খলিফাকে অত্যাচারী বলে দোষারোপ করেছে। হাজ্জাজ মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিলেন সত্য, কিন্তু খলিফা আবদুল মালিকের সময় হাজ্জাজের অনেক সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল নিষ্ঠুর হতে। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় খলিফা ওয়ালিদ হাজ্জাজের প্রভাবাধীন ছিলেন না। তিনি হাজ্জাজকে কোন কাজে মাত্রাতিরিক্ত কোন কিছু লক্ষ্য করা মাত্রই তাঁকে নিবৃত্ত করতেন। কিন্তু তাকে পদচ্যুত করা তিনি সমীচীন মনে করেন নি রাজ্যর স্বার্থে। এ কথারই সমর্থনে মূইর বলেন— "যদিও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আল হাজ্জাজকে সমর্থন করার জন্যে তাঁকে স্বেচ্ছাচারী বলে অভিহিত করেন, তথাপি আমাদের দৃষ্টিতে তিনি আমিরুল মুমেনীনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা, শক্তিশালী ও যোগ্যতম ছিলেন।"

খলিফা ওযালিদের নানা কার্যকলাপ তাঁর পরোপকারী এবং মহানুভব মনের পরিচয়ই বহন করে। তাঁর চরিত্রে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও নৈতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিজে খলিফা ছিলেন, সম্রাট ছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী ছিলেন না। তাই আমীর আলী বলেন—"তিনি যে পিতা আবুল মালিক এবং পিতামহ মারওয়ান অপেক্ষা অনেক দয়ালু ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তার বংশধরগণের অনেকের অপেক্ষা তিনি হৃদয়বান ও দয়ালু ছিলেন।"

সংগঠক ও শান্তিরক্ষক ওয়ালিদ ঃ ওয়ালিদ যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন মুদারীয় ও হিমারীয় দ্বন্দ্ব, শিয়া ও খারিজী বিদ্রোহ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নি, যে কোন সময় তার সুপ্ত শিখা সমগ্র সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলাকে ব্যাহত ও বিঘ্নিত করতে পারত। খলিফা কঠোর হস্তে ঐ সমস্ত বিদ্রোহের বীজ দমন করে বলিষ্ঠ সংগঠকের পরিচয় দেন এবং শান্তি ফিরিয়ে আনেন। এইভাবে তিনি সুষ্ঠু ও সুসংহত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দূর হতে সুদূর পর্যন্ত উমাইয়া শাসনকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি হিমারীয়, মুদারীয়, শিয়া, খারিজী প্রভৃতি

গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। মুইর বলেন—"প্রতিদ্বন্দ্বী আরবদের মধ্যেও তিনি কঠোর হস্তে ভারসাম্য রক্ষা করেন। তিনি যদি এই ভারসাম্য রক্ষা না করতে পারতেন, তাহলে শান্তি স্থাপন তার জন্য সুদূর পরাহত হত, এবং রাজ্যবিস্তারও অসম্ভব হত।'

শ্রেষ্ঠ বিজেতা ওয়ালিদ ঃ যে জন্য আল্ ওয়ালিদ শুধু মারওয়ান বা উমাইয়া বংশের মধ্যে নয়, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন, সেটি তার রাজ্যবিস্তার। পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন, পরে পিতার সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করেন, এবং এ ক্ষেত্রে তার স্থান অদ্বিতীয়। তাঁর রাজ্যসীমা ছিল—পূর্বদিকে সিন্ধুনদের তীর হতে পশ্চিমে আটলান্টিক তীর পর্যন্ত। খলিফা এক সাথে তিনটি মহাদেশকে নিজের শাসনাধীনে এনে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতির গৌরব অর্জন করেছিলেন। সীজার, আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ান-এর পক্ষেও সাম্রাজ্যের এরূপ বিস্তৃতি সম্ভব হয়নি। এই কারণেই ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন— "ওয়ালিদ ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, কারণ তার অভূতপূর্ব বিজয় ছিল তাঁর প্রধান ও অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব"। মুইর বলেন—"ওমরের খেলাফত সহ এমন কোনও খেলাফত বা শাসনকাল নাই, যার আমলে ইসলাম এতদূর সম্প্রসারিত ও সুসংহত হয়েছিল।" ("There is no other region not excepting even that of Umar, in which Islam so spread abroad and was consolidated.")

মুসলিম নৌ-বহর ঃ নৌ-বাহিনী সম্পর্কেও ঠিক ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ওয়ালিদের খেলাফত কালে নৌ-বহরও বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করে। খলিফা নৌ-বহরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন ঃ (১) সিরিয় বাহিনী, (২) তিউনিসিয়া বাহিনী, (৩) আলেকজান্দ্রিয়া বাহিনী, (৪) ব্যবিলন বাহিনী, (৫) নীলনদ বাহিনী। এই সমস্ত নৌ-বাহিনীগুলো অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করতে ও যথাসময়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে—ভূমধ্যসাগর, উত্তর আফ্রিকা, আলেকজান্দ্রিয়া ও নীলনদের প্রবেশ দ্বারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিটি পোতাশ্রয়ে অসংখ্য রণতরী যে কোন বিদেশী আক্রমণের, যে কোন ভয়াবহ বিপদ সংকেতের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে দুহাজারের মত রণতরী প্রস্তুত থাকত। ব্যবিলন ও কয়েকটি স্থানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল।

প্রজাবৎসল নৃপতি ঃ খলিফা ওয়ালিদ যে শুধু রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন তা নয়। তিনি প্রজাদের সখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও

যথাযথ দৃষ্টি দিয়েছেন—তিনি যথার্থই একজন প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। সাধারণ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করেছিলেন। আধুনিক যুগে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা আজও সম্ভব হয় নি—ওয়ালিদ তাঁর প্রজাসাধারণকে তা উপহার দিতে পেরেছিলেন। তাই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে তাঁর স্থান অন্যতম। কৃষকদের সুবিধার জন্য অসংখ্য খাল খনন, জনসাধারণের চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, সঙ্গে সঙ্গে পথিপার্শ্বে কূপ খনন ও বৃক্ষরোপণ, গরিব জনসাধারণের জন্য বিনা খরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা, অন্ধ-বৃদ্ধ-পঙ্গু অসহায় ব্যক্তিদের জন্য বায়তুল মাল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজগুলো খলিফাকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাবৎসল নৃপতির সম্মান দান করেছে।

বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ঃ অনেকে বিশেষ করে সিরিয়াবাসীগণ খলিফা ওয়ালিদকে উমাইয়াদের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা বলে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে তাই-ই। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণও খলিফা ওয়ালিদকে ইসলাম জগতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটের মর্যাদা দান করেছেন। বস্তুত নিরপেক্ষ বিচারে খলিফা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব মূলত দুটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল, একটি তার স্পেন ও সিন্ধু বিজয়—অন্যটি তাঁর জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা। খলিফার রাজত্বকালে রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল—শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, চারু-কারুশিল্প প্রভৃতি সকল শাখা। খলিফার রাজত্বকাল যেন একটি বিরাট বৃক্ষস্বরূপ, যার শাখা হতে সকল প্রশাখাই ফলে ও ফুলে এক মনোরম শোভা ধারণ করেছিল। খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে মুসলিম রাজত্বের একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগ। পরবর্তী আব্বাসীয় ঐতিহাসিকগণ বিদ্বেষবশত খলিফা চরিত্রকে কলুষিত করতে প্রয়াস পেলেও নিরপেক্ষ বিচারে তা ঠিক নয়।

ধর্মের ব্যাপারে খলিফা ওয়ালিদ গোঁড়া ছিলেন না, যদিও তিনি ধর্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রতিটি শহরে মসজেদ ও মাদ্রাসা তৈরি হয় এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিসের নানামুখী চর্চা হত। ইসলাম মূলত মানব কল্যাণের ধর্ম—এই মূল সত্য মনে রেখে খলিফা ধর্মীয় বিষয়ে নিগূঢ় গবেষণা ও উচ্চাঙ্গের আলোচনার দ্বারা ইসলাম ধর্মের সূক্ষ্ম ও মৌলিক নীতিগুলির বিশ্লেষণে উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মক্কা ও মদিনা পবিত্র কোরআন হাদিসের প্রাণকেন্দ্র ছিল, এ ছাড়াও খলিফা সমাজজীবনের উন্নতি সাধনে আল্লাহ ও মহানবীর (দঃ) বাণীর বহুমুখী চর্চার জন্য কুফা ও বসরায় গবেষণা কেন্দ্র গড়ে

তোলেন। এইভাবে খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে, তাঁর দরবারে তাঁর গবেষণা কেন্দ্রে জগৎ বিখ্যাত মনীষীগণের সমাগম হত। খ্যাতনামা শিল্পী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমুন্নত সঙ্গীত বিশারদ, কালজয়ী দক্ষ কারিগর ও কবি, দার্শনিক ও চিকিৎসক তাঁর দরবারকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। তাঁর সময়ের মদীনার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মা'বাদ, (Mabad) আল্ ফারাজদাক (Al-Farazdak) আজও অমর। সারা বিশ্বের সাহিত্য জগতের চির বিস্ময় 'লায়লা মজনু'-র আখ্যান তাদেরই কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর।

শিল্পানুরাগী নৃপতি ঃ চারু ও কারু শিল্পে খলিফা বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আল ফারাবী একটি সুন্দর কথা বলেছেন —"সোলাইমানের দরবার বিখ্যাত ছিল—উৎকৃষ্ট রন্ধন ও সুন্দরী মহিলার আলোচনার জন্য, ওমর-ইবন-আব্দুল আজিজের দরবার বিখ্যাত ছিল—ধর্ম ও কোরআন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এবং ওয়ালিদের দরবার বিখ্যাত ছিল— সুরম্য স্থাপত্যকীর্তি আলোচনার জন্যে। খলিফা তার রাজত্বকালে অসংখ্য দুর্গ, মসজেদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার প্রভৃতি নির্মাণ করে স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অনুরাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাঁরই রাজত্বকালে হেজাজের শাসনকর্তা দ্বিতীয় ওমর মহানবীর মদিনা-মসজেদটির সংস্কার করেন। তিনি ৭০৭-৭০৯ খ্রীস্টাব্দে এই কার্য সমাধানের জন্যে সিরিয়া, গ্রীক ও মিশর হতে কপটিক কারিগর সংগ্রহ করে প্রথম মারবেল পাথরের ব্যবহার দ্বারা মসজেদে নববীর চার কোণে চারটি মিনার নির্মাণ করেন। মদিনা মসজেদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—সর্বপ্রথম এতে ফাঁপা বক্র (Concave Mihyrab) মিহ্রাবের প্রচলন। খলিফা তাঁর পিতা আব্দুল মালিকের পুনঃনির্মিত জেরুজালেমের মসজেদ-ই-আকসার পূর্ণ সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জেরুজালেমের হেরেম শরীফের বহু সৌধের নানা সংস্কার করেন। তাঁরই সময় প্রথম পাথরের খিলানও ব্যবহার করা হয়। একদিন খলিফারই পৃষ্ঠপোষকতায় হাজ্জাজ কর্তৃক একটি বিশালাকৃতি মনোরম মসজেদ নির্মিত হয়।

খলিফা ওয়ালিদ তাঁর যে অমর কীর্তি দ্বারা ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ করে উমাইয়া রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাতার মর্যাদা লাভ করেন, সেটি হলো দামেস্কের জামে-মসজেদ। অনেকেই মনে করেন—এই মসজেদটি স্থাপত্য কীর্তির অনুপম নিদর্শন হিসাবে মুসলমানদের নিকট চতুর্থ মসজেদ। প্রথম— মক্কার বায়তুল হেরেম অর্থাৎ কাবা শরীফ, দ্বিতীয় জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দাস, তৃতীয় মদিনার মসজেদে নববী, চতুর্থ দামেস্কের জামে-মসজেদ।

এই মসজেদটির একটি পুরানো ইতিহাসও আছে। প্রথমে এটি ছিল একটি গ্রীক মন্দির, পরে সেন্টজনের গীর্জা। মুসলিম বিজয়ের পর এই গীর্জাটির অধিকাংশে নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। খলিফা ওয়ালিদ সিংহাসনে আরোহণ করে খ্রীস্টানদের নিকট বাকি অর্ধেকটি ক্রয় করে নেন এবং খ্রীস্টানদের জন্য অন্যত্র জমি ক্রয় করে গীর্জা নির্মাণের সম্পূর্ণ অর্থ দান করেন। পরে খলিফা ওয়ালিদ এইটাকে কেন্দ্র করে এমনি একটি সুপরিকল্পিত ও সুশোভিত মসজেদ নির্মাণের প্রয়াস পান, যা সিরিয়ার সমস্ত গীর্জাগুলোকে ম্লান করে দেয়। শুধু তাই-ই নয়, দামেস্কের এই মসজেদটির স্থাপত্য শৈলী ও স্থাপত্য কীর্তি আজও ইতিহাসে অতুলনীয়। একথা অনস্বীকার্য যে মদীনার মসজিদে নববীতে স্থাপত্য শিল্পের যে সূচনা, তা চরম উৎকর্ষ লাভ করে খলিফার হাতে দামেস্কের মসজেদে। স্থাপত্য শিল্পের এই ক্রমবিকাশে খলিফার অবদান অনস্বীকার্য।

এতদ্ব্যতীত খলিফা মরু অঞ্চলে কুশাইর আখরা নামে একটি প্রমোদ-প্রাসাদ (Pleasure-Castle) নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদটির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেওয়ালে আঁকা মনোরম চিত্রাবলী। এ সম্পর্কে হিট্টি বলেন—" মুসলিম চিত্রকলার প্রাচীনতম শিল্প নিদর্শন হলো—কুশাইর আখরার প্রাচীন চিত্রগুলি। এগুলির মধ্যে খ্রীস্টান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যত্র ট্রান্সজর্ডনে উমাইয়াদের প্রমোদ-প্রাসাদ ও স্নানাগারগুলিতে স্পেনের গথিক শাসক ও খলিফার শত্রু রোডারিক সহ বহু নৃপতির ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত চিত্রাবলী হতে খলিফার সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও কাব্য রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বন্য জন্তুদের আক্রমণরত ছবি এবং নর্তকী গায়িকাদের নগ্ন চিত্রাবলীও আছে। এই সমস্ত চিত্রাবলীতে সংস্কৃতির সমন্বয় রূপ ফুটে উঠেছে।

এককথায় খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকাল শান্তি-শৃঙ্খলা , সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সংস্কৃতি-সংহতি, ঐক্য ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-স্থাপত্য, চিত্রকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিজয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে চরম উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্য সমগ্র উমাইয়া রাজত্বের স্বর্ণযুগ। অধ্যাপক মুইর বলেন— " প্রথম হতে শেষ অবধি লক্ষ্য করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় খেলাফতের ইতিহাসে আল্ ওয়ালিদ অপেক্ষা অন্য কারও খেলাফত এত গৌরবোজ্জ্বল নহে। (" Looking at it from first to last , we shall not find in the annals of the Caliphate a more glorious reign than that of Al Walid")।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুলাইমান ও মহানুভব দ্বিতীয় ওমর

।। সুলাইমান ।।

[৭১৫-৭১৭ খ্রীঃ] [৯৬-৯৮ হিঃ]

প্রধান ঘটনাবলী

[সিংহাসনে আরোহণ — কার্যাবলী— ক্ষমাহীন অপরাধ — উত্তরাধিকার মনোনয়ন।]

সুলাইমানের সিংহাসনে আরোহণ ঃ সুলাইমান-এর সিংহাসন লাভে বংশের পূর্বতন ধারা ঠিকই থাকল। প্রথম মারওয়ান মৃত্যুকালে তার দুই পুত্রকে পর পর সিংহাসনে ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। কিন্তু প্রথম পুত্র আব্দুল মালিক শেষ বয়সে পিতার অসিয়ৎ বা অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেই ছোট ভাই আব্দুল আজিজকে বঞ্চিত করে তার আপন চার পুত্রকে পর পর খলিফা পদের জন্য মনোনীত করেন ঃ (১) ওয়ালিদ (২) সুলাইমান (৩) দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও (৪) হিশাম। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ শেষ সময়ে পিতার ন্যায় আপন ভাইদের বঞ্চিত করে স্বীয় পুত্রকে খলিফা মনোনীত করে পিতার অসিয়ৎকে অবমাননা করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ওয়ালিদের জীবিতকালেই তার পুত্র পরলোকগমন করলে তাঁর ভ্রাতা সুলাইমান ৭১৫ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন স্বাভাবিকভাবেই।

কার্যাবলী ঃ খলিফা সুলাইমানের জীবনের মূলনীতিটি অনুসরণ করলে তার কার্য প্রণালীকে বোঝার ও জানার কোন অসুবিধে হবে না। মূল নীতিটি হচ্ছে খলিফা সুলাইমানের সাথে পূর্বের খলিফা ওয়ালিদের সম্পর্ক ভাল ছিল না—যদিও তাঁরা ছিলেন সহোদর ভাই। তাই সুলাইমান খলিফা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিগত খলিফার কাছের মানুষদের শত্রু ভেবে বিনা বিচারে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেন।

হাজ্জাজ ছিলেন বিগত খলিফার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই খলিফা সুলাইমান সর্বপ্রথম হাজ্জাজ কর্তৃক বন্দী অসংখ্য বন্দীকে ইরাকের কারাগার হতে মুক্তি দেন। এইজন্য ইরাকীগণ তাঁকে "মিকতাহুল-খায়ের বা মঙ্গলের চাবি" নামে ভূষিত করেন। বিগত খলিফা মুদারীয়দের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তাই বর্তমান

খলিফা হিমারীয়দের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে শুরু করলেন। বর্তমান খলিফা হাজ্জাজ কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিদের বরখাস্ত করে নতুন লোক নিয়োগ করেন। বিগত খলিফা কোন দিনই হাশিমীদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, বর্তমান খলিফা হাশিমীদের প্রতি, তথা হযরত আলীর বংশধরদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এই কাজের দ্বারা খলিফা তার আপন বংশধর এবং উমাইয়া খেলাফতে আঘাত করেন।

খলিফার ক্ষমাহীন অপরাধ ঃ হাজ্জাজ খলিফা আব্দুল মালিককে প্রভাবান্বিত করেন, ফলে খলিফা ভ্রাতা আব্দুল আজিজকে খেলাফত হতে বঞ্চিত করে পুত্র ওয়ালিদকে খলিফা মনোনীত করেন। আবার খলিফা ওয়ালিদের সময়ও খলিফাকে সমর্থন করেন এবং পরামর্শ দেন ভ্রাতা সুলাইমানকে বঞ্চিত করে খলিফার আপন পুত্রকে খলিফা মনোনীত করার জন্যে। ইয়াজিদ-বিন মুহাল্লাব ছিলেন সুলাইমানের বন্ধু। সেই বন্ধুর প্রতি হাজ্জাজ অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে সুলাইমানের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পান। এই সমস্ত নানা কারণে হাজ্জাজের প্রতি বর্তমান খলিফা সুলাইমানের হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ক্রোধের কোন সীমা ছিল না। কিন্তু সুলাইমান যখন খলিফা হলেন, হাজ্জাজ তখন পরলোকে। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁকে খলিফা সুলাইমানের ক্রোধ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তখন ক্রোধে অন্ধ, নির্বোধ খলিফার সমস্ত আক্রোশ কেন্দ্রীভূত হলো স্বর্গত হাজ্জাজ এবং বিগত খলিফার নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জনের ওপর।

ক্রোধান্বিত খলিফা সুলাইমান এতটুকুও চিন্তা না করেই অন্যপক্ষ অপেক্ষাও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে হাজ্জাজের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ব্যক্তি, সিন্ধু বিজয়ী বীর নিরপরাধ মহম্মদ বিন-কাসেম এবং মধ্য এশিয়া বিজয়ী খ্যাতনামা বীর কুতাইবাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে শুধু অন্যায় নয় মহাপাপ করে গেছেন। ঠিক অনুরূপভাবে তিনি হত্যা করেন ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে আজও যাঁরা গর্ব ও গৌরব সেই স্পেন বিজয়ী মহাবীর মূসা ও তারিককে। যে সমস্ত বীরদের শৌর্য-বীর্যে, দুর্বার সাধনায়, বিরল বীরত্বে একদিন সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটাতে ইসলামের পতাকা উড্ডীয়মান হয়েছিল, যে কোন হিংসা বা প্রতিহিংসার বশে তাদের জীবনাবসান ঘটানো ক্ষমাহীন অপরাধ। নির্বোধ খলিফা এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে সেনাপতি মূসার পুত্র স্পেনের শাসনকর্তা আব্দুল আজিজকেও চরম নিষ্ঠুরভাবেই হত্যা করেন। উমাইয়া বংশের একটি কলঙ্কিত অধ্যায় হত্যার এই তাণ্ডব লীলায় রচিত হলো, অন্যদিকে

ইসলামের অগ্রগতি অনিবার্যভাবেই বিঘ্নিত হলো। হাজ্জাজের মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা সুলাইমানের অন্ধ নির্মমতাকে জন্ম দিয়েছিল—একথা হয়তো ঠিক, কিন্তু খলিফার এই আচরণ নিঃসন্দেহে তাঁর অপরাধের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছে। বস্তুত উমাইয়া রাজত্বের সেই কলঙ্কিত পর্বে সকলেই ভুলে গিয়েছিলেন মহানবীর বাণীকে—"মাত্রাতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়, মধ্য পথই উত্তম পথ।"

অন্যান্য কার্যাবলী : খলিফা খোরাসানের শাসনকর্তা কুতাইবাকে হত্যার পর হাজ্জাজ কর্তৃক নির্যাতিত মুহল্লাবের পুত্র ইয়াজীদকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইয়াজীদ আপন যোগ্যতা বলে গুঁর্গাও তাবাবিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। খলিফার রাজত্বকালে কনস্টানটিনোপাল অভিযান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খলিফা সুলাইমান তাঁর ভ্রাতা স্বর্গত খলিফা ওয়ালিদের স্পেন জয়ের মত একটি বিরাট জয়ের নেশায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সব জিনিস সবার ভাগ্যে একইভাবে ঘটে না। তখন স্পেনের অবস্থা ছিল অন্যরূপ।

রোডারিক গোথিক রাজাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে স্পেনের সিংহাসন দখল করার পর দ্বিতীয় আক্রমণে সিউটার রাজা জুলিয়ানকে পরাস্ত করে তাঁর বিবাহযোগ্যা পরমাসুন্দরী কন্যা ফ্লোরেণ্ডাকে বিয়ে না করে জোরপূর্বক রক্ষিতারূপে ব্যবহার করায় পিতা জুলিয়ান বীর মুসাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন স্পেন বিজয়ের জন্যে। ঠিক অনুরূপভাবে গ্রীক সেনাপতি লিও সুলাইমানকে আমন্ত্রণ জানাল—কনস্টানটিনোপল জয়ের জন্যে। এই আমন্ত্রণেই খলিফা সুলাইমান ৭১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দে মাসালামার নেতৃত্বে কনস্টানটিনোপলে অভিযান প্রেরণ করেন। মুসলিম সেনাবাহিনী হেলেস্‌মন্ট অতিক্রম করে শহর অবরোধ করলে সুচতুর সেনাপতি লিও হঠাৎ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে থাকলে গ্রীক সম্রাট তৃতীয় থিওড্‌সিয়াস্‌ সিংহাসন ত্যাগ করে পলায়ন করতে বাধ্য হন। সঙ্গে সঙ্গে লিও সিংহাসনে আরোহণ করে সেনাপতি মাসালামার সামান্য সংখ্যক সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলেন। মুসলিম সেনাপতি মাসালামা প্রতারক 'লিও'-র এরূপ আশাতীত বিশ্বাসঘাতকতায় দারুণ মর্মাহত হন। সেনাপতি লিও ইচ্ছা করেই সেনাপতি মাসালামাকে অতি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিধাতাও বাদ সাধলেন, দেখা দিল—দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ফলে খলিফা সুলাইমানও আর কোন সাহায্য পাঠাতে পারলেন না। প্রয়োজনীয় সাহায্যের অভাবে মুসলিম অভিযান ব্যর্থ হল। পবিত্র কোরআন বলে—"তোমাদের ইচ্ছার কোন মূল্য নাই, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত।"

খলিফা প্যালেস্টাইনে রামলা নামক একটি শহর নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতেন এবং সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করার জন্য দাবিক নগরে যাতায়াত করতেন। সেখানেই ৭১৯ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তার জীবনাবসান ঘটে।

উত্তরাধিকার মনোনয়ন : খলিফা সুলাইমান তাঁর সকল কাজে একই নীতি প্রয়োগ করেছেন। উত্তরাধিকার মনোনয়নেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

দ্বিতীয় ওমর হাজ্জাজের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে স্বয়ং খলিফার রোষানলে প্রাদেশিক গভর্নরের পদ হারিয়েছিলেন। যদি তিনি সেদিন হাজ্জাজের কৃপাদৃষ্টিতে পড়ে খলিফা ওয়ালিদের প্রশংসাভাজন হতে পারতেন, তাহলে বর্তমান খলিফা সুলাইমানের কৃপাণের অব্যর্থ আঘাত থেকে অন্যান্যদের মত তাঁকেও কেউ রক্ষা করতে পারত না। বিধাতা যা করেন ভালই করেন। খলিফা সুলাইমান তাঁর (নাবালক) পুত্র থাকা সত্ত্বেও হাজ্জাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও ওয়ালিদ কর্তৃক বঞ্চিত দ্বিতীয় ওমরকেই ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। নিষ্ঠুর হাজ্জাজের উত্তরে জন্ম নিল—নির্মম সুলাইমান। এই উত্তরাধিকার মনোনয়নের জন্য সমগ্র আরব দুনিয়া উল্লাসভরে খলিফা সুলাইমানকে 'আশীর্বাদের চাবি' (The Key of Blessing) উপাধিতে ভূষিত করেন। অনেকে বলেন—রাজা ইবন্-হয়া নামক একজন সূফী এই উত্তরাধিকার মনোনয়নে খলিফাকে সৎ উপদেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত করেন।

চরিত্র : স্বাস্থ্যের দিকে বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী সুলাইমান ইসলামের ইতিহাসের একটি কলঙ্ক স্বরূপ। একদিকে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর, অন্যদিকে ছিলেন হৃদয়বান ; একদিকে ছিলেন ধার্মিক ; অন্যদিকে ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, একদিকে তিনি আশীর্বাদের চাবি, অন্যদিকে তিনি অভিশাপের সিন্ধু। মহম্মদ বিন-কাসেম, আব্দুল আজিজ, মূসা ও তারিক-এর জীবনাবসান তাঁরই নিষ্ঠুরতায় চির সাক্ষী।

।। মহানুভব দ্বিতীয় ওমর ।।

[৭১৭ - ২০ খ্রীঃ] [৯৯-১০১ হিঃ]
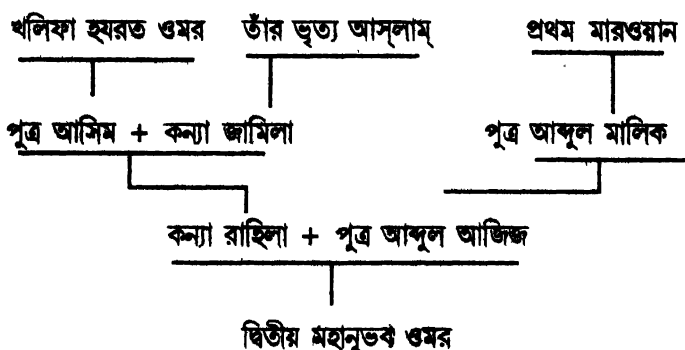
আপন পুত্রের বিয়ে দিলে কার সাথে
জগৎ-পুত্রের পিতা শিক্ষা নিক্ তাতে।
বধূ রূপে যে বালিকা ঘরে এল আজ
দ্বারে দ্বারে দুগ্ধ বেচা ছিল তার কাজ।
ন্যায়ের প্রবাদ পুরুষ খলিফা ওমর
খলিফার বেয়াই হলো আস্‌লাম্ চাকর।

সৎ ওমর বালিকারে সৎ শুধু জেনে
সততার মূল্য দিলেন বধূ রূপে এনে।
যে-বালিকা হলো আজ বিশ্ব-বিখ্যাত
দ্বিতীয় ওমর-মাতা তাঁরই গর্ভজাত।

—কাব্যকানন

প্রধান ঘটনাবলী

[দ্বিতীয় ওমর—উমাইয়া সাধু ওমর—পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন ওমর—অসাম্রাজ্যবাদী ওমর—শাসক ওমর—নীতির প্রবক্তা ওমর—আদর্শ মানব ওমর—ঘৃণা প্রথা রহিতকারী ওমর—অনারবদের প্রতি ওমর—ধর্মপ্রাণ ওমর—বৈদেশিক নীতিতে ওমর—রাজস্ব নীতি—পতনের জন্য কে দায়ী—নীতির জন্য শহীদ ওমর—

অজাতশত্রু ওমর—ধর্মীয় নীতিতে ওমর—সংগঠক ওমর—উদারতার বলি ওমর—চরিত্র ও কৃতিত্ব।]

দ্বিতীয় ওমর ঃ খলিফা সুলাইমানের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনয়ন-ক্রমে ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ ৭১৭ খ্রীস্টাব্দে খেলাফত লাভ করেন। পিতা আব্দুল আজিজ ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিকের ভাই। মাতা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের দৌহিত্রী। হযরত ওমরের সাথে তার চরিত্রের এতই সাদৃশ্য ছিল যে সমগ্র আরব তাঁকে "দ্বিতীয় ওমর" নামে অভিহিত করেন।

উমাইয়া সাধু ওমর ঃ উমাইয়া বংশের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমরের আবির্ভাব ও অভিষেক আরবের জাতীয়াকাশে একটি চির উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় স্বরূপ। কেননা, সমগ্র উমাইয়া ইতিহাসের প্রচলিত নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, বর্বরতা, ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবোধ, সন্ত্রাসবাদ, অনাচার-অত্যাচার, অধর্ম, অকর্ম, বিলাসিতা-অমিতব্যয়িতা কোন কিছুই দ্বিতীয় ওমরকে স্পর্শ করে নি — তিনি ছিলেন এ সবের উর্ধ্বে। উমাইয়া রাজত্বের চরম অবক্ষয়ের কালে দ্বিতীয় ওমরের খেলাফতের সূচনা। প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে তিনি হেজাজের শাসনকর্তা থাকাকালীন অন্যান্য উমাইয়া খলিফাদের স্বেচ্ছাচারী নীতি বর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করে ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা ও উদারতার যে পরকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তার জন্যে আরব জনগণ তাঁকে খলিফা হওয়ার পূর্বেই 'উমাইয়া সাধু' (Umayyad Saint) নামে ভূষিত করেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফা দ্বিতীয় ওমরের নীতি ও কৃতিত্ব ঃ (Policy and achievements of Second Umar) কি কারণে বা কোন্ গুণে সমগ্র আরব কর্তৃক দ্বিতীয় ওমর, "খোলাফায়ে রাশেদীনের" (সৎপথে পরিচালিত চার জন খলিফা) 'পঞ্চম খলিফা' এই গৌরবময় ও অনন্যসাধারণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তা তাঁর গৃহীত ও বর্জিত নীতিগুলো পরপর তুলে ধরলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১ অসাম্রাজ্যবাদী ওমর ঃ মহানুভব দ্বিতীয় ওমর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানবতার রশ্মিলোকেই সব কিছুই দেখেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বতন খলিফাদের সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী ও স্বার্থান্বেষী নীতি বর্জন করেন। এই মহামানবের শাসননীতির প্রধানত দুটো রূপ আমরা দেখতে পাই, একটি বাইরের ও অন্যটি ভিতরের। অর্থাৎ একটি বহির্জগতের প্রতি এবং অন্যটি অভ্যন্তরীণ। প্রথমটি সাম্রাজ্যবাদী সমরনীতির পরিবর্তে শান্তি সংরক্ষণ ও সহাবস্থান নীতির অনুসরণ। দ্বিতীয়টি দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় স্বজন প্রীতি, দলপ্রীতি,

গোত্র প্রীতি, গোষ্ঠী প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের পরিবর্তে ধর্ম-বর্ণ-বংশ নিরপেক্ষ নীতির যথাযথ প্রয়োগ। এই দুটোই ছিল দ্বিতীয় ওমরের নীতি নির্ধারণের মানদণ্ড।

২. শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনে ওমর (নিরপেক্ষ নিয়োগকারী) ঃ দ্বিতীয় ওমরের রাজ্য শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল—জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাপালন, মানুষের সেবা তথা মানবতার সেবা। ন্যায় নিষ্ঠ-ধর্মভীরু খলিফা দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে কোনরূপ দুর্বলতার পরিচয় দেন নি। তিনি তার অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠনে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি নজর দেন। তিনি এক দিকে নির্মম হস্তে অযোগ্য, অসৎ ও অত্যাচারী শাসকদের বরখাস্ত করে অন্যদিকে যোগ্য সৎ ন্যায়নিষ্ঠ উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। বরখাস্ত ও নিযুক্তিকরণে তিনি ছিলেন দল-গোত্র ও বংশের বহু ঊর্ধ্বে। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি যোগ্যের সম্মান দিতে কার্পণ্য করে নি। ঐ সময় দুটি বিবদমান দল ছিল—একটি হিমারীয় অন্যটি মুদারীয়। উমাইয়া খলিফাগণ প্রধানত মুদারীয়গণকে প্রাধান্য দিয়েছেন,—একমাত্র খলিফা সুলাইমান হিমারীয় গোত্রের পৃষ্টপোষকতা করেন। দ্বিতীয় ওমর দু দলকেই সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। মুদারীয় গোত্রের উপযুক্ত ব্যক্তি আদি-বিন-আবতাতকে বসরায়, আব্দুল হামিদ-বিন-আব্দুর রহমানকে কুফায় ওমর-বিন-হুরায়রাকে মেসোপটেমিয়ায়, জাররা-বিন আব্দুল্লাকে খোরাসানে এবং হিমারীয় গোত্রের সামাহ-বিন-মালিককে স্পেনে ও ইসমাইল বিন-আব্দুল্লাহকে কায়রোয়ানে শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ খলিফার দল-গোত্র নির্বিশেষে নিরপেক্ষতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৩. নিরপেক্ষ বরখাস্তকারী ঃ দ্বিতীয় ওমর শুধু যে যোগ্য নিয়োগকারীর পরিচয় রেখে গেছেন তা নয়। তিনি দলীয় স্বার্থের বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করে অসৎ-অত্যাচারী শাসন কর্তাদের বরখাস্ত করে ন্যায় ও নীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করতেন না। কোন দিন কোন দুর্বলতাই ওমরের স্বচ্ছ ও সুনির্মল চিন্তা জগতকে কুয়াসাচ্ছন্ন করতে পারে নি। খোরাসানের শাসনকর্তা উমাইয়াপন্থী ইয়াজিদ বিণ-মুহাল্লাবকে অত্যাচারের জন্য শুধু তাঁর পদ হতে অপসারিত করেন নি, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অপরাধে খলিফা তাকে কারারুদ্ধও করেন। আবার একই অপরাধে অপরাধী শাসনকর্তা আল হুরও তার নিকট নিষ্কৃতি পান নি। কোন দুর্বলতাই তাঁর নীতি ও কর্তব্যবোধকে বিচলিত করতে পারে নি। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্তা।

৪. নীতির প্রবক্তা ওমর ঃ শাসন ব্যবস্থা যাতে সর্বত্র শান্তিদায়ক হয়, সর্বত্র

তার রূপ একই থাকে সেই জন্য খলিফা সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট একটি নির্দেশনামা পাঠান "আপনাদের জেনে রাখা কর্তব্য যে, ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতা দ্বারাই ধর্মের যথার্থ প্রতিপালন ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে, কোন পাপকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়, জনাকীর্ণ স্থানকে জনশূন্য করার চেষ্টা করবেন না, প্রজাদের উপর সাধ্যাতীত কোন চাপ দেবেন না। তারা যা দিতে পারে সাধ্যমত, তাই গ্রহণ করবেন। জনসংখ্যা ও আয় যাতে বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবেন, শাসন নম্র ও নিষ্ঠুরহীন হওয়ার চেষ্টা করবেন, যে কোন উপলক্ষে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করবেন না, জনসাধারণের মধ্যে বিনা মূল্যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিতরণ করবেন, পর্যটক, বিবাহ ও উটের দুধের উপর কোন কর ধার্য করবেন না, যে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাকে জিজিয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না।" এই কয়েকটি উপদেশ হতে আমরা খলিফা ওমরের ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান, জনকল্যাণ, ইসলামের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ, সাম্য ও সমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যার জন্য তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্গত পঞ্চম সৎ খলিফা বলা হয়ে থাকে।

৫. আদর্শ মানবাচার্য ওমর ঃ খলিফা ওমরের জীবনে আদর্শ ছিল 'অপনি আচার ধর্ম অপরে শেখাও' অর্থাৎ অপরকে সেই পথেই চলতে বলতেন, যে পথে তিনি স্বয়ং চলতে পারতেন। খলিফার আসন অলংকৃত করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার নিকট যে ৫০,০০০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ছিল তার থেকে মাত্র ২০০ শত টাকা মূল্যের সম্পত্তি নিজের জন্য রেখে বাকি সমস্ত জনসাধারণের বাইতুলমালে (কোষাগারে) জমা দেন। তার স্ত্রী ফাতেমা ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিকের কন্যা ও খলিফা ওয়ালিদের বোন। বিবাহের সময় তিনি পিতার নিকট হতে অগাধ ধন-রত্ন লাভ করেন। খলিফা ওমর খেলাফত পদ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ফাতেমাকে নির্দেশ দেন তাঁর সমস্ত ধন-রত্ন বাইতুল মালে গরিবদের জন্য জমা দিতে। স্ত্রী অতি আনন্দেই স্বামীর নির্দেশ পালন করে আজও অমর। খলিফা হিসাবে ওমর যে রাজকীয় অশ্বগুলো পেয়েছিলেন, সে গুলোকেও ঐ একইভাবে বিক্রি করে বাইতুলমালে জমা দেন। এইভাবে সমগ্র দেশের সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন ত্যাগের আদর্শ কাজের মাধ্যমে, কোন ভাষণে নয়, —যা এক দৃষ্টান্ত হিসেবে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৬. ঘৃণ্য প্রথার রহিতকারী ওমর ঃ মদিনার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত মহানবীর (দঃ) ফিদাক নামে একটি উদ্যান ছিল, কিন্তু মারওয়ান হযরত আলীর বংশধরদের প্রতি বিদ্বেষবশত ঐ উদ্যানটি আত্মসাৎ করেন। পরবর্তীকালে

খলিফা ওমর এটিকে মহানবীর (দঃ) পরিবারবর্গকে প্রত্যর্পণ করেন। এই উদ্যান হতেই তাঁদের ভরণপোষণ চলত। খলিফা ওমর মহানবীর (দঃ) পরিবারবর্গের প্রতি শুধু সহানুভূতিশীলই ছিলেন না, তিনি তাঁদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সম্মানের চোখে দেখতেন। এটা ছিল খলিফার চরম মহানুভবতার পরিচয়। উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া হযরত আলীর সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই জন্য সমস্ত উমাইয়া খলিফা ও তাঁদের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ শুক্রবার জুম্মার নামাযের সময় মসজেদের মিম্বর হতে হযরত আলী ও তাঁর বংশদরদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করতেন। ন্যায়পরায়ণ খলিফা ওমর এই জঘন্যতম ঘৃণ্য প্রথা রহিত করেন। অন্যান্য সাহাবাদের প্রতিও যে অন্যায় আচরণ হয়েছিল, তিনি তারও সংশোধন করেন।

৭. খারিজী, মাওয়ালী ও অমুসলমানীদের প্রতি ওমর :

খারিজী : হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধে যে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ আরম্ভ হয়—তারই জের দেখা যায় কারবালার মরু প্রান্তরে। ঐ সংঘর্ষ থেকেই হযরত আলীর সমর্থক খারিজীদের উৎপত্তি, কারবালা প্রান্তরে যার নতুন সংস্করণ দেখা যায়। খারিজীরা চিরদিনই উমাইয়াদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন। উমাইয়াগণও তাঁদের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বে এই বৈরীভাবের অবসান লক্ষ্য করা যায়। খলিফা খারিজীদের প্রতি খলিফার ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। এই কারণে খারিজীরা কোথাও শান্তি ভঙ্গ না করে খলিফাকে সাহায্য করারই চেষ্টা করেন। শান্তিপ্রিয় খলিফা ছিলেন রক্তপাত নীতির ঘোর বিরোধী। তিনি কুফার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন—"যদি খারিজীগণ দেশে গোলযোগ ও রক্তপাত না করে তাহলে বিনা কারণে যেন তাদের আক্রমণ করা না হয়।" খলিফার ন্যায় ও সহানুভূতিশীল ব্যবহারে খারিজীগণ তাঁর বন্ধু হতে দাসে পরিণত হয়।

মাওয়ালী : অনারব মুসলমানদের মাওয়ালী বলা হত। অন্যান্য খলিফাদের সময় আরব মুসলমান ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। আবার আরব মুসলমানেরা কোরাইশী ও অকোরাইশী এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আবার কোরাইশদের মধ্যেও উমাইয়া ও হাশেমী দলে বিরাট ব্যবধান ছিল। নব দীক্ষিত মুসলমানগণ অর্থাৎ মাওয়ালীগণ অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ গ্রহণ করতেন, কিন্তু তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হতেন। দূরদর্শী ওমর মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ়করণের জন্য আরব-অনারব বৈষম্য দূরীভূত করতে প্রয়াস পান।

তিনি মনে করেন সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা না থাকলে রাজ্য কোন দিনই শক্তিশালী হতে পারে না। বরং সেখানে সৃষ্টি হবে শোষক ও শাসিত শ্রেণী। তাই তিনি এই ব্যবধান রহিত করার জন্য সব করমের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে হাজ্জাজ অন্যায়ভাবেই মাওয়ালীদের উপর খারাজ ও জিজিয়া কর ধার্য করে চরম পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেন। খলিফা ওমর শাসনকার্য হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাওয়ালীদের উপর হতে এই অন্যায় কর রহিত করে ন্যায় বিচারের পরিচয় দেন। সঙ্গে সঙ্গে খলিফা মাওয়ালীদের জন্য পেনসন ব্যবস্থার প্রচলন করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকেই যুদ্ধরত আরবদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য পেনসন ও ভাতার ব্যবস্থা ছিল। মুয়াবিয়া এই ব্যবস্থাপনায় কিছু পক্ষপাতিত্বমূলক পরিবর্তন করেন। আবদুল মালিক ও মাওয়ালীদের জন্য ভাতা বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে মহানুভব ওমর সকলের জন্যই একই ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করে চরম বদান্যতার পরিচয় রেখে গেছেন।

অমুসলমান ঃ দ্বিতীয় ওমর শুধু আরব ইতিহাসের নয়, সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসের এক মহামতি মহানুভর ও উদার ব্যক্তি। বস্তুত দ্বিতীয় ওমরের মতো ব্যক্তিদের কোন জাতি ধর্ম বা বর্ণ নেই। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই মানুষ, তাঁদের জাত ছিল—মানব জাতি। তাই তারা সমগ্র মানব জাতির গৌরব ও গর্ব। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে খলিফা সকলের প্রতি সমান উদার ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। খাঁটি ধার্মিক ছিলেন বলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। তাঁর সময় তিনি কোথাও একটিও পুরাতন মন্দিরকে ধবংসের কবলে পতিত হতে দেন নি। অমুসলমান বা বিধর্মীদের পবিত্র ধর্মীয় স্থানগুলোকে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে ইহুদীদের 'সিনাগগ' (Synagogue), খ্রীস্টানদের গীর্জা, পারশিকদের অগ্নি উপাসনা গৃহগুলো সযত্নে রক্ষিত হতো। মাঝে মাঝে সেগুলোর সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য খলিফা টাকা বা অনুদানও মঞ্জুর করতেন। আমীর আলী বলেন—"প্রাচীন আত্মসমর্পণ রীতি অনুযায়ী মুসলমান খ্রীস্টানদের যে সমস্ত গীর্জা ও ইহুদীদের সিনাগগ (ধর্ম মন্দির) লাভ করেছিলেন, তিনি সেগুলো তাঁদের প্রত্যর্পণ করেন।" এই প্রসঙ্গে দামেস্কের খ্রীস্টানগণ খলিফা ওয়ালিদ কর্তৃক সেন্ট জনের গীর্জাটিকে মসজেদে রূপান্তরিত করার কথা খলিফাকে স্মরণ করালে মহামতি খলিফা মুসলমান দ্বারা অধিকৃত সেন্ট টমাসের গীর্জাটি তাদের ব্যবহার করার অনুমতি দেন। আইলা ও সাইপ্রাসের খ্রীস্টানদের বার্ষিক কর তিনি লাঘব করে দেন। নাজরানের

খ্রীস্টানগণ হযরত ওমরের সময় কুফায় বসতি স্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। পরবর্তীকালে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০০ মাত্র। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উমাইয়া সরকার তাদের ধার্যকৃত পূর্বতন কর হ্রাস না করায় তারা যথাসময়ে মহামতি খলিফা দ্বিতীয় ওমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের দুই সহস্র বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তে মাত্র দু শত বস্ত্রখণ্ড বার্ষিক কর ধার্য করেন। অমুসলমান প্রজাবর্গের এইরূপ অভাব ও অভিযোগগুলির প্রতিকার করতে নিষ্ঠাবান ওমর কোন দিনই দ্বিধাবোধ করতেন না। যার ফলে তাঁর সাম্রাজ্য একটি একান্নবর্তী পরিবারে পরিণত হয়েছিল ।

৮. ধর্মপ্রাণ ওমর ঃ ধর্ম-প্রাণ ওমর চিরদিনই উদার ছিলেন। সকল ধর্মের অনুশাসনের মূল লক্ষ্যগুলিকে তিনি মানব কল্যাণে ও মানব চরিত্রের চরম উন্নতি বিধানের উপায় হিসেবে বোঝার ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতেন। ইসলাম ধর্মের শাশ্বত অবদান ও আবেদন কি, তা তিনি পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বিচার বিবেচনা করে বিধি বিধান দান করতেন। ইসলামের মূল ব্রত ও লক্ষ্য বলতে তিনি যা বুঝেছিলেন—মানুষের সেবা ও মানবতার উত্থান, সাম্য ও শান্তির প্রবর্তন, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। মহামতি খলিফা ধর্মের অমোঘ বাণীকে ও পবিত্র কোরআনের প্রকাশ্য ঘোষণাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলেন— অর্থাৎ "ধর্মে বল প্রয়োগ নাই—লা ইকরা ফিদ দীনে।" তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নি কৃপাণ ধর্ম প্রচারে সাহায্য করতে পারে। আল্লাহর বন্দনা, মানুষের সেবা এবং জগতের কল্যাণ এইতো ইসলামের মূল কথা। ইসলামের এই শাশ্বত সত্যকে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর রাজ্য পরিচালনার মূল নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর নির্ধারিত নীতি তাই জাতি ধর্ম-বর্ণ-বংশ-গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্যই ছিল এক অফুরন্ত আশীর্বাদ। মহামতি খলিফা মনে বিশ্বাস করতেন—ইসলামের প্রচার হবে কোরআনের অমিয় বাণীতে, এই কারণেই কোরআনের শাশ্বত বাণীকে সর্বত্র প্রয়োগ করে সমগ্র রাজ্যকে হিংসা দ্বেষ থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। খলিফা ওমর ইসলামের সাম্যের বাণীর দ্বারা মুসলমান-অমুসলমান, কোরাইশ অকোরাইশ, আরব-অনারব, উমাইয়া-হাশিমী সকল সম্প্রদায়কে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। সেখানে আর মাওয়ালী-খারিজী, অমুসলমান কারো কোন অভিযোগ নেই। আলী বংশের কোন মর্মভেদী অভিমানও আর নেই। নবী বংশের প্রতি অবিবেচনার জন্য আপামর জনসাধারণের উত্তাল হয়ে ওঠার কোন কারণ আর সেখানে থাকে না। দ্বিতীয়ত ওমরের সময় খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজত্বকালে ইসলামের সেই

ভুবনমোহিনী রূপ আবার ফুটে উঠল। আবার দিকে দিকে বেজে উঠল ইসলামের সেই বিজয় ডঙ্কা। ফলে সুদূর খোরাসান, মধ্য এশয়ার বালখ, বোখারা, সমরখন্দ, তাসখণ্ড, খাওয়ারিজম, নিশাপুর প্রভৃতি স্থানের মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকলেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সাম্যবাদ মানুষ মাত্রকেই পাগল করে তুলল। এমন কি উত্তর আফ্রিকার দুর্ধর্ষ বার্বারিগণও ইসলামের শান্তিপূর্ণ তৌহিদের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। স্পেনের অধিবাসীগণ স্বেচ্ছায় সারাগোসায় একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। সিন্ধুনদের তীরেও অসংখ্য মুসলমান বসতি গড়ে উঠল। এইভাবে মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকল, ফলে জিজিয়া, খারাজ প্রভৃতি কর রহিত হয়ে যাওয়ায় মিশরের শাসনকর্তা খলিফাকে জানালেন—এইভাবে মানুষ দলে দলে মুসলমান হলে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে। তখন খলিফা উত্তর দিলেন—"আল্লাহ্ তাঁর রসুল মহম্মদ (দঃ)-কে ধর্মপ্রচারকরূপে প্রেরণ করেন, তহশীলদার বা কর আদায়কারী রূপে নহে।" অনুরূপভাবে খোরাসানের শাসনকর্তা নবদীক্ষিত মুসলমানদের ঈমান (বিশ্বাস) পরীক্ষা করার জন্য 'খৎনা' করার নির্দেশ দিলে খলিফা এই বলে তাঁর নির্দেশকে রহিত করেন যে, "আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করার জন্য পাঠান, 'খৎনা' করার জন্য নয়। মুইর বলেন—"প্রকৃত বিশ্বাসীদের দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি, ধর্মকে সংহত এবং তরবারিকে পরিহার করাই ছিল ওমরের নীতি, তাঁর অল্প ও ক্ষণস্থায়ী রাজত্বের মধ্যে তিনি এই নীতিতে চরম সাফল্য লাভ করেন।"

৯. **বৈদেশিক নীতিতে ওমর ঃ** খলিফা ওমর চিরদিনই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। যার ফলে তাঁর রাজত্বকালে কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান প্রেরিত হয় নি। তিনি সমর নীতি, রক্তপাত, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি শুধু পরিহারই করেন নি, মনে প্রাণে ঘৃণা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শান্তিবাদী। রাজ্য বিস্তার নয়, বিজিত রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করা ছিল তার নীতি। নিজে শান্তিতে থাকা এবং অপরকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া, এই নীতি অনুসরণ করে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের সমস্ত সামরিক অভিযানগুলি বাতিল করে দেন। যে সমস্ত সেনাপতি বিদেশে রাজ্য বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। এই সূত্রে তিনি সেনাপতি মাসালামাকে কনস্টান্টিনোপল হতে অবরোধ উঠিয়ে দেশে ফেরার নির্দেশ দেন। স্পেনে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে আল হুরের স্থানে যোগ্য প্রশাসক আল-সামাহ্কে নিযুক্ত করেন। এই সময় স্পেনে, ভূমি জরিপ,

আদমসুমারী, সেতু ও রাজপথ নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি নানা সংস্কারমূলক এবং জনহিতকর কাজ সম্পন্ন হয়। সারাগোসায় তিনি একটি চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করেন। এই সময় বিদ্রোহী খ্রীস্টানদের দমন করতে সেনাপতি আল-সামাহ্ একটি বাহিনীসহ পিরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করে ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে অভিযান করলে কুইটেনের রাজধানী তুলোসে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে খ্রীস্টান রাজা ডিউক ও'ডেস ফ্রান্সের সম্রাট চার্লস মার্টিনের সাহায্যে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি আল্ সামাহ্ নিহত হলে আব্দুর রহমান সেনাপতির ভার গ্রহণ করেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে আনেন। পরবর্তীকালে খলিফা আর কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন নি। সামরিক বিজয়ের সাহায্যে ইসলামের বিস্তার—এই নীতি পরিহার করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে জন্মগত ভাবেই তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় শান্ত মানুষ এবং শান্তিতেই ইসলাম।

১০. ওমরের রাজস্ব নীতি ঃ ওমরের উদার নীতিতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। হাজ্জাজের সময় আরব-মুসলমান ব্যতীত সকলকেই জিজিয়া কর দিতে হত। খলিফা ওমর সকল দেশে সর্বশেষে মুসলমানদের উপর এই কর রহিত করেন। ফলে অনেকেই এই কর হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ইসলামে দীক্ষিত হল, ইসলামের গুণগত দিকে মুগ্ধ হয়ে নয়। এই ব্যবস্থার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত মুসলমানগণকে ভূমিকর বা খারাজ দিতে হত না। তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ উশর দিতে হত। এই খারাজ হতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় বহু লোক মুসলমান হয়। এতেও রাজকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হল। রাজকোষের এই শূন্যতা লক্ষ্য করে তার প্রতিবিধানের উদ্দেশে খলিফা কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন। যার ফলে রাজকোষ আর দীর্ঘদিন কোন অসুবিধায় পড়ে নি। সকল অমুসলমানকে যেমন জিজিয়া কর দিতে হত, তেমনি সকল মুসলমানকে খারাজ দেওয়ার প্রথা চালু হয়। ৭১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দে আইন জারী করে অমুসলমানদের নিকট হতে মুসলমানদের জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। ফলে রাজকোষে যেটুকু আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছিল—তা প্রায়ই পূরণ হয়ে গেল। সুতরাং দ্বিতীয় ওমরের সময় তাঁর উদার নীতির ফলে রাজকোষের দুর্বলতা প্রসঙ্গে যে সমালোচনা করা হয়, তা সঠিক নয়।

খলিফা ওমরের অনুসৃত নীতিগুলির আলোচনা করে দেখা গেল তিনি এক বিরল ব্যক্তিত্ব। যে ব্যক্তিত্বের ছটায় শুধু উমাইয়া বংশ নয় সমগ্র মানবকুল গর্ব

৯

বোধ করতে পারে। তাঁকে 'খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফা' আখ্যা দিয়ে সমগ্র আরব তাঁর সৎ কাজের যথার্থ মূল্যায়ন করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উমাইয়া খেলাফতের পতনের জন্য ওমর কতদূর দায়ী ঃ

পতন কেন ঃ মহানুভব ধর্মপ্রাণ প্রজাবৎসল বিচক্ষণ খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসনব্যবস্থা মূলত জনকল্যাণমূলক কাজে প্রবর্তিত হলেও অনেক কাণ্ডজ্ঞানহীন ঐতিহাসিক তাঁর বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন এবং তাঁর ব্যবস্থাকে উমাইয়া রাজত্বের পতনের জন্য দায়ী বলতেও দ্বিধা করেন নি। গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে অনেকেই এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তি করেছেন। আমরা ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখব, উমাইয়া রাজত্বের পতনের জন্য সত্যকার দায়ী কে বা কারা, দ্বিতীয় ওমরের শাসন নীতি না স্বয়ং উমাইয়াদেরই ষড়যন্ত্র নীতি।

ওমরের পদ্ধতির মূল নীতি ঃ খলিফা ওমরের শাসন ব্যবস্থাকে সরাসরি প্রগতিশীল না বললেও তাঁর শাসন ব্যবস্থা যে জনকল্যাণমূলক, গরিব দরদী ও রক্ষণশীল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—ঐতিহাসিক ব্রাউন বলেন—'খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিখ্যাত ওমর-ইবন খাত্তাবের সময়ে যে শাসন নীতি প্রচলিত ছিল, দ্বিতীয় ওমর সেই ব্যবস্থাকেই হুবহু অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁর শাসন পদ্ধতি সাফল্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত রক্ষণশীল, এমন কি প্রতিক্রিয়াশীলও ছিল।' খলিফা দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বকালের মূল বৈশিষ্ট্য বা গৃহীত নীতিগুলি ঃ (১) মানবতার সেবায় মহানবী (দঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ; (২) তাঁর মহান ব্রত ইসলামের প্রচারের জন্য অনুপ্রেরণা দান; (৩) সাম্য ও শান্তির ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নীতির জয়গান, প্রয়োগ ও প্রচার; (৪) গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করে গোত্র কলহ নির্মূল করা ; (৫) সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতিকে বর্জন করে সংরক্ষণ নীতির যথাযথ প্রয়োগ ; (৬) ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপন; (৭) রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার ; (৮) মহানবী (দঃ) বা হযরত আলীর (কঃ) পরিবারের প্রতি অবিবেচক নীতির পরিবর্তন ; (৯) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-দল নির্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিদের শাসনকার্যে নিয়োগ ; (১০) দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

নীতির জন্য শহীদ ওমর ঃ খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসনকালে তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করলে অতি সহজেই অনুমান করা যায়, তাঁর রাজ্য কতখানি রক্ষণশীল ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর পূর্বে এমন একজনও উমাইয়া খলিফা ছিলেন না, যাঁর খেলাফত কালে—আরব-অনারব, হিমারীয়-

মুদারীয়, শিয়া-সুন্নী, খারিজী-মাওয়ালী, কোরাইশী-অকোরাইশী ও হাশেমী এবং উমাইয়গণ নানা কলহ-দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ-হিংসা, অনাচার-গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি অসামাজিক ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যে লিপ্ত ছিলেন না, কিন্তু দ্বিতীয় ওমর তাঁর বলিষ্ঠ ন্যায় নীতি ও সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, সকল দল, শ্রেণী, গোত্র, বংশ সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর সমগ্র রাজ্যে এক অনাবিল সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করতে থাকে। এই কথারই প্রতিধ্বনি করে মূইর বলেন—"দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা না ঘটলেও আকর্ষণীয় ঘটনার অভাব ছিল না। উমাইয়াদের রক্তপাত, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে তাঁর রাজত্বকাল ছিল একটি স্বস্তিজনক অধ্যায়।" এককথায় মানব মঙ্গলের দূত খলিফা দ্বিতীয় ওমর অপরের অমঙ্গল করা তো দূরের কথা কোন দিনই জীবনে কারো অমঙ্গল চিন্তাও করেন নি। তিনি যা কিছু করেছিলেন—সবই প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য, লোভ, লালসা, খ্যাতি, যশ, মান ভয়, ভীতি কোন কিছুই এই মানুষটিকে কোনদিনই নীতিচ্যুত করতে পারে নি। এই উমাইয়া কর্তৃক কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইন তাঁর আদর্শের জন্যই প্রাণ দিয়েছিলেন, আবার এই কুখ্যাত উমাইয়া ষড়যন্ত্রেই 'দাইর সীমান' নামক স্থানে দ্বিতীয় ওমরকে তাঁর বলিষ্ঠ নীতির জন্যই আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হলো। বস্তুত আদর্শ ও নীতির কোন মূল্যই ছিল না উমাইয়াদের নিকট।

অজাতশত্রু ওমর ঃ ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ ও কর্তব্যজ্ঞাননিষ্ঠ খলিফা দ্বিতীয় ওমর ন্যায় নীতির অনুসরণ করেই শাসনকর্তাদের রদবদল করেন। তিনি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, গোত্র-গোষ্ঠী সকল কিছুর উর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু দুভার্গ্যবশত তাঁর পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাগণ সকলেই স্বজন প্রীতি, গোত্র-প্রীতি ইত্যাদি দোষে দুষ্ট ছিলেন। তাই উমাইয়াগণ যখন লক্ষ্য করলেন—খলিফা দ্বিতীয় ওমরের কারও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, তখনই তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন খলিফা দ্বিতীয় ওমরের বিরুদ্ধে এই বলে যে, উমাইয়া রাজবংশের প্রতি তাঁর কোন আনুগত্য নেই। এখানে আনুগত্যের নির্ভেজাল অর্থ হল—নির্জলা পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু উমাইয়া সাধু খলিফা ওমর এর বহু উর্ধ্বে অবস্থান করতেন। তাই তিনি যেমন উমাইয়া দলভুক্ত মুদারীয় গোত্রের আদ-বিন আবতাত্‌কে বসরায়, আব্দুল হামিদ-বিন-আব্দুর রহমানকে কুফায় এবং ওমর-বিন খুবাইরকে মেসোপোটেমিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, ঠিক তেমনিভাবে হিমারীয় গোত্রের যোগ্য ব্যক্তি সামাহ-বিন মালিককে স্পেনে এবং ইসমাইল-বিন-আবদুল্লাহকে কায়রোয়ানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আবার উমাইয়া সমর্থক মুহাল্লাবের পুত্র ইয়াজিদকে সরকারি তহবিল তছরূপের দায়ে পদচ্যুতও করেন

এবং এর ফলে উমাইয়াগণ বিরক্ত বোধ করেন। এইভাবে নিরপেক্ষ দ্বিতীয় খলিফা ওমরের পক্ষপাতিত্বহীন শাসননীতি রাষ্ট্র ও প্রজাবর্গের প্রভূত কল্যাণ সাধন করলেও উমাইয়া এবং উমাইয়া দলভুক্ত মুদারীয়গণ মনেপ্রাণে সাধু ও সৎ খলিফার প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষভাব পোষণ করতে থাকেন ; শুধু তাই নয়, খলিফাকে গোপনে হত্যার জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে নিজেদের লিপ্ত করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। খলিফা ওমরের কোন শত্রু ছিল না—একমাত্র নিজের গোত্রের উমাইয়াগণ ব্যতীত—যাদের হাতে খলিফাকে প্রাণ দিতে হয়। সুতরাং ওমর নয়—নীচমনা উমাইদের ষড়যন্ত্রই ছিল উমাইদের পতনের জন্য দায়ী।

ধর্মীয় নীতিতে জয়ী ওমর ঃ উমাইয়া সাধু খলিফা ওমরের পূর্বে সকল অনারব মুসলমানকে জিজিয়া কর দিতে হত। খলিফা ওমরের দৃষ্টিতে দেশ ভেদে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকতে পারে না। সুতরাং ন্যায় বিচারের খাতিরে তিনি সকল অনারব মুসলমানদের ওপর হতে জিজিয়া কর রহিত করেন। তাঁর এই শান্তিপূর্ণ ও সাম্যবাদী ধর্মীয় নীতির ফলে উত্তর আফ্রিকা হতে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত মানুষ দলে দলে তৌহিদে (একত্ববাদ) বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলমান হতে থাকল। খলিফার এই ধর্মীয় নীতির দুটো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়—(১) দলে দলে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকলে রাজকোষ জিজিয়া কর হতে বঞ্চিত হওয়ায় অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। (২) অনেকেই ইসলামের গুণে ও মাহাত্ম্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নি, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হিট্টি বলেন—"বার্বার ও পারস্যবাসীরা ধর্মান্তরিত হলে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করতে পারবে, এই আশায় নবধর্মে দীক্ষিত হয়।" অনেকে অনেক সময় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক কিছু করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অজুহাতে কোন মহৎ ব্যক্তি তাঁর মহৎ বেদনাকে কার্যকরী রূপ দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ওমরের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত নীতির ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে এ কথা ওমরকে অবহিত করা হলে, তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আল্লাহ তাঁর রসুলকে ধর্ম প্রচারক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, কর আদায়কারী রূপে নয়।" সুযোগ সন্ধানীরাই যে শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, একথা মোটেই ঠিক নয়। বরং ইসলামের প্রথম যুগ হতেই লক্ষ্য করা যায় এমন অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ধর্মের জন্য ধন-মান-প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। সুতরাং শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধি র কারণে নয়, উমাইয়া সাধু ওমরের ধর্মীয় নীতিতে মুগ্ধ হয়েই মানুষ দলে দলে ইসলামে যোগদান করেছিলেন। কোথাও তিনি ধর্মকে চাপিয়ে দেন নি, বলপূর্বক কাউকে

ধর্মান্তরিত করেন নি। তাঁর ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার ফলে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলোর সংস্কার করা হয়। তারই সময় স্পেনে সারাগোসায় খ্রীস্টানদের জন্য একটি নতুন গীর্জাও তৈরি হয়। খলিফার ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার ফলেই রাজত্বকালে কোথাও কোন খ্রীস্টান বা ইহুদীকে রাষ্ট্রদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায় না। সুতরাং খলিফা ওমরের উদার ধর্মীয় নীতি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সামান্য ক্ষতি করলেও সমগ্র রাজ্যের অসামান্য মঙ্গল সাধন করেছিল। সুতরাং খলিফা ওমরের ধর্ম নীতি উমাইয়াদের পতনের কারণ ছিল—এ কথা আদৌ বলা যায় না।

সংগঠনে দূরদর্শী ওমর ঃ শান্তিপ্রিয় খলিফা ওমর সিংহাসনে আরোহণ করার পর সমরভিযান বন্ধ করে দেন। তিনি শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি অনুসরণ করে সমগ্র রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করেন। দেশে যতটুকু সামরিক সংগঠন প্রয়োজন ছিল, তা খুবই সুষ্ঠুভাবে হযরত ওমর সমাধা করে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ওমর সেই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন। রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে প্রথম ওয়ালিদ যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তারপর আর অধিক সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না। তাই দূরদর্শী খলিফা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি সাধনে একাগ্রভাবে মনোসংযোগ করেন। এই সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসের সুদক্ষ প্রবক্তা খোদাবক্স বলেন—"দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বের পূর্বেই প্রথম ওমর সুষ্ঠুভাবে সামরিক কার্য সমাধা করেন। এবং ওয়ালিদের সময় আরব বিজয় এমন সুবিস্তৃত হয়, যার অধিক সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতা আর সম্ভবপর ছিল না।" তিনি আরো বলেন—"পশ্চিমে পিরেনীজ এবং পূর্বে মধ্য এশিয়ার মালভূমি ইসলামের সামরিক অভিযানের স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক ছিল। এর থেকে মনে হয়—অভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য অতি উপযুক্ত সময় এসেছিল।" দ্বিতীয় ওমর সেই উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন খলিফার সম্প্রসারণ নীতি বর্জনের ফলে পরবর্তীকালে শিয়া, খারিজী, বার্বার ও মাওয়ালীদের বিদ্রোহ দমন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওমরের পরবর্তী খলিফা হিশামের সময় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয়। শুধু তাই নয়, সামরিক অভিযানেও বীরবর আব্দুর রহমান ফ্রান্সের মধ্যভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও মাত্র সামান্য ভুলের জন্য তুরসের যুদ্ধে খ্রীস্টানদের নিকট পরাজিত হন। সুতরাং খলিফা ওমরের শান্তি নীতি কোনদিক দিয়েই দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। বরং ঐ নীতির জন্য দেশে শান্তি, স্বস্তি, এবং সমৃদ্ধি এসেছিল। তাই আমীর আলী

বলেন—"সম্প্রসারণে নয়, বরং তাঁর কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত বিশাল সাম্রাজ্যের সংগঠনই ওমরের প্রধান লক্ষ্য ছিল।" কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত শক্তিকে সংগঠনেই নিয়োগ করে রাজ্য ও রাজনীতিতে যথার্থ প্রজ্ঞার পরিচয় রেখে গেছেন।

রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে ওমর ঃ রাজস্ব-ব্যবস্থার পুর্নবিন্যাসে খলিফা দ্বিতীয় ওমর এক নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন। পক্ষপাতিত্বমূলক রাজস্ব ব্যবস্থা তিনি একেবারেই রহিত করেন। এবং ইহাই ছিল ইসলামের বিধান। খলিফা সব সময়েই ইসলামের এই মূল বিধানকে সম্মুখে রেখে সকল কাজে প্রয়াসী হয়েছেন। যার ফলে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন—মহানবীর (দঃ) মূল ব্রত ইসলামের প্রচার তাঁর সমস্ত কার্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থার বিপরীত সমালোচনাও অনেকে করেছেন। স্পুলার বলেন—"দ্বিতীয় ওমরের নির্দেশনামায় সরকারি অর্থনীতির উপর অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হয়।" অনেকেই অভিযোগ করেন—দ্বিতীয় ওমরের ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত প্রবর্তিত রাজস্বনীতি রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকটকে তরান্বিত করে রাজকোষকে দেউলিয়ায় পরিণত করেছে। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়—এ সব ধারণা একেবারেই বিভ্রান্তিকর। ইসলামে জিজিয়া কর প্রবর্তিতহয়েছিল শুধু বিজিত বিধর্মীদের জন্য, তাঁদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য, তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তাঁদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান না করার জন্য। সুতরাং এই কর যে কোন মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা ছিল—গুরুতর অন্যায়। দ্বিতীয় ওমর এই অন্যায় প্রথা রহিত করেন। অর্থ সংকটের কথা চিন্তা করে তিনি সকল মুসলমানের উপর 'খারাজ' নামক কর ধার্য করেন। মুসলমানদের পক্ষে যে কোন অমুসলমানের জমি ক্রয়ও নিষিদ্ধ করেন, এ ছাড়াও মুসলমানদের 'যাকাত' নামে গরিব কর দিতে হত। এহ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সাময়িকভাবে রাজস্ব হ্রাস পেলেও রাজ্য কোনদিনই সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় নি।

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি—উমাইয়া রাজ্যের পতনের জন্য উমাইয়া সাধু খলিফা দ্বিতীয় ওমর কোনভাবেই দায়ী নন বরং তাঁরই জন্য সমগ্র উমাইয়া যুগ গৌরবের, গর্বের ও সম্মানের একটি শিখরে পৌঁছিয়েছে, একমাত্র তাঁরই রাজত্বে ইসলামের প্রচার, অভ্যন্তরীণ কলহের অবসান। গোত্রীয় ভারসাম্য, শান্তি-শৃঙ্খলা, সংহতি, সমৃদ্ধি, নিরপেক্ষ ও নিরাপত্তা সকল কিছুই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় ওমরের পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণের অর্থাৎ দ্বিতীয়

ওয়ালিদ, তৃতীয় ইয়াজিদ ও অন্যান্যদের কার্যকলাপ এক নজর লক্ষ্য করলেই যে কোন ব্যক্তির নিকটই পরিষ্কার হয়ে যাবে—উমাইয়া রাজত্বের ধ্বংসের জন্য কে বা কার দায়ী? বস্তুত মহানুভব মহামতি উমাইয়া সাধু খলিফা দ্বিতীয় ওমরের প্রবর্তিত নীতি পরবর্তীকালে অনুসৃত হলে উমাইয়াদের পতন সুদূর পরাহত হত।

উদারতার বলি ওমর ঃ দ্বিতীয় ওমর ছিলেন উমাইয়া রাজত্বের সর্বত্যাগী ঋষি রাজা। আপনি আদর্শে আচরিত আচার্য। এই সর্বত্যাগী রাজর্ষি খলিফা সকল সৎ গুণে অনুপ্রাণিত হয়ে অকুণ্ঠভাবে অনুসরণ করেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা লৌহ মানব হযরত ওমর ফারুককে। এই কারণেই এই ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিক, সরল প্রাণ খলিফাকে সকলেই খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফা বলে সম্মানিত করেন। উমাইয়া বংশের শুরু হতেই উমাইয়াগণ হাশেমীদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে থাকেন। এমন কি স্বয়ং মহানবীর (দঃ) বংশধর হযরত আলীর পরিবারবর্গের প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাযের খোৎবা (বক্তৃতা) শেষে অভিসম্পাত দেওয়া হত। মহামতি খলিফা এই জঘন্য প্রথাকে রহিত করেন। দ্বিতীয় খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেই ফিদাক নামে মদীনার একটি বাগান রসুলে আকরমের বংশধরদের প্রদান করেন। প্রথম মারওয়ান চরম লালসা বশত ঐটিকে আত্মসাৎ করেন। দ্বিতীয় ওমর ঐ উদ্যানটিকে আবার মহানবীর বংশধরদের ফিরিয়ে দিয়ে চরম উদারতার পরিচয় দিলে উমাইয়াগণ মনে মনে রুষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল খলিফার এই উদার নীতি তাদের শত্রু শিয়া খারেজী ও আববাসীয়দের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি করেছে। তাঁদের ভয় হচ্ছিল এই উদার নীতি বেশিদিন চলতে থাকলে উমাইয়া শক্তির পতন অনিবার্য। আমীর আলী বলেন—"ওমর কর্তৃক অনুসৃত সত্য ও নিরপেক্ষ বিচার উমাইয়া বংশের স্বার্থের বিরোধী ছিল। তারা বুঝতে পারল যে, উমাইয়া ক্ষমতা এবং প্রভাব দ্রুত তাদের হস্তচ্যুত হচ্ছে।" এই ভীতিই তাদের প্ররোচিত করল দ্বিতীয় ওমরকে হত্যার কাপুরুষোচিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে। এ জঘন্যতম কার্যসিদ্ধির জন্যে খলিফার আপন ভৃত্যকে প্রভূত উৎকোচের সাহায্যে তারা বশীভূত করল। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে 'দাইর সীমান' নামক স্থানে উমাইয়া বংশের সাধু খলিফা উমাইয়াগণ কর্তৃক উদারতার জন্যই শহীদ হলেন। সুতরাং উমাইয়া রাজত্বের পতনের জন্য প্রধানত তাঁদেরই অবিচার, অসাম্য, অসহিষ্ণু এবং অনুদার নীতিই দায়ী। যার শেষ পরিণতি উমাইয়া রাজত্বের পতন। সুতরাং উমাইয়াগণ যদি নিজ ষড়যন্ত্রে আপন গোত্রীয় সাধু খলিফার অসৎভাবে জীবনাবসান না করত, তাহলে এখনও ঐ বংশ আরো কত দিন রাজত্ব করত তা কে জানে। অতএব উমাইয়া

রাজত্বের পতনের জন্য দায়ী উমাইয়াদেরই অদূরদর্শিতা, অসততা, অযোগ্যতা, অনুদারতা, সংযমহীনতা ও ধৈর্যহীনতা এবং সবের উধের্ব সারা পৃথিবীর মহানুভবদের একজন খলিফা দ্বিতীয় ওমরকে জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আততায়ীর দ্বারা হত্যার মহাপাপ।

সাধু খলিফার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ মহানুভব খলিফা ওমরের সকল নীতিকেই বিসর্জন দিল। ওমরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশে দলে-দলে, গোত্রে-গোত্রে, বংশে-বংশে আবার সেই পুরানো অসন্তোষের দুন্দুভী ও দামামা বেজে উঠল, ফলে উমাইয়াদের চির শত্রু আব্বাসিয়গণ বিদ্রোহের সুবর্ণ সুযোগ পেল।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পতনকে যেমন তরান্বিত করেছিল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুকের আততায়ী কর্তৃক আকস্মিক মৃত্যু, উমাইয়া রাজত্বের পতনকেও তেমনি তরান্বিত করল উমাইয়া সাধু দ্বিতীয় ওমরের ঐ আততায়ী কর্তৃক আকস্মিক মৃত্যু। তবে দুই মহানের আকস্মিক জীবনাবসানের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। প্রথম জন মারা গেলেন—বিজাতীয় এক দাসের হাতে, কিন্তু দ্বিতীয় জন মারা গেলেন আপন জাতি ও আপন গোত্র উমাইয়াদেরই গভীর ষড়যন্ত্রে। যদি প্রথম ওমর আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন, তাহলে সমগ্র ইসলাম জাহানের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত, ঠিক অনুরূপভাবেই দ্বিতীয় ওমরও যদি এত অল্প বয়সে মারা না যেতেন, তাহলে ইসলামের ইতিহাস আবার বিশ্ব ইতিহাসকে আলোড়িত করত, প্রভাবান্বিত করত।

দ্বিতীয় ওমরের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ খলিফা ওমর-ইবন্ আব্দুল আজিজ ছিলেন বিচক্ষণ, ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ, মহানুভব ব্যক্তি। উমাইয়া রাজবংশের কলঙ্কময় ইতিহাসে তার অস্তিত্ব এক ব্যতিক্রম—যেখানে স্ব-মহিমায় তিনি ভাস্বর। মহানুভব ওমর ছিলেন ধর্মে ধীর, কর্মে বীর এবং সমাজ জীবনে চির উন্নত শির। খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্ভেজাল আদর্শ ও পবিত্র জীবন যাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওমর সর্বত্যাগী রাজর্ষির ন্যায় জীবন যাপন করে প্রমাণ করেছেন যে তিনি আল্লাহর প্রেরিত দূত মহানবীর (দঃ) খাঁটি উম্মৎ—প্রকৃত শিষ্য ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন্ত উত্তরাধিকার এবং জ্বলন্ত উত্তরসূরী। বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমক তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। মহানবীর (দঃ) আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র আরব সমাজ ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মহানবীর (দঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যে আরব সমাজ অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে এল, খোলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া খলিফাগণ আবার সেই

অন্ধকার যুগেই ফিরে যান। পুরানো দিনের পুতুল পূজা ব্যতীত অন্যান্য অনেক সামাজিক ব্যাধি আবার যেন সমগ্র আরব সমাজকে না হলেও উমাইয়া রাজ দরবারকে গ্রাস করল। মহামতি খলিফা দ্বিতীয় ওমর ছিলেন এর একমাত্র ব্যতিক্রম। তাই সমগ্র আরব সমাজ তাঁকে এক বাক্যে উমাইয়া সাধু (Umayyad Saint) এবং পঞ্চম ধর্মপ্রাণ খলিফা (The Fifth pious caliph) বলে আখ্যায়িত করেন।

উমাইয়াদের পর আব্বাসিয়গণ যখন রাজত্ব লাভ করেন, তখন প্রথম মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত অন্যান্য উমাইয়া খলিফা সকলেরই সমাধি সৌধকে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। এই সময় মুয়াবিয়ার সৌধটির কোন সংস্কার করা না হলেও দ্বিতীয় ওমরের সমাধি সৌধটির নতুনভাবে সংস্কার করা হয়।

আদর্শ ওমর ঃ ওমরের আরব জীবনী লেখকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন— খলিফা ওমর শতছিন্ন কাপড় পরিধান করে বিনা দ্বিধায় সকলের সাথে মিশতে পারতেন। মনুষ্যত্বে, মানবতায়, সততায়-সাধুতায় ও ধর্মনিষ্ঠায় যে কোন উমাইয়া খলিফা অপেক্ষা তিনি বহুগুণে শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শাসনভার গ্রহণ করা মাত্রই তাঁর নিজস্ব ৫০,০০০ টাকা থেকে মাত্র ২০০০, রেখে বাকি সব টাকা বায়তুলমালে জমা দেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রী ফাতেমা তাঁর খলিফা-পিতার নিকট হতে যে অপরিমিত স্বর্ণ ও মণি-মুক্ত পেয়েছিলেন, সেগুলিও রাজকোষে জমা দেন। তিনি বায়তুলতমালকে একেবারেই জনগণের সম্পত্তি বলে জানতেন। রাষ্ট্রীয় অশ্বশালা হতে তিনি খলিফা হিসাবে যে উত্তম অশ্বগুলো পেয়েছিলেন, সেগুলি বিক্রি করে ঐ অর্থও বায়তুলমালেই জমা দেন। সমস্ত কিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে নিজে ভরণপোষণের জন্য বায়তুলমাল হতে দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম (পঞ্চাশ পয়সার মত) গ্রহণ করতেন। একদিন খলিফা অন্ধকারে একাকী বসে আছেন, এমন সময় এক আগুন্তুক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি অন্ধকারে বসে আছেন কেন। খলিফা তাঁকে উত্তর দেন সরকারি কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই আলোটা নিভিয়ে দিয়েছেন। নিজের বসে থাকার জন্য সরকারি ব্যয়ে আলো জ্বালান ঠিক নয়। এই ছিল খলিফা ওমরের নীতি।

সংস্কারক ওমর ঃ ৭১৭ থেকে ৭২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সামান্য সময় রাজত্ব করে তিনি উমাইয়া যুগের কলঙ্ক -অনাচার-ব্যভিচার, অশান্তি-অরাজকতা, দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ সকল কিছুকে দূরীভূত করে শান্তি-শৃঙ্খলা, সংহতি-সমৃদ্ধি, ঐক্য-একতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এই কথার সমর্থনে অধ্যাপক

হিট্টি বলেন—"উমাইয়া যুগের অধর্ম এবং অনাচারের পরিপন্থী ধর্মানুরাগ ও কঠোর সংযমের জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে খ্যাতি অর্জন করেন।" দ্বিতীয় ওমর ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ প্রবক্তা ছিলেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কোরআনের প্রচার ও ইসলামের মূল লক্ষ্যকে সঞ্জীবিত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মানুষের কল্যাণে, মানুষের সেবায় তিনি ইসলামের শাশ্বত বাণীকে এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন যে দেশবাসী তাঁকে তখন 'মুজাদ্দিদ্' বা সংস্কারক ও সঞ্জীবক বলে ভূষিত করেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট হতে এইরূপ আখ্যা আর কোন উমাইয়া খলিফা লাভ করতে পারেন নি।

তাঁর চোখে সকলেই ছিল সমান। তিনি মুসলমান-অমুসলমান, কোরাইশ অকোরাইশ, আরব-অনারব, হাশেমী-উমাইয়া, খারেজী-মাওয়ালী, শিয়া-সুন্নী সকলেকেই আপন ব্যবহার দ্বারা মিত্রে পরিণত করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁকে একদিন 'অজাতশত্রু খলিফা' বলে ভূষিত করেন। আমীর আলী বলেন—"অকৃত্রিম ধর্মানুরাগ, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, অবিচলিত নীতিজ্ঞান, সহিষ্ণুতা এবং সরলতা তাঁর চরিত্রের প্রধান ভূষণ ছিল।" এই মধুর জীবন দীপটিকে যেদিন উমাইয়াগণ একান্ত ভুলবশত আততায়ীর অব্যর্থ আঘাতে নিভিয়ে দিল; সেইদিন উমাইয়া রাজত্বের গৌরবরবি অস্তমিত হল, নেমে এল—ঘনঘোর অন্ধকার, নিবিড় অমাবস্যা। একটি মাত্র মানুষের মৃত্যুতে দিগ-দিগন্ত আবার অসন্তোষের দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল—দলে-দলে, গোত্রে গোত্রে শুরু হলো লড়াই, যার শেষ পরিণতি উমাইয়া বংশের পতন।

আশীর্বাদ ওমর ঃ ওমর ছিলেন পরম ধার্মিক কিন্তু সকল ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামিকে তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন। তাঁর সময়ে খ্রীস্টান ও ইহুদীদের ধর্ম মন্দিরগুলোর সংস্কার হল। সারাগোসায় নতুন গীর্জা নির্মিত হল। গুতায় সেন্ট থমাসের গীর্জা খ্রীস্টানরা আবার ফেরৎ পেলেন। আইলা সাইপ্রাস ও নাজরান প্রভৃতি অঞ্চলের দেয় কর বহুল পরিমাণে কমে গেল। সমস্ত বিধর্মী বিজাতি খলিফাকে আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করলেন, স্বতঃস্ফুর্তভাবে উপাধি দিলেন—"উমাইয়া সাধু"। স্পুলার বলেন—"পূর্ববর্তী খলিফাদের অপরাধ প্রবণতার পরিবর্তে তাঁর ধর্ম-পরায়ণতা কোরআনের নির্দেশ মত খ্রীস্টানদের অধিকারকে সম্মান দিতে সাহায্য করে।"

উমাইয়া সূর্য ওমর ঃ দ্বিতীয় ওমর ৬৮১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ৭১৭

খ্রীস্টাব্দে ৩৭ বছর বয়সে খেলাফত গ্রহণ করেন। এবং ৭২০ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা যান। এত অল্প বয়সে ও এত কম সময়ে ইসলামের ইতিহাসে এত সুনাম অন্য কারো ভাগ্যে জুটেছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় ওমর কখনো—উমাইয়া সাধু, কখনো সংস্কারক মোজাদ্দিদ, কখনো উমাইয়া সূর্য, কখনো জাতির জনক, কখনো মানবতার সেবক, কখনো দুর্গত মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ, কখনো খোলাফায়ে রাশেদীনের একমাত্র পঞ্চম স্থানের অধিকারী। তাঁর এই সমস্ত গুণাবলী তাঁর সকল কাজে চির ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। দেশ যখন অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, অসাধুতা, অসততা, বিলাসপ্রিয়তায় ডুবে যাচ্ছিল, তখনই এসেছিলেন—যুগমানব, মহামানব, এককথায় একটি অবিস্মরণীয় ব্যতিক্রম মহানুভব মহামতি দ্বিতীয় ওমর।

উত্তম চরিত্র ওমর ঃ সুখে শান্তিতে-সমৃদ্ধিতে ও শ্রীবৃদ্ধিতে দ্বিতীয় ওমর দেশকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন। তাই মূইর বলেন—"দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বকালে কোন প্রকার চাঞ্চল্যকর (রক্তক্ষয়ী বিরাট যুদ্ধ) ঘটনা সংঘঠিত না হলেও (সেদিনের চিরাচরিত) রক্তপাত, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে স্বীয় এবং জনগণের কল্যাণার্থে আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ দ্বিতীয় ওমরের রাজত্ব ছিল—স্বস্তিকর ও শান্তিপ্রদ।"

খলিফা দ্বিতীয় ওমর এত কম বয়সে এত কম সময়ে এত বেশি যশ-মান-খ্যাতি অর্জন করে গেছেন, তার ভুবন-বিজয়ী চরিত্রের চারিত্রিক মাধুর্যের কথা শেষ করতে হয় বাঙালী কবি ও পবিত্র কোরআনের কথায় ঃ

বনের শেফালী বলে ঝরে যাই আমি
গন্ধদান সাধনায় যাপিলাম যামি।

পবিত্র কোরআনের কথায় "আমি মানুষকে উত্তম চরিত্রে সৃষ্টি করেছি।' ৯৫ ঃ ৪

মহানুভব দ্বিতীয় ওমর সেই উত্তম চরিত্রের মানুষ।

দিলেন ধরার নবী ধরা হলো ধন্য
কতই উত্তম পথ মানবের জন্য
নাহি পথ পুণ্যের, ঐ পথ ভিন্ন—
'মানুষের চরিত্রই মানুষের পুণ্য।'

দেখিতে উৎসক আমি জয়ের কারণ
তোমার সৈনিক নয় তব আচরণ।
যা দিয়ে করিবে তুমি বিশ্ববিজয়
তোমার বীরত্ব নয়, তোমার বিনয়।

যে-মানুষ মানুষ হয়েও মানবতাহীন—
সে-মানুষ মানুষ নয়, পশুত্বে বিলীন।
মহানবীর চোখে যাঁরা মহাপুণ্যবাণ
মানব-সমাজে তাঁরা সচরিত্রবান।
দেখিয়াছ ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙ্গাগড়া
দেখোনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া

—কাব্যকানন

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও খলিফা হিশাম

।। দ্বিতীয় ইয়াজিদ ।।

[৭২০—৭২৪ খ্রীস্টাব্দ] [১০১— ১০৫ হিজরী]

প্রধান ঘটনাবলী

[দ্বিতীয় ইয়াজিদের সিংহাসন আরোহণ—চরিত্র। হিশাম খেলাফতের প্রধান ঘটনাবলীঃ উমাইয়া স্বর্ণযুগের শেষ সাক্ষী—প্রশাসনিক রদবদল—বিদ্রোহ দমন ঃ ইরাক, খোরাসান—সিন্ধু-আজারবাইজান—উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা জয়—মুনুজার পরাজয়—টুরসের যুদ্ধ—ফলাফল—এর কারণ—আব্বাসীয় প্রচারের শুভক্ষণ—খালিদের পদচ্যুতি—জায়দার বিদ্রোহ—আব্বাসীয়গণের খেলাফতের দাবী—আব্বাসীয় বংশ তালিকা—চরিত্র ও কৃতিত্ব।]

সিংহাসনে আরোহণ ঃ দ্বিতীয় ইয়াজিদ আব্দুল মালিকের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। ৭২০ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ওমরের মৃত্যুর পর তিনি খলিফা পদ লাভ করেন। তিনি খেলাফত লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় ওমর কর্তৃক প্রবর্তিত নিরপেক্ষ ও উদার নীতিগুলি বিনা দ্বিধায় বাতিল করেন। এর ফল হল ভয়াবহ। আরবদের মধ্যে সেই চিরকালীন কলহ পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করল। ওমরের সুশাসনে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল—বিভিন্ন গোত্রের মানুষ পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয় ইয়াজিদের আমলে ওমর প্রবর্তিত নীতিগুলি বাতিল হওয়ায় পুনরায় রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল। গোত্রে গোত্রে কলহ আবার শুরু হল। ইতিহাস আবার পশ্চাদাভিমুখী হল। হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ ছিলেন মুদারীয় গোত্রের মানুষ। তিনি হিমারীয় গোত্রের লোকজনদের প্রতি কম অত্যাচার করেন নি। আবার সুলাইমানের সময়—হিমারীয় গোত্রের ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব মুদারীয় গোত্রের বংশধরদের প্রতিও একই রকম অত্যাচার করেছেন। মুদারীয় গোত্রভুক্ত দ্বিতীয় ইয়াজিদ সিংহাসন লাভ করলে ইয়াজিদ বিন-মুহল্লাব কারাগার হতে ইরাকে পালিয়ে যান এবং খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে আকারা বা আকরা নামক স্থানে উভয় পক্ষের খণ্ড যুদ্ধে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব পরাজিত ও নিহত হলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ভীষণ ও ভয়াবহ পরিণতি সমগ্র খেলাফতকে কাঁপিয়ে তুলল। খারিজী-শিয়া-হিমারীয়-মুদারীয় প্রভৃতি গোষ্ঠীর

বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করল আববাসিয়রা এবং তখন থেকেই উমাইয়া বংশের বিরুদ্ধে আববাসীয় প্রচারকার্য শুরু হয়। সুযোগ বুঝে আববাসীয় গুপ্তচর খোরাসানে হযরতের পিতৃব্য আববাসের বংশধরগণের খেলাফতের দাবী প্রচার করতে আরম্ভ করল।

রাজ্যের অবস্থা যখন দারুণ শোচনীয় তখন সিংহাসনে সমাসীন আছেন একজন মদ্যপ নারীসঙ্গলিপ্সু অমিতব্যয়ী উমাইয়া সন্তান ("Prodigal son of the Umayyads")। দ্বিতীয় ইয়াজিদ ছিলেন অধার্মিক স্বৈরাচারী শাসক। রাজ্যের কোন খবরই তিনি রাখতেন না। সর্বক্ষণ আমোদে মত্ত থাকতেন। অসংখ্য প্রণয়িনী গায়িকা নর্তকী সহ সব সময় ক্রীড়ারত থাকতেন। একদিন এই অবস্থায় প্রিয়তমা গায়িকা 'হাববাবা' আঙ্গুর খাওয়ার সময় গলদেশে আঙ্গুর আটকিয়ে মারা গেলে, খলিফা ইয়াজিদ জ্ঞানহারা হয়ে যান। তিনি তিন দিন প্রণয়িনীর শবদেহে কবর না দিয়ে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে গেলেন। এইভাবে শোকে-দুঃখে সপ্তম দিনে খলিফা ইয়াজিদ ৭২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রাণ হারালেন। দ্বিতীয় ওমরের সুমহান চরিত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় ইয়াজিদের কলঙ্কময় জীবনের তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে, উমাইয়াদের পতনের জন্য কে বা কারা দায়ী।

উমাইয়া রাজত্বের প্রথম দিকের খলিফাগণ অধার্মিক অবিবেচক ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক অনুদার, পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিশাল রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, দেশ ও জাতিকে শান্তি ও সমৃদ্ধির আস্বাদ দিতে পেরেছিলেন। এর মূলে তাঁদের যে গুণগুলো ছিল—তা সুশাসন, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা ও সংযম। কিন্তু পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণের মধ্যে প্রথম দিকের খলিফাদের সব দোষগুলি বর্তেছিল—কিন্তু তাঁদের গুণগুলির একটিও বিদ্যমান ছিল না। উমাইয়া বংশের পতনে তাই পরবর্তী উমাইয়াদের কার্যকলাপই দায়ী।

।। হিশাম ।।

[৭২৪—৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ] [১০৫—১২৫ হিজরী]

হিশাম-খেলাফতের প্রধান ঘটনাবলী (Main features)

১। **উমাইয়া স্বর্ণ-যুগের শেষ সাক্ষী :** ইয়াজিদ পরলোকগমন করলে আব্দুল মালিকের শেষ ও চতুর্থ পুত্র হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইয়াজিদ অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই হিশাম মহামতি দ্বিতীয় ওমরের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দরবার হতে সকল অশোভন অশালীন অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে রাজ্য ও রাজধানীতে আবার সুষ্ঠু বিধিসম্মত জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল সকল বংশ গোত্র গোষ্ঠী, এমন কি মানুষ মাত্রকেই নিরপেক্ষ নীতি দ্বারা জয় করে বন্ধুভাবাপন্ন করা। খলিফা হওয়ার পরের বছর তিনি মক্কায় হজ করতে গেলে তাকে খুৎবা (শুক্রবার জুম্মার নামাযের বক্তৃতা) পাঠ করার সময় হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের নামে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে অনুরোধ করলে, তিনি চমৎকার উত্তর দেন—"কারো নিন্দা করতে বা কাউকে অভিশাপ দিতে আসিনি, পবিত্র হজ পালন করতে এসেছি।" কিন্তু তাঁর এই সকল সৎ গুণাবলীও সাম্রাজ্যের অধোগতিকে রোধ করতে পারল না। দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময় পরিস্থিতির ভীষণ অবনতি ঘটে গিয়েছিল, তাই তাঁকে সিংহাসনে আরোহণ করেই চরম রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। তখন ঘরে-বাইরে বিদ্রোহ বিপুলাকারে দেখা দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ কলহের মধ্যে অন্যান্য দল গোত্রগোষ্ঠী সবই ছিল। সর্বোপরি আববাসীয় আন্দোলন উমাইয়া বংশের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলল। এর সঙ্গে যুক্ত হলো বিদেশী আক্রমণ—বার্বার রোমান ও ফ্রাঙ্কদের সমন্বিত বিদ্রোহ। এই সমস্ত নানা কারণে খলিফা হিশাম হিমসিম খেয়ে গেলেন। তাই হিট্টি বলেন—"উমাইয়া স্বর্ণযুগের শেষ সাক্ষী হিশাম।"

২। **প্রশাসনিক রদবদল :** হিশাম অন্তর্বিভের মুদারীয়দের পরিবর্তে ইমারীয়দের প্রাধান্য দেন। খালিদ বিন আব্দুল্লাহকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং খালিদের ভ্রাতা আসাদ-আল হোবাইরাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

৩। **ইরাকের বিদ্রোহ দমন :** হিশামের রাজত্বকালে যে কয়েকজন দীর্ঘকাল ধরে উচ্চপদে আসীন ছিলেন—খালিদ বিন-আব্দুল্লাহ আল বাসরী তাঁদের

অন্যতম। তিনি একটানা ১৫ বছর ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। নিজে হিমারীয় গোত্রের মানুষ হলেও মুদারীয় গোত্রের সঙ্গে বরাবর সদ্ভাব রেখে চলেছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী মানুষ। মুসলমান অমুসলমান সকলকেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি প্রয়োজনমত সব ধর্মের ধর্মীয় স্থানগুলোকে মেরামত করে দিতেন, এমন কি যোগ্যতানুসারে সকলকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করে রাজ্যের নানাবিধ কল্যাণ সাধিত করেন। খালিদের খ্রীস্টান মাতা একটি গীর্জা নির্মাণ করলে কিছু গোঁড়া মুসলমান বিশেষ করে বিদ্রোহী খারেজী নেতা বাহ্‌লুল্ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে বাহ্‌লুল্ পরাজিত ও নিহত হন। পরবর্তীকালে আলী-পন্থী জায়েদের বিদ্রোহও তদানীন্তন শাসনকর্তা ইউসুফ বিন ওমর দমন করলে ইরাক ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ওঠে।

৪। খোরাসানে বিদ্রোহ দমন ঃ খালিদের ভ্রাতা আসাদ খোরাসানে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এখানে হিমারীয় ও মুদারীয় গোত্রের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ বেধে ওঠে। আসাদ এই বিদ্রোহ কঠিন হস্তে দমন করেন। কিন্তু কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য তাঁকে এই পদ হারাতে হয়। খলিফা পর পর তিন জনকে—আসরাজ, জুনায়েদ ও আসীমকে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তারূপে পাঠান, কিন্তু প্রত্যেকেই ব্যর্থ হলে পুনরায় আসাদকেই শাসনকর্তারূপে পাঠান হল। বুখারা ও আক্কাস নদীর পূর্বদিকে সুগাদীয়ান অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তথাকার শাসনকর্তা সেখানকার নব মুসলমানদের জিজিয়া হতে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহ প্রশমিত হতে না হতেই যাযাবর তুর্কোমানদের অধিপতি খাকান তাদের সাহায্য করায় আগুন আবার জ্বলে উঠল। আসাদ এই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন এবং খাকান তাঁর আপন অধিনস্থ এক সর্দার কর্তৃক নিহত হন। কিন্তু বিদ্রোহের আগুন নির্মূল হওয়ার পূর্বেই অন্য একজন আরব নেতা হারিসের নেতৃত্বে আগুন আবার জ্বলে উঠল। আসাদ অত্যন্ত শক্ত হাতেই হারিসের দলবলকে দমন করেন। হাসির কোন ক্রমে বিধর্মী তুর্কীদের আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচান। পরে আসাদ বাল্‌খে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং অল্পকাল পরেই মারা যান।

আসাদের পর নাসর-ইবন-সাইয়ার খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি রাজধানী বাল্‌খ হতে সার্ভেতে স্থানান্তরিত করেন। নাসরের বিচক্ষণতায় অক্ষুনদীর পূর্বপ্রান্তে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। অন্যদিকে খাকানের মৃত্যুতে বিদ্রোহী তুর্কোমানগণ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লে ঐ অঞ্চলে শান্তি-

শৃঙ্খলার কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে পড়ে। বিচক্ষণ নাসর বিদ্রোহী সুগদিয়ানদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহারে তাঁদেরকে শত্রু হতে মিত্রকে পরিণত করেন। এইভাবে নাসরের সময় তুর্কোমান ও সুগাদিয়ানদের বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। নাসরের বিচক্ষণ কুটনীতির ফলেই এটা সম্ভব হয়। অন্যদিক অনারব মুসলমানগণ জিজিয়া ও খারাজ সম্পর্কিত ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। দূরদর্শী নাসর-এরও একটা সম্মানজনক সমাধান বের করে সকল অনারব মুসলমানদেরই প্রশংসাভাজন হন। এ ব্যাপারে নাসরের কৃতকার্যতা উল্লেখযোগ্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের মুলে ছিল নাসরেরই অবসান।

৫। সিন্ধু বিদ্রোহ দমন ঃ পাক-ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে জুনায়দ নামক শাসনকর্তার দুর্ব্যবহারে স্থানীয় হিন্দুগণ অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে জুনায়দ পদচ্যুত হন, এবং নতুন শাসনকর্তার অধীনে সিন্ধু তীরে মাহফুজা ও মনসুরা নামক দুটো দুর্গ নির্মাণ করা হয়, যার ফলে এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয় ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ মুসলমান অধিকারে আসে।

৬। আজারবাইজান (খাজার) বিদ্রোহ দমন ঃ এশিয়া মাইনরে অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দিলে খলিফার দুই পুত্র মুয়াবিয়া ও সুলাইমান বাইজানটাইনদের সাথে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। এই যুদ্ধে আল বাত্তাল নামক একজন বীর সেনানী বিশেষ কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ চালনা করে ৭৪০ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন।

এই সময় আর্মেনিয়ায় ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরে খাজার উপজাতি অত্যন্ত অশান্তি আরম্ভ করে। এমনকি তারা ৭৩১ খ্রীস্টাব্দে অতর্কিতে ইরাক ও মসুল আক্রমণ করে তথাকার উমাইয়া শাসনকর্তাকে নিহত করে। খলিফা এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত ও রুষ্ট হয়ে প্রথম পর্যায়ে আল হাবসীকে বিদ্রোহ দমনে পাঠান, খলিফা ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে আপন ভ্রাতা মাসলামা ও পিতৃব্য পুত্র দ্বিতীয় মারওয়ানকে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। মাসলামা ও মারওয়ান খাজারদের একেবারেই পর্যুদস্ত করেন। এইভাবে খাজার বিদ্রোহও প্রশমিত হল।

৭। উত্তর আফ্রিকার বিদ্রোহ দমন ঃ আফ্রিকার নব মুসলমান ও সোকরিয়া নামক গোঁড়া খারিজী সম্প্রদায় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করে খলিফার সেনাবাহিনীকে বার বার পর্যুদস্ত করতে থাকে এবং বার্বারদের সাথে মিলিত হয়ে তাঞ্জিয়ারের শাসনকর্তাকে নিহত করে কায়রোওয়ান দখল করে এবং এই যুদ্ধে বহু আরব সম্ভ্রান্ত অশ্বারোহীকে নিহত

করে। যার জন্য এই যুদ্ধকে সম্ভ্রান্তদের যুদ্ধ (Battle of the Nobles) নামে অভিহিত করা হয়। খলিফা হিশাম এই কঠিন বিদ্রোহকে কঠোর হাতে দমন করার জন্য সেনাপতি কুলছুম-বিন-আরাবকে প্রেরণ করেন কিন্তু সেনাপতি কুলছুম আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও পরাজিত এবং নিহত হন। অতঃপর খলিফা ৭৪২ খ্রীস্টাব্দে হান-জালা-বিন সাফওয়ানকে ঐ বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। সেনাপতি হানজালা এই কঠিন বিদ্রোহ দমনে চরম বীরত্বের পরিচয় দেন। ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে এই বার্বার বিদ্রোহ সমূলে বিনষ্ট হয়। এই ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমীর আলীও বলেছেন—"ইসলামের ইতিহাসে এমন একটা সঙ্কট যা কখনও ভুলতে পারা যায় না।"

স্পেন ও ফ্রান্সের ঘটনাবলী।। দক্ষিণ-ফ্রান্স জয় ঃ খলিফা হিশাম ঘরে-বাইরে বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, অভ্যন্তরীণ, ইরাক-সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহ দমন করে খলিফা আফ্রিকার দিকে মনোসংযোগ করেন। আফ্রিকার পরই স্পেন ও ফ্রান্সের ঘটনাবলী এসে পড়ে। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সময় সেনাপতি আস্ সামাহ্ খ্রীস্টান ডিউকের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। সেনাপতি আব্দুর রহমান আল্-গাফিকী ৭১২ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের শাসনভার গ্রহণ করেন। কয়েক মাস পরে আনবাসাহ তথাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সময়কার মুসলিম বিপর্যয়ের গ্লানি মোচনের এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিয়েই সেনাপতি আনবাসাহ পিরেনীজ অতিক্রম করে যে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে বিরল। একমাত্র তাঁরই বীরত্বে মুসলিম বাহিনী দুর্বার গতিতে অভিযান ও আক্রমণ চালিয়ে বিখ্যাত কারকোসেনা ও নিমিজ সহ সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স অধিকার করেন। সেদিনের মুসলিম বিপর্যয়ের শোচনীয় গ্লানি আজ সেনাপতি আনবাসার দ্বারা গর্ব ও চরম গৌরবে পরিণত হল। কিছুদিনের মধ্যেই আনবাসার মৃত্যু হোলে ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় আব্দুর রহমানকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

৮। মুনুজার বিদ্রোহ ও পরাজয় ঃ এই সময় পিরেনীজ পর্বতের অপরদিকে কার্ডোনের বার্বার শাসনকর্তা ওসমান বিন-আবুনিসা খ্রীস্টানদের সহায়তায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ওসমান-বিন-আবুনিসা (মুনুজা) নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য একুইটেনের ডিউক ইউডিজের পরমাসুন্দরী কন্যা লাম্পেজীকে বিবাহ করেন। পরে জামাতা ও শ্বশুর একত্রে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হন। কিন্তু মুনুজা এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

৯। টুরসের যুদ্ধঃ মুনুজা যুদ্ধে পরাজিত ও প্রাণ হারালে একুইটনের ডিউক ইউডিজ অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হন। তিনি নিজেও শঙ্কিত হয়ে ফরাসী সম্রাট চার্লস মার্টেলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিচক্ষণ সম্রাট মুসলিম বাহিনীকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে দেওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে না করে সকলেই সম্মিলিতভাবে মুসলিম বাহিনীকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের কথা সেনাপতি আব্দুর রহমানের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। সেনাপতি আব্দুর রহমানের এই হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তকে সেনাবাহিনী সাদরে গ্রহণ করতে না পেরে খলিফাকে জ্ঞাত করার এবং অধিকতর সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করতে সেনাপতিকে আবেদন করেন। কিন্তু সেনাপতি আব্দুর রহমান ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর বিবেচনামূলক কথাকে অগ্রাহ্য করে আপন বিপদই ডেকে আনেন। ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে টরস্ ও পয়েটিয়ার্সের মধ্যবর্তী স্থলে আব্দুর রহমান সম্রাট চার্লস মার্টেলের বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধের অষ্টম দিনে সম্মুখ সমরে পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধে তাঁর বহু সেনাও প্রাণ হারায়, তাই টুরসের যুদ্ধকে আরব ঐতিহাসিকগণ 'বালাতুশ শুহাদা' অর্থাৎ শহীদদের মঞ্চ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা এখানে একটি সুন্দর জিনিস লক্ষ্য করছি। মানুষ অনেক সময় প্রেমে ও পরিণয়ে পড়ে সব কিছুই বিসর্জন দেয়। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করছি—মুনুজা লাম্পেজীকে বিবাহ করছেন—কেবলমাত্র শক্তি আহরণ করে মুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য। ডিউকও তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকে দান করলেন---একমাত্র ঐ একই উদ্দেশ্যে। কন্যাও ঐ একই উদ্দেশ্যেই পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে ডিউকের প্রথম প্রস্তাব চার্লস প্রত্যাখ্যান করলে লাম্পেজী নিজে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেন। সম্রাটের শর্ত ছিল—যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাই হোক—লাম্পেজীকে তিনি পত্নীরূপে পেতে চান। পরমাসুন্দরী লাম্পেজী ঐ শর্তেই রাজী হন। । এখানে লাম্পেজী ছিলেন একেবারেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য দেহ ও মন এক সাথেই দান করেছিলেন। এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করলো মুসলিম সেনাপতি আব্দুর রহমানের চরম হঠকারিতা। মুনুজা ব্যর্থ হলেও লাম্পেজী সফল হলেন।

"কোন কালে একা করোনিক জয় পুরুষের তরবারি
শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

—নজরুল ইসলাম।

ফলাফল ঃ

টুরসের যুদ্ধকে সকল ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এক বাক্যে একটি যুগসন্ধিকারী বা চূড়ান্ত যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনা মতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে পনেরটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে, টুরসের যুদ্ধ তাদের অন্যতম। কেননা ঐ যুদ্ধে চার্লস পরাজিত হলে সমগ্র ইউরোপ ভূমি মুসলমানদের পদানত হত এবং মুসলিম সংস্কৃতির প্রবর্তন ঘটত। তাই মুইর বলেন—'ফরাসী দেশ ও খ্রীস্টান জগতের ভাগ্য এই দিনটির ফলাফলের উপর নির্ভর করছিল। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন এই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য সেনাপতি আব্দুর রহমানের হঠকারিতা ও অদূরদর্শিতাই দায়ী। কেননা, তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর মনের গতি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন নি। প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনী শক্তির দিক থেকে, সংখ্যার দিক থেকে, ও মনের দিক থেকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঐ সময় ওখানে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীর মানসিকতাও ছিল না। এই সমস্ত নানা কারণে আরব ঐতিহাসিকগণ সেনাপতি আব্দুর রহমানকেই মুসলমান বাহিনীর পরাজয়ের জন্যে দায়ী করেন।

আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর খলিফা আব্দুল মালিককে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তারই সময়ে এভিগণন বিজিত হয়। পরে উকবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। উকবা মুসলমানদের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফলতা লাভ করতে পারেন নি। ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনী তার অপরিমিত মনের বল হারিয়ে ফেলল।

মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের কারণ ঃ ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথমদিকে মুসলিম বাহিনী ছিল অপরাজিত—সেদিন মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনার কাছে পরাজিত হয়েছে অপর পক্ষের বিশাল বাহিনী। কিন্তু আজ মুসলিম বাহিনী যেন এক দেহে, এক মনে, এক প্রাণে লড়তে পারছে না। আজ তাঁদের সেই ঈমানের বিশ্ববিজয়ী তেজ আর নেই, মনের বল নেই। কোথায় যেন বিশ্ব-জোয়ারের, বিশ্ব-জয়ের পতন হয়েছে। এর জন্য দায়ী কিন্তু সেনাবাহিনী নয়, মুসলিম খলিফাগণের অদূরর্শিতা, অপরিণামদর্শিতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, এককথায় —আল্লাহর প্রতি, রসুলের প্রতি, ইসলামের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা অজেয় মুসলিম সেনাবাহিনীকে আজ এই পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুকের সময় মুসলিম বাহিনীর জয়ের পশ্চাতে ছিল—ঈমানের বল যা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, দুর্জয়কে জয় করেছে, পরকে আপন করেছে; অন্যায় অবিচার অত্যাচারকে প্রতিরোধ করেছে,

মজলুমকে রক্ষা করেছে, জালেমকে হত্যা করেছে, জুলুমকে বন্ধ করেছে। ফলে জগৎ মুগ্ধ হয়েছে, বিশ্ব বিস্ময় বোধ করেছে, বৈরী বন্ধু হয়েছে, শত্রু মিত্র হয়েছে। বিপুল বিজয় পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ আর হযরত আবুবকরের সাবধান বাণী 'জগতের হিতার্থে তোমাদের আগমন' সেনাবাহিনীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না। আজ আর হযরত ওমরের সতর্কবাণী—'জুলুম হতে দূরে থাকবে'— সেনাবাহিনীর হৃদয়কে প্রকম্পিত করে তোলে না। আজ তারা যেন নামে মাত্র মুসলিম সেনাবাহিনী, কিন্তু ঈমানের দুর্বলতায় জর্জরিত। ইসলামের শিক্ষা—সত্য থেকে এবং ঈমানের পথ থেকে স্খলিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে অনিবার্য ধবংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া। উমাইয়া খলিফাগণ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন—সুতরাং তাঁদের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর অবক্ষয় ছিল অনিবার্য।

১০। আব্বাসীয় প্রচারের শুভক্ষণ ঃ খালিদের পদচ্যুতি ঃ আব্বাসীয়গণ কিভাবে ধীরে ধীরে উমাইয়াগণের বিরুদ্ধে প্রচারের সুযোগ পেলেন। মানুষের দুঃসময় তারই নাম, যখন কোন দুর্বুদ্ধি তাকে ঘিরে ধরে। ইরাকের শাসনকর্তা খালিদ খুবই ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সুশাসনে সকলেই মুগ্ধ। পনের বছর যাবৎ তিনি ইরাকের শাসন ব্যবস্থায় একটি স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে একদিন দ্বিতীয় হেজাজের শাসনকর্তা রূপে এতই সুনাম অর্জন করেছিলেন যে, তদানীন্তন ইরাকের শাসনকর্তা নিষ্ঠুর হাজ্জাজ সেটাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে না পেরে খলিফা ওয়ালিদের মনকে এরূপই বিষাক্ত করে তুলেছিলেন—যাতে শেষাবধি নিরপরাধ মহামতি দ্বিতীয় ওমরের পদচ্যুতি হয়। ঠিক অনুরূপভাবেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ইরাকের শাসনকর্তা সুযোগ্য খালিদের নাম-যশ-খ্যাতি সকল কিছুই খলিফা হিশামের একান্ত পরিষদ ইউসুফের চরম গাত্রদাহের কারণ হয়ে ওঠায় নিষ্ঠুর ইউসুফ খালিদের বিরুদ্ধে নানা সত্য-মিথ্যা অভিযোগের দ্বারা খলিফার মনকে একেবারেই বিষিয়ে তুললে খলিফা ৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে খালিদের ১৫ বছরের প্রশংসনীয় শাসনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাঁকে বিনা বিবেচনায় পদচ্যুত করে নিষ্ঠুর ইউসুফকে ইরাকের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন খলিফার এই অতি গরহিত ও নিন্দনীয় কাজে সমগ্র ইরাকবাসী অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হন।

১১। জায়দার বিদ্রোহ ঃ ইউসুফের নিষ্ঠুর ব্যবহারে ইরাকবাসী একেবারেই উত্যক্ত হয়ে উঠলে হোসাইনের পৌত্র জায়দ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

কুফাবাসীরা তাঁকে দলে দলে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিজেদের চিরাচরিত স্বভাবানুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চাদপদ হলে জায়দ ৭৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রাণ হারান। কতিপয় সহচর তাঁকে সমাধিস্থ করলে নিষ্ঠুর ইউসুফ সাথে সাথে সমস্ত জনমত ও ইসলাম ধর্মের সমস্ত বিধি বিধানকে একেবারেই উপেক্ষা করে ও অসম্মান দেখিয়ে তাঁর লাশকে (মৃতদেহকে) কবর হতে তুলে মস্তককে দেহ হতে বিছিন্ন করে সেই বিদেহী মস্তক খলিফা হিশামের নিকট প্রেরণ করে খলিফার অধিকতর প্রিয়জন হওয়ার প্রচেষ্টা করেন। এই অমানুষিক কাজের ফলে আববাসীয়গণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচারে প্রচুর সুযোগ লাভ করেন এবং এই সুবর্ণ সুযোগকে যথাযথভাবে কাজেও লাগান। ইউসুফের এই কাজ উমাইয়াদের নিকট অশুভের বার্তাবহ হলেও আববাসীয়দের পক্ষে ছিল শুভ। খেলাফৎ লাভের সোপানস্বরূপ।

১২। আব্বাসীয়গণের খেলাফতের দাবী ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চাচা বা পিতৃব্য ছিলেন হযরত আববাস। আববাসের চার পুত্র ছিল। তার মধ্যে আব্দুল্লাহ-ইবন-আববাস হাদিসবিদ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। আব্দুল্লাহ হযরত আলীর অত্যন্ত অনুরক্ত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কারবালা মরু প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের শোচনীয়ভাবে শাহদৎ বরণের পর তিনি শোকে-দুঃখে ৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। আব্দুল্লার পুত্র আলীও হযরত আলীর বংশধরদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে আলীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ আববাসীয়গণের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। মহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। আববাসীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম খেলাফত লাভের ইচ্ছা ও আশা পোষণ করেন। তিনি তাঁর ইচ্ছা ও আশাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার জন্য একটি কৌশল আবিষ্কার করেন। এই মতবাদটিকে সবার মধ্যে প্রচারও করতে থাকেন। তাঁর মতবাদটি ছিল—হযরত হোসাইনের কারবালা প্রান্তরে শহীদ হওয়ার পর মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ইমাম হোসাইনের পুত্র আলীর (অর্থাৎ জয়নুল আবেদীনের) উপর না বর্তিয়ে মহম্মদ ইবনুল-আল্-হানাফিয়ার উপর বর্তিয়েছে। মহম্মদ ইবনুল-আল্-হানাফিয়া ছিলেন হযরত আলীর (কঃ) হানিফ বংশজাত স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সন্তান। এখানে মহানবী (দঃ)-এর কন্যা বিবি ফাতেমার সাথে কোন যোগ নেই বা থাকল না। এই হানাফিয়ার পুত্র মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব পান তাঁর পুত্র আবুল হাশিম। এবং এই আবুল হাশিম পরবর্তীকালে তার নেতৃত্ব প্রদান করেন—(আববাসীয় বংশের আব্দুল্লার পুত্র আলী, এবং আলীর পুত্র)

মহম্মদকে। আব্বাসীয়গণ নেতৃত্বের এই ধারা বিশ্বাস করলেন এবং গোপনে কোথাও বা প্রকাশ্যে মহম্মদের জন্য প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। একমাত্র হযরত আলীর বংশধর ও অনুরক্ত এবং ভক্তগণের যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাঁদেরকে সব সময় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে এই বলে প্রচার চালাতেন যে, তাঁরা নবী বংশের খেলাফতের দাবীকে অগ্রাহ্য করেছে। এইভাবে আব্বাসীয়গণ তাঁদের সহানুভূতি লাভ করেন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে। ৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে মহম্মদ তাঁর তিন পুত্র ইব্রাহিম, আবুল আব্বাস ও আবু জাফরকে যথাক্রমে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। এইভাবে হযরত আলীর বংশ খেলাফত হতে বঞ্চিত হল।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

বিপদে দক্ষ খলিফা ঃ ৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে খলিফা হিশাম পরলোক গমন করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ খলিফা হিশামকে মুয়াবিয়া ও আব্দুল মালিকের পর উমাইয়া বংশের তৃতীয় এবং সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ উমাইয়া খলিফা বলে অভিহিত করেন। তিনি যেমন রাজ্যের অভ্যান্তরীণ নানা গোলযোগকে অত্যন্ত দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে মোকাবিলা করে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন, তেমনি বহিঃশত্রু তুর্কী, খারিজী বার্বার, রোমান ও খারিজীদের বিদ্রোহ দমন করে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই উমাইয়া বংশের অধঃপতনকে সাময়িকভাবে রোধ করতে সক্ষম হন। এই কারণেই তাঁকে উমাইয়া খেলাফতের তৃতীয় স্থানের সম্মান দান করা হয়েছে। যদি তিনি অত্যন্ত শক্ত হাতে খেলাফতের তরীর হাল ধরতে না পারতেন, তা হলে ঘরে-বাইরের ঐ প্রবল ঝটিকা হতে খেলাফতের বিপদাপন্ন তরীকে বিপদশূন্য তীরে ভেড়াতে পারতেন না। দীর্ঘ ২০ বছরের রাজত্বে এটা তাঁর চরিত্রের এক অপূর্ব কৃতিত্ব।

রাজ্যজয়ী খলিফা ঃ মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর রাজত্বের বিশাল বিস্তৃতিও রক্ষা করে গেছেন। তাঁর রাজত্বে আমরা লক্ষ্য করি—বহু দ্বীপে মুসলিম পতাকা উড্ডীয়মান,—মেজরকা, মিনরকা, ইভিকা, করসিকা, সারডিনা, ক্রীট, রোডস্ এবং সাইপ্রাস ইত্যাদি। সমগ্র স্পেন হতে দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত ইসলামের পতাকা শোভা বর্ধন করেছে। আফ্রিকায় জিব্রাল্টার প্রণালী হতে সুয়েজ পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল খলিফার শাসনাধীনে। এশিয়ার সিনার মরুভূমি হতে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত খলিফার আজ্ঞাবহ ছিল। এইভাবে পৃথিবীর তিন বিশাল মহাদেশ—এশিয়া-ইউরোপ ও আফ্রিকায় তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ছাপ রেখে গেছেন।

ধর্ম-প্রাণ খলিফা ঃ খলিফা কোনদিন এমন কোন কাজ করেন নি, যা ইসলাম ধর্মকে সরাসরি অসম্মান বা আঘাত করে। এই দিক দিয়ে তিনি ধর্মপরায়ণও ছিলেন। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তির কোন সীমা ছিল না। যার জন্য সমগ্র রাজত্বে জুম্মার নামাযে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বংশধর হযরত আলীর বংশের প্রতি অভিসম্পাত করাকে একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমগ্র মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধার ও সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। বিচক্ষণ খলিফা বিদ্বেষপরায়ণ উমাইয়াদের এককথায় পবিত্র কোরআন হতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত)-গণ নবীর (আল্লাহ্‌র দূত মহম্মদ (দঃ) প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, সেখানে তোমরা মুসলমান হয়ে কোন্ জ্ঞানে তাঁর বংশধরদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে। "নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, হে বিশ্বাগিগণ (আস্তিক), তোমরাও নবীর জন্য আশীর্বাদ কর, এবং তাঁকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর।" কোরআন ঃ ৩৩ ঃ ৫৬। ধর্ম-প্রাণ খলিফার এই নির্দেশ সকলেই আবার মাথা পেতে মেনে নিলেন। দ্বিতীয় ওমরের খেলাফতের ন্যায় আবার ঐ জঘন্য প্রথা রহিত হল।

বিদ্যানুরাগী খলিফা ঃ খলিফা হিশাম শুধু একজন রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি ধর্মপরায়ণ, বিদ্যানুরাগী এবং শিল্পানুরাগীও ছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী সেলিম শুধু বড় যোদ্ধাই ছিলেন না, ছিলেন বিরাট ভাষাবিদ পণ্ডিতও। জগতের বহু ভাষা তিনি আয়ত্বে এনেছিলেন। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র জাবালা গ্রীক, পারস্য, হিব্রু ও ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা হতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। খলিফা নিজে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি একজন বাদশাহ্ হয়েও বলতে পেরেছিলেন—"মানুষ উন্নতি করবে শুধু রাজ্য জয়েই নয়, বরং জ্ঞানের চর্চায়।" খলিফার শিশু-সাহিত্যে যে অবদান, তা অসামান্য। খলিফা যথার্থই গুণীর ও গুণের কদর করতে জানতেন।

কৃষক দরদী খলিফা ঃ খলিফা রাজ্যের কৃষকবর্গের অবস্থার প্রতিও তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন যাতে তাদের ওপর অত্যধিক কর চাপানো না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। অধিকন্তু কৃষককুল যাতে সহজে কৃষিক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে, তার জন্য খলিফা বহু খাল খনন করান। কৃষি ব্যবস্থাকে তিনি তাঁর রাজ্যের একটি বিশেষ বিভাগে পরিণত করে খাদ্য শস্যের অভাব মোচন করেন। কৃষকদের দাবী, অভিযোগ, ও নানা প্রয়োজনের কথা খলিফা

নিজেই শ্রবণ করতেন, যাতে তারা কষ্ট না পায়, যাতে দেশ খাদ্যাভাবে না পড়ে। খলিফা তাঁর প্রশাসনকে সাবধান ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—মহানবীর এক সকর্তবাণী দ্বারা—"মানুষের প্রথম প্রয়োজন খাদ্য, দ্বিতীয় প্রয়োজন বস্ত্র, তৃতীয় প্রয়োজন বাসস্থান এবং পরে জ্ঞানর্চ্চা।"

শিল্পানুরাগী খলিফা ঃ স্থাপত্য শিল্পেও খলিফার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর সময়-অসংখ্য মসজিদ, অট্টালিকা, রাজপ্রসাদ ও নানা রকমের সুশোভিত উদ্যান নির্মিত হয়। প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি তাঁর রাজ্যে অসংখ্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করেন। পথিপার্শ্বে পথিকদের সুবিধার জন্য বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন করেন। আজও খলিফার স্থাপত্য-শিল্পের গৌরবময় নিদর্শন বহন করেছে তাঁর—খিরবত-আল্-মাকজার প্রাসাদ। যা স্নানাগার-বাসগৃহ ও মসজেদ সম্বলিত একটি উত্তম প্রত্নতাত্ত্বিক স্বাক্ষর বহনকারী স্থাপত্য শিল্পের দৃষ্টি আকর্ষণী উজ্জ্বল নিদর্শন। খলিফা হিশাম জীবনে বহু কিছুর মধ্য দিয়ে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সমর-বিশেষজ্ঞ, সংগঠক ও সংস্কারের খ্যাতি অর্জন করে গেছেন।

সুযোগ্য উমাইয়া খলিফা ঃ আমীর আলী বলেন—"তিনি সহজেই মিথ্যা সংবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সন্দেহের বসে অনেককেই হত্যা করেন।" কিন্তু আমাদের মতে একথা খুব নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা তাঁর শক্তিশালী গুপ্তচরবৃন্দ থাকতে তিনি সব সময় মিথ্যা কথায় প্রভাবান্বিত হবেন কেন। কেউ কেউ বলেন তিনি বিলাসী ছিলেন। প্রবাদ আছে, হজ পালনের সময় ৬০০ উষ্ট্র নাকি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ বহন করত। ক্রোমার-এর মতে "খলিফা হিশাম ছিলেন--সুযোগ্য উমাইয়া নৃপতিদের অন্যতম।"

অষ্টম অধ্যায়

দ্বিতীয় ওয়ালিদ ● তৃতীয় ইয়াজীদ ● ইব্রাহীম ● দ্বিতীয় মারওয়ান

।। দ্বিতীয় ওয়ালিদ ।।

[৭৪৩-৪৪ (খ্রীঃ)]

সিংহাসনারোহণ ঃ

নানা অসামাজিক কাজের জন্য খলিফা হিশাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদকে রাজ দরবার হতে বহিষ্কৃত করে দেন। কিন্তু হিশামের মৃত্যুর পর তিনিই দামস্কের সিংহাসনে আরোহণ করে বিগত খলিফা হিশামের আত্মীয় স্বজন গুণগ্রাহী সকলকে কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন করেন। এই দুরাচার দ্বিতীয় ওয়ালিদের নির্দেশেই নিষ্ঠুর ইউসুফ নিরাপরাধ গুণীব্যক্তি খালিদকে হত্যা করেন। এবং জায়দ বিন-আলীর পুত্র ইয়াহইয়াকেও এইভাবেই হত্যা করা হয়। তাঁর চরিত্রের নানাবিধ কুকাজগুলোই তাঁকে দেশবাসীর নিকট অপ্রিয় করে তোলে। অবশেষে দেশবাসী তাঁর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম ওয়ালিদের পুত্র তৃতীয় ইয়াজীদের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এইভাবে জনগণ কর্তৃক দ্বিতীয় ওয়ালিদ একটি দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ হারান। বিদ্রোহীগণ তৃতীয় ইয়াজীদকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।

।। তৃতীয় ইয়াজীদ ।।

[৭৪৪ (খ্রীঃ)]

তৃতীয় ইয়াজীদ ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সদিচ্ছার কোনরূপ অভাব ছিল না। তিনি কয়েকটি কাজ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন,—(১) বিদ্রোহ দমন, (২) জনসাধারণের করভার লাঘব, (৩) অসাধু কর্মচারীবৃন্দের অপসারণ ইত্যাদি। কিন্তু পরিস্থিতি এমন জটিলরূপ ধারণ করেছিল যে, কোন কিছু করা আর সম্ভব ছিল না। তিনি সৈনিকদের বেতন হ্রাস করেন বলে তাঁকে 'আন-নাকিস' মিতব্যয়ী ইয়াজীদ আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর শাসনকাল মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল।

।। ইব্রাহীম ।।

[৭৪৪ (খ্রীঃ)]

ইয়াজীদের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মাত্র দুই মাস দশ দিন রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মারওয়ানের নিকট আইন-আল-জাবের যুদ্ধে ইব্রাহীম পরাজিত হন। অতঃপর প্রথম মারওয়ানের পৌত্র দ্বিতীয় মারওয়ান খলিফা হন। ইনিই শেষ উমাইয়া খলিফা।

।। দ্বিতীয় মারওয়ান ।।

[৭৪৪-৭৫০ (খ্রীঃ)]

প্রধান ঘটনাবলী

[সিংহাসনে আরোহণ—খারিজী বিদ্রোহ—মাওয়ালী বিদ্রোহ—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ—আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রথম ব্যক্তি—আব্বাসীয় শক্তির মূল উৎস—আব্বাসীয় প্রচার পদ্ধতি—আবু মুসলিমের আবির্ভাব—মার্ভ ও খোরাসানের পতন—ইব্রাহীমের প্রাণদণ্ড—ইরাক অধিকৃত—কুফা দখল—ইরান হস্তচ্যুত—আবুল আব্বাস খলিফা নির্বাচিত—জাবের যুদ্ধ—মারওয়ান নিহত—চরিত্র—কৃতিত্ব ও পরাজয়ের কারণ—আবু মুসলিমের অবদান]

সিংহাসনে আরোহণ ঃ ৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে দ্বিতীয় মারওয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সারা রাজ্যে অসন্তোষ, বিদ্রোহ, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ, অশান্তি-অরাজকতা প্রভৃতি যখন রাজ্যকে একেবারেই গ্রাস করতে বসেছে, তখন মারওয়ান নতুন ভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য রাজধানী দামেস্ক হতে হাররানে স্থানান্তরিত করেন। রাজ্যের কোথাও আপন গোত্রকলহ, কোথাও খারিজী বিদ্রোহ, কোথাও মাওয়ালী বিদ্রোহ, কোথাও বা আব্বাসীয়গণের গণ-আন্দোলন, সবকিছু এক যোগে উমাইয়া রাজত্বের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। বলিষ্ঠ মারওয়ান একের পর এক বিদ্রোহ দমনে যথারীতি দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন, যার ফলে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের বিদ্রোহ নির্মূল হয়, যদিও পরবর্তীকালে ইহা আবার মারাত্মক গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করে। কুফায় ইবন মুয়াবিয়া এবং হিমস বালাবেক-দামেস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে খারিজী নেতা আজ্জাহক প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মারওয়ান সেখানেও অতি শক্ত হাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তবুও খারিজীগণ প্যালেস্টাইন দখল করে সমগ্র রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি করেন, একদিন যে আগুনে উমাইয়া শক্তি চিরতরে পুড়ে ছাই হল।

খারিজী বিদ্রোহ ঃ যখন হিমস ও প্যালেস্টাইনে প্রচণ্ড বিদ্রোহ, ঠিক একই সময় খারিজীগণ তীব্র বিরোধীতাসহ সমগ্র ইয়ামন, হিজাজ ও ইরাকে নিজেদের পতাকা উত্তোলন করে খলিফার শাসনের অবসান ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমনে মারওয়ান অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। হিমস ও প্যালেস্টাইনে বিদ্রোহ দমন করে তিনি ইরাকে খারিজীদের সাথে যুদ্ধ করে সকলকে দজলা নদীর অপর পারে বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে অন্য একদল খারিজী হিজাজ ও ইয়ামেনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদীনা দখল করেন। হিজাজের শাসনকর্তা

কঠোর হস্তে ঐ খারিজী বিদ্রোহ দমন করে মদীনাকে মুক্ত করেন। তখন খারিজীগণ হিজাজ ও ইয়ামন হতে হাজরামাউতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং ইরাকের পরাজিত খারিজীগণ পারস্যে আত্মগোপন করেন।

মাওয়ালী বিদ্রোহ ঃ খোরাসানের শাসনকর্তা নাসর ছিলেন মুদারীয় বংশের মানুষ। হিম্যারীয়গণ তাঁর আচরণে রুষ্ট হয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহকে শক্তি জোগাল অনারব মুসলমানদের অর্থাৎ মাওয়ালীদের অসন্তোষ। উমাইয়া শাসনে একমাত্র দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সকলেরই সময়ে অনারব মুসলমানগণ রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপে গণ্য হতো। সকল প্রকারের সুযোগ-সুবিধা একমাত্র আরব মুসলমানদের জন্যই একচেটিয়া ছিল। কিন্তু ইসলামে কোন প্রকারের বর্ণ-বৈষম্য নেই। যদিও উমাইয়া খলিফাগণ এর চরম বিরোধিতা করেছেন। ইসলাম শুধু মুসলমান নয়, মানুষ মাত্রকেই এক নজরে দেখেছে। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (দঃ) কোন দিনই মানুষে মানুষে কোন ব্যবধানই মেনে নেন নি। তাঁর ব্রতের প্রধান লক্ষ্যই ছিল—মানুষে মানুষে কোন নীতিগত ব্যবধান থাকবে না। সকলেই আপন যোগ্যতানুসারে মর্যাদা পাবে, সেখানে বংশগোত্র বা সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ মুল্য ইসলাম দেয় নি। কিন্তু উমাইয়া খলিফাগণ ইসলামের এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে উপেক্ষা করে আরব মুসলমান ও অনারব মুসলমানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান তুলে ধরেন। আরব মুসলমান যে কোন অনারব মুসলমান-রমণীর পাণিগ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু অনারব মুসলমান কোন আরব মুসলমান-রমণীর পাণিগ্রহণ করতে পারতেন না। আরব মুসলমান অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু কোন অনারব মুসলমান অশ্বারোহী যোদ্ধার সম্মান পেতেন না, তারা পদাতিক হিসাবে যুদ্ধ করতেন। আরব মুসলমান রাজকোষ হতে যথাযথভাবে বৃত্তি পেলেও কোন অনারব মুসলমানদের সেই সুযোগ ছিল না। আরব মুসলনানদের কোন কর ছিল না বললেই চলে, কিন্তু অনারব মুসলমানগণ নানা করে জর্জরিত ছিল। উমাইয়াদের এই সমস্ত নানা দুর্বলতা, অবিচার, অত্যাচার জন-মানসে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করল। ইসলামের প্রবর্তক ইসলামী-রাজাকে স্থাপন করে গিয়েছিলেন "সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের" উপর। উমাইয়গণ যখন এই নীতিকে পদদলিত করে নিজেদেরকে কামনার দাসে পরিণত করল, তখন আব্বাসিয়গণ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঃ

খারিজী বিদ্রোহ, মাওয়ালী বিদ্রোহ এবং গোষ্ঠী কলহ যখন রাজ্যের

অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে একেবারেই বিশৃঙ্খলায় পরিণত করেছে, তখন মারওয়ান অনেকখানি শক্ত হাতে বিশৃঙ্খলা দমন করে রাজধানী হাররানে ফিরলেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে ও দেশের অভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ তার সুযোগ নিতে ভুল করে নি। আফ্রিকার বারবার ও খারিজীগণ তথাকার প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে একেবারেই বিরামবিহীনভাবে অস্থির করে তুলেছিল। এমন কি স্পেনও তখন পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তার কবল থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টায় রত। এই সুযোগে গ্রীকগণও এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার প্রান্তে বিপদের বিশাল কারণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। কোথাও আক্রমণ, কোথাও বিদ্রোহ, কোথাও বিশৃঙ্খলা, কোথাও বা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সমগ্র রাজ্যকে অশান্তির আগুনে ভরে তুলেছে। সবার উর্ধ্বে আববাসিয় প্রচার সমগ্র উমাইয়া রাজ্যত্বকে কোথাও প্রবল ঝটিকার সম্মুখীন করেছে, কোথাও প্রচণ্ড বন্যাকারে দেখা দিয়েছে, কোথাও বা তার রূপ অগ্নুৎপাত, কোথাও ভূমিকম্প। সমগ্র রাজ্য যখন এক ভয়াল মূর্তির রূপ নিয়েছে, রাজনৈতিক আকাশ যখন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, তখন কর্ণধার মারওয়ান রাজধানী হাররানে অবস্থান করলেন, যতক্ষণ না জাবের যুদ্ধে জীবনের শেষ আহ্বান পেলেন। এইভাবেই আজকের এই মরণনোন্মুখ উমাইয়া রাজত্বের জনক প্রথম মুয়াবিয়া উমাইয়া রাজত্ব স্থাপন করার জন্য একদিন হযরত আলীর মত মহামানকেও নানা অন্যায়, নানা প্রতারণা ও নানা প্রবঞ্চনায় পাগল করে তুলেছিলেন, ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রথম ব্যক্তি ঃ উমাইয়া বংশের পতনকে তরান্বিত করার মূলে ছিল আব্বাসীয় আন্দোলন। আবু আববাস ছিলেন মহানবী (দঃ) এর চাচা। সেখান হতেই আববাসীয় বংশের নামকরণ। আবু আববাস ৩২ হিজরী বা ৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে চারটি সুযোগ্য পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। হাশেমী বংশোদ্ভূত আববাসীয়গণ নিজেদের মান সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দিবারাত্রি চিন্তা করতেন কিভাবে কোন উপায়ে উমাইয়াদের পতন ত্বরান্বিত করা যায়। এই দ্বন্দ্ব হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্বেও ছিল, একমাত্র মহানবীর (দঃ) বিরল ব্যক্তিত্বের জন্য ঐ দ্বন্দ্ব ধামা চাপা পড়েছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত উমাইয়া প্রধান আবু সুফিয়ান মহানবীর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। পরে উড়তে না পেরে পোষ মেনেছিলেন। সেই চিরন্তন কলহ আবার মাথা চাড়া দিল সিফফিনের যুদ্ধে—উমাইয়া প্রধান মুয়াবিয়া ও আববাসীয়—হযরত আলীর মধ্যে। তারই পৈশাচিক মূর্তি দেখা গেল কারবালা মরু প্রান্তরে। এই ঘটনার শোক সহ্য করতে না পেরে আব্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাদিসশাস্ত্র বিশারদ

আব্দুল্লাহ্ শোকে দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। আব্দুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৭৩৫ খ্রীস্টাব্দ আলীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মহম্মদ দায়িত্ব নেন। এই মহম্মদ উমাইয়াদের সকল দোষ ত্রুটিগুলোকে জন-সমক্ষে প্রথম আন্দোলনাকারে তুলে ধরেন। উচ্চাভিলাষী মহম্মদ উমাইয়াদের সকল অধার্মিকতার বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার করাতে থাকেন। তাই মহম্মদই আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রথম ব্যক্তি।

আব্বাসীয় শক্তির মূল উৎস ঃ মহম্মদ-বিন আলী উমাইয়া বংশকে ধ্বংস করে আব্বাসীয় রাজত্ব কায়েম করতে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। তিনি উমাইয়া রাজত্বের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া হতে আরম্ভ করে মারওয়ান পর্যন্ত পরপর ছোট বড় ১৩ জন খলিফার সকল কুকাজ ও কুকীর্তিগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে আন্দোলনের হাতিয়ার তৈরি করেন। মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতা, ইয়াজিদের নির্দেশে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, আব্দুল মালিকের পক্ষপাতিত্ব, আল-ওয়ালিদের সময় হাজ্জাজ কর্তৃক চির নিষ্ঠুরতা, সুলাইমানের পাশবিক বিচার পদ্ধতি, দ্বিতীয় ওয়ালিদ ও ইয়াজীদের চরিত্রহীনতা, ইত্যাদি সকল কিছুকে উমাইয়াদের অনাচার-অত্যাচার, অনৈস্লামিক কার্যকলাপ, গোত্রনীতির-পক্ষাপাতিত্ব, আরব-অনারব-কোরাইশ-হাশেমী-উমাইয়া প্রভৃতি নানা রঙে রঞ্জিত করে প্রচার পত্রগুলোকে অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণীয় করে তোলেন। চতুর মহম্মদ সুকৌশলে নবী বংশের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য আলীর বংশধরদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। উমাইয়াদের প্রতি শিয়াদের আজন্ম বিদ্বেষ ও বিরাগকে মহম্মদ যেমনভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন, তেমনি খারেজী ও মাওয়ালীগণকেও কৌশলে করতলগত করে বিদ্রোহের কাজে লাগান। এই ভাবে শিয়া-খারেজী-মাওয়ালী, আলীবংশ ও হিমারীয়গণ সকলেই একত্রিতভাবে আব্বাসীয় আন্দোলনকে সংঘবদ্ধভাবে ব্যাপক শক্তি দান করল। এঁরাই ছিলেন আব্বাসীয় শক্তির মূল উৎস।

আব্বাসীয় প্রচার পদ্ধতি ঃ দ্বিতীয় ইয়াজীদের শাসনকালে খলিফার নৈতিক চরিত্রের পতনই আব্বাসীয় যুগের আন্দোলনের প্রথম সুযোগ করে দেয়। এবং ইহা পরে হিশামের রাজত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়। ৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর তিন ছেলে—ইব্রাহীম, আবুল আব্বাস (আস-সাফফাহ্) ও আবু জাফর (আল-মনসুর)-কে পর্যায়ক্রমে ইসলামের ইমাম বা উত্তরাধিকার মনোনয়ন করে যান। মহম্মদের প্রচার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ ও সংগঠনমূলক। তিনি সুকৌশলে সকল উমাইয়া

বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করেন। পারস্য ও খোরাসানের মাওয়ালীগণ প্রথম প্রচারকার্য আরম্ভ করেন, খারিজী ও শিয়াগণ আপন আপন এলাকায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচারকার্যে যথারীতিভাবে চালাতে থাকেন। এই প্রচারের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিও ছিল। এই কমিটি অত্যন্ত গোপনভাবে কাজ করত। এবং কমিটি যাঁদের উপর ভার ন্যস্ত করতেন, তাঁরাও ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ। যে কোন সময় গোপনীয়তা ফাঁস হলে প্রাণদণ্ড অনিবার্য ছিল। প্রথম এই কমিটি গঠিত হয়েছিল—৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিয়ে; এই কমিটি দেশের নানা স্থানে প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই কমিটি গোপন নির্দেশ ব্যতীত কেউ কোথাও কিছু করতেন না। এই কমিটিকে আজকের ভাষায় সিনেট বলা যেতে পারে। এই সিনেটকে পরিচালনা করতেন ১২ জন উচ্চ পর্যায়ের সদস্য বিশিষ্ট নকীব (Syndicate বা Council)। এই নকীবের সভাপতি ছিলেন—মহম্মদ-বিন-আলী। হিট্টি বলেন—"শিয়া, খোরাসানী, ও আববাসীয় শক্তির একত্রীকরণে উমাইয়া রাজত্বের অন্তিমকাল ঘনীভূত হল, এবং ইহা শেষোক্ত দলকে তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে সাহায্য করে।"

আবু মুসলিমের আবির্ভাব ঃ ৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় মারওয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঐ বছরই আন্দোলনের কর্ণধার মহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর যোগ্য পুত্র ইব্রাহীম দলীয় নেতা রূপে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। মহম্মদ জীবিত অবস্থায় তাঁর প্রচারকার্যে সাহায্যের জন্য আবু মুসলিম নামক এক আরব বংশোদ্ভূত ইস্পাহানবাসীকে নিযুক্ত করেন। তিনি এই বুদ্ধিমান তরুণ যুবক ক্রীতদাসকে আপন কাজে নিয়োগ করার জন্যই মক্কা হতে ক্রয় করে মুক্তি দেন। বার্নার্ড লুইসের মতে আবু মুসলিম ছিলেন একজন ইরাকী মাওয়ালী। ইব্রাহীম এই যুবকের সাংগঠনিক ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, বাগ্মীতা, সাহস, ধৈর্য ও সৌজন্যবোধ ইত্যাদি নানা কাজে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে খোরাসানের নেতৃত্ব পদ দান করেন। এই যুবকের তৎপরতা, যোগ্যতা, দক্ষতা-বিচক্ষণতা উমাইয়া বংশের পতনকে অনেকখানি তরান্বিত করেছিল। তাঁর কার্য ও নেতৃত্ব এতই প্রশংসনীয় ছিল যে, খোরাসান উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিণত হয়। এই তরুণ যুবক সম্পর্কে আমীর আলী বলেন—"মুদারীয় ও হিমারীয়গণের মধ্যে যে আত্মগরিমা ও তিক্ততা বিরাজমান ছিল, তা সুকৌশলে আপন কাজে লাগাবার মত মাকিয়াভেলীর চাতুর্য আবু মুসলিমের মধ্যে ছিল। এইজন্য উভয় পক্ষ হতে যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হন।

মার্ভ ও খোরাসানের পতন ঃ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য আবু মুসলিম দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে অবস্থিত আব্বাসীয় প্রচার কেন্দ্র হুমায়মা হতে খোরাসান পর্যন্ত কয়েকবার গোপনে যাতায়াত করেন। খোরাসানের উমাইয়া শাসনকর্তা নসর ইবনসাইয়ার যখন কিরমানে খারেজী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় ১২৯ হিজরী রমজান মাসে উমাইয়া রাজ্যের চতুর্দিকে গোপন দূতসমূহ প্রেরণ করে বিরাট বিপ্লবের জন্য তিনি হুমায়মায় অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে সুযোগ বুঝে ১২৯ হিজরী ২৫শে রমজান, ৭৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন আব্বাসীয় বিপ্লবের মহাক্ষণ ধার্য করে পর্বতের উপর এক বিরাট অনুষ্ঠান যোগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। এটা ছিল আরবের চিরন্তন প্রথা। একদিন মহানবী (সাঃ) স্বয়ং নিজে মক্কা বিজয়ের পূর্বক্ষণে এইরূপই করেছিলেন। এই অগ্নি দর্শন করতে এসে আবু সুফিয়ান বন্দী হন। অসংখ্য মানুষ চতুর্দিক হতে আবু মুসলিমের দলে যোগদান করতে থাকল। সমগ্র খোরাসানের মানুষ শোকের চিহ্ন স্বরূপ কাল পোশাক পরিধান করে বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরল। হিরাত ও অন্যান্য শহরের উমাইয়া দুর্গসমূহ বিদ্রোহীদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে থাকল। পরিশেষে বিদ্রোহীগণ খোরাসানের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী মার্ভ অবরোধ করলেন। খোরাসনের শাসনকর্তা নাসর নিরুপায় হয়ে খলিফার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন খলিফা মারওয়ান খারিজী বিদ্রোহ দমনে মেসোপটেমিয়ায় অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিব্রত থাকায় এবং সময়মত সাহায্য প্রেরণ করতে না পারায় খোরাসানের রাজধানী মার্ভ আবু মুসলিমের হস্তগত হয়। এই দুঃসংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই খলিফা সাহায্য প্রেরণ করেন, কিন্তু সাহায্য পৌঁছবার পূর্বেই রক্তক্ষয়ী ভীষণ সংগ্রামে শাসনকর্তা নাসর পরাজিত হন। ফলে ফরগণা ও সমগ্র খোরাসান আবু মুসলিমের অধিকারভুক্ত হয়। একদিন বিদ্রোহী মুয়াবিয়ার সেনাপতি আমর বিন আসের নেতৃত্বে মিশরের পতন যেমন ইসলামের চতুর্থ খলিফা মহাবীর হযরত আলীর (কঃ) মনোবল ও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল, তেমনি আজ বিদ্রোহী আবু মুসলিমের নেতৃত্বে খোরাসানের পতনও শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের অস্থি ও মজ্জাকে অসাড় করে তুলেছিল।

ইব্রাহীমের প্রাণদণ্ড ঃ খোরাসনের পতন উমাইয়া রাজত্বের উপর একটি মারাত্মক আঘাত স্বরূপ ছিল। খোরাসানের পতনের যথার্থ কারণ ও পতনের জন্য দায়ী নেতৃত্বের সন্ধান করতে গিয়ে মারওয়ান জানতে পারলেন— মহম্মদের পুত্র ইব্রাহীম কর্তৃক নিয়োজিত আবু মুসলিম এই সর্বনাশের কারণ

স্বরূপ ছিলেন। এই সময় ইব্রাহীম কর্তৃক আবু মুসলিমকে লিখিত একটি অতি গোপন পত্রও মারওয়ানের হস্তগত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্মা মারওয়ান ইব্রাহীমকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। ইব্রাহীমকে রাজধানীর হারারান জেলে নিক্ষিপ্ত করা হয়। এই কারাগারেই তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। প্রাণদণ্ডের পূর্বেই ইব্রাহীম জীবনের অন্তিমক্ষণ সমাগত বুঝতে পেরে তাঁর আপন ভ্রাতৃদ্বয় আবুল-আববাস-আল সাফ্ফাহ্ ও আবু জাফর আল মনসুরকে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। প্রাণ ভয়ে ভ্রাতৃদ্বয় পরিবার পরিজন সহ কুফায় আত্মগোপন করেন, এবং যথা সময়ে আবার এই কুফা হতেই তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন।

ইরাক অধিকৃত ও কুফা দখল ঃ ইব্রাহীমের প্রাণদণ্ডে আববাসীয় আন্দোলনকে ধবংস না করে বরং বেগবান করেছিল। আবু মুসলিমের রণ-কৌশল ও সমরদক্ষতায় সমগ্র পূর্বাঞ্চলে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আববাসীয় প্রচার ও বিদ্রোহ বিশাল আকার ধারণ করল। সমস্ত আববাসীয় সমর্থকগণ ইব্রাহীমের প্রাণদণ্ডে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে প্রবল উত্তেজনা ও উৎসাহে উমাইয়া রাজত্বের আশু পতনের জন্য একেবারেই বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। চতুর আবু মুসলিম দ্বাদশ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদ বা উপদেষ্টা সভা গঠন করে তাঁদেরই সাহায্যে ও পরামর্শে বিদ্রোহের কাজ তরান্বিত করতে থাকলেন। সুচতুর মুসলিম সুকৌশলেই কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে আন্দোলন পরিচালনা না করে হাশেমী বংশের নামে আন্দোলন চালাতে থাকেন। কেননা হযরত আলী (কঃ) ও হযরত আববাস (রাঃ) উভয়েই ছিলেন হাশেমী বংশোদ্ভূত সন্তান। তাই কলহের কোন কারণ ছিল না। আবু মুসলিম তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি কাহ্তাব ও খালিদ ইবন-বার্মাকে রাই শহর অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেনাপতি কাহ্তাব খোরাসানের শাসনকর্তা নাসরকে স্থান হতে স্থানান্তরে বিতাড়িত করতে থাকেন। অতি বৃদ্ধ শাসনকর্তা খোরাসান হতে গুর গাঁওয়ে, গুরগাওয় থেকে রাইয়ে, এবং রাই হতে হামাদানে পলায়ন পূর্বক সেখানে পীড়িত হয়ে চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় ৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে ৮৫ বছর বয়সে উমাইয়া রাজত্বের সুযোগ্য শাসক খোরাসানের শেষ শাসনকর্তা নাসর-ইবন-সাইয়ার ভগ্নহৃদয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইরানও হস্তচ্যুত ঃ সেনাপতি কাহ্তাব সহকারী আবু আওন ও খালিদ বিনবার্মা সহ রাই অধিকার করেন এবং কাহ্তাবের পুত্র নিহাওয়ান্দ অবরোধ করেন। নিহাওয়ান্দের অবরোধ মুক্তিতে এক লক্ষ উমাইয়া সৈন্য প্রেরিত হলে, এই বিশাল বাহিনীকে পথিমধ্যেই কাহ্তাব বাধা দেন ও পরাজিত করেন। ফলে

নিহাওয়ান্দ তিন মাস অবরুদ্ধ থাকার পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর সেনাপতি কাহতাবা ফেরাৎ নদী অতিক্রম করে ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হলে উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াজীদের নির্দেশে সেনাপতি ইবন-হুবায়রার নেতৃত্বে বিশাল সিরিয়া বাহিনী কাহতাবার পথ অবরোধ করলে এই ভীষণ সংগ্রামে সিরিয়া বাহিনী পরাজিত হয় এবং সমগ্র ইরাক আবু মুসলিমের হস্তগত হয়। এই সংগ্রামে সেনাপতি কাহতাবার অসতর্ক অবস্থায় নদী গর্ভে সলিল সমাধি হয়। অতঃপর কাহতাবার সুযোগ্য পুত্র ইবন-কাহতাবা সেনাপতির পদ বরণ করে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ইরাকের রাজধানী কুফা অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হয়ে প্রায় বিনা বাধায় রাজধানী কুফা দখল করেন। কুফা আবু মুসলিমদের অধিকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপনকারী আবুল আববাস ও তাঁর সহচরবৃন্দ আত্মগোপন পরিত্যাগ করে শুধু আত্মপ্রকাশই করলেন না, বিদ্রোহের দাবানলকে একেবারে দশগুণ বাড়িয়ে দিলেন। ইব্রাহীম হত্যার প্রতিশোধার্থে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল। এই সময় আবু মুসলিমের অপর এক সেনাপতি আবু আওন স্বয়ং খলিফা মারওয়ানের পুত্র আব্দুল্লাহকে শাহ্‌রাজোর নামক স্থানে যুদ্ধে পরাজিত করে পারস্যের নিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়া অধিকার করেন। এইভাবে ইরানও হস্তচ্যুত হল।

আবুল আব্বাস খলিফা নির্বাচিত ঃ আবু সালেমা নামক একজন হাশেমী প্রচারককে রসুলের বংশের ওয়াজীর বলে ঘোষণা করা হয়। এই আবু সালামা ও সেনাপিত কাহতাবাব যুক্ত নামে কুফার জনসাধারণের মধ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল যে, আগামী জুম্মার দিন নামাযের পর মসজিদে খলিফা নির্বাচিত করা হবে। এই সংবাদ শহরে প্রচার হওয়া মাত্র সমস্ত মানুষের মনে এক শিহরণ দেখা দিল। জুম্মার দিনে হাজার হাজার মানুষ কৃষ্ণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় মসজিদ প্রঙ্গণে সমবেত হলেন নামায শেষে আবু সালামা খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদভাবে জনগণকে অবহিত করালেন। হাজার হাজার মানুষ খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করলেন, সম্মতিও জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর আবু সালাম আবুল আববাস সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। ঐ ভাষণে ব্যক্ত করা হয়েছিল আবুল আববাসের যোগ্যতা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, সহনশীলতা ইত্যাদি নানা গুণ, এবং খলিফা পদের জন্য প্রস্তাব করলেন—আবুল আববাসের নাম। সমবেত জনতা উচ্চস্বরে তকবির ধবনি (আল্লাহ আকবর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) সহ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এইভাবে ৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর

সর্বসম্মতি ক্রমে আবুল আববাস আববাসীয় বংশের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন। অতঃপর আবুল আববাসকে গুপ্তস্থান হতে মসজিদে আনয়ন করার জন্য দূত প্রেরণ করা হলে তিনি কৃষ্ণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় সমজেদে আগমন করলে সকল মানুষের মধ্যে এক দারুণ প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। আবুল আববাস সকলের আনুগত্য লাভ করে প্রথম শপথ নেন—তিনি উমাইয়া নৃশংসতার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

জাবের যুদ্ধ ঃ একের পর এক খোরাসান, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের পতনে খলিফা মারওয়ান দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। সেনাপতি আবু আওনের হস্তে খলিফার পুত্র আব্দুল্লার পরাজয় খলিফাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে। খলিফা শেষ রক্ষার জন্য একেবারেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে শেষ বারের মত আববাসীয়দের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যসহ তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করে জাব নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। এদিকে আবু আওনের সাহাযার্থে আববাস একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয়ের মিলিত বাহিনীর পরিচালনার ভার অর্পিত হলো পিতৃব্য আব্দুল্লার উপর। খলিফা মারওয়ান জাব নদীর পশ্চিম তীরে ও আব্দুল্লাহ পূর্বতীরে আপন আপন শিবির স্থাপন করে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। খলিফা জাব নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হলেন। জাব নদীর পূর্বতীরে উভয়পক্ষে সম্মুখীন হলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কয়েকদিন যাবৎ জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল। প্রথম আক্রমণে উমাইয়াগণ অগ্রবর্তীর ভূমিকা পালন করলেও পরবর্তী অধ্যায়ে আব্বাসীয়গণের প্রচণ্ড আক্রমণে উমাইয়া বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ায় খলিফা মারওয়ান বাধ্য হয়েই আপন হাতে তৈরি জাব নদীর সেতুটি ভেঙ্গে দিয়েও আববাসীয়গণের পশ্চাদ্ধাবন রোধ করতে পারলেন না। উমাইয়া বাহিনী পশ্চাদপসরণ করার সাথে সাথে আববাসীয় বাহিনী বায়ুবেগে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলে উমাইয়া বাহিনী প্রাণের ভয়ে সেতু ভঙ্গ করেন। যার ফলে জাব নদীর পূর্বতীরে অসংখ্য উমাইয়া সৈন্য অসহায়ভাবে প্রাণ হারায়। বহু সেনার নদী গর্ভে সলিল সমাধি হল। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র হতে প্রাণ ভয়ে পলায়ণ করেন। খলিফা পরাজিত হলেন, উমাইয়াদের গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হল।

দ্বিতীয় মারওয়ান নিহত ঃ সমগ্র সিরিয়া উমাইয়াদের হস্তচ্যুত হয়ে আববাসীয়দের করতলগত হল। সকল নগরীর দ্বার আজ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত

হল—আব্দুল্লার জন্য। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান প্রাণভয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে গমন করতে থাকলেন। প্রথম মসুলে গমন করলেন, সেখান হতে প্রিয় রাজধানী হাররানে, আজ রাজধানী হাররানও স্বয়ং খলিফাকে একটু স্থান দিতে সক্ষম হল না। ইতিমধ্যে শহরগুলো একের পর এক আববাসীয়দের করতলগত হতে থাকে। একমাত্র রাজধানী দামেস্ক আববাসীয়দের গতিরোধ করার প্রচেষ্টা করলে নগরী অবরুদ্ধ হল। পরে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ২০/২৬শে এপ্রিল রাজধানী দামেস্ক অধিকৃত হয়ে সেখানে আব্বাসীয় পতাকা উড্ডীয়মান হল। তখনও সেনাপতি আব্দুল্লাহ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে অনুসরণ করার জন্য সতর্ক সেনাবাহিনী নিযুক্ত রেখেছেন। এবার মারওযান দামেস্ক হতে প্যালেস্টাইনে পলায়ন কালে পথিমধ্যে বসরার এক পরিত্যক্ত গীর্জায় গোপন আশ্রয় গ্রহণ করেন। আব্দুল্লার সেনাবাহিনী মিশরের নীল নদের পশ্চিম উপকূলে বুসির নামক স্থানে এই অখ্যাত পড়ো ভগ্নপ্রায় গীর্জা হতে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে বন্দী করেন এবং ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ৫ই আগস্ট তাঁকে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর মস্তকটিকে দেহ হতে বিছিন্ন করা হয়। এবং এই বিদেহী মস্তকটি আবুল আববাসের ভ্রাতা সালেহের নিকট প্রেরিত হলে সালেহ তাঁর জিহ্বাটি কেটে বিড়ালকে ভক্ষণ করান। পরে ছিন্ন মস্তক কুফায় আবুল আব্বাসের নিকট প্রেরিত হলে তিনি আনন্দের আতিশয্যে আল-সাফ্ফা বা রক্তপিপাসু উপাধি গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে জাবের যুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমীর আলী বলেন—"জাবের এই মারাত্মক যুদ্ধ উমাইয়া রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটায়।" ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের জাবের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়াদের পতন ও আব্বাসীয়দের উত্থানের চিরসাক্ষী স্বরূপ হয়ে থাকল।

৬৬১—৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে উমাইয়াগণ আববাসীয়গণের প্রতি যে নিষ্ঠুরতম ব্যবহার করেছিলেন, আবুল আববাস তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা সহ খেলাফতের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আবুল আববাস উমাইয়াদের প্রতি তাঁর চরম নিষ্ঠুরতার দ্বারা ঐ প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাই তিনি আস সাফফাহ উপাধিও লাভ করেন। তাঁরই নির্দেশে উমাইয়া বংশকে নির্মমভাবে ধবংস করা হয়। শুধু তাই নয়, বিগত উমাইয়া খলিফাদের সমাধিগুলোও অবমাননার কবল থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। প্রতিহিংসাপরায়ণ আববাসীয়গণ একমাত্র প্রথম মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় ওমরের সমাধি ব্যতীত সকল সমাধিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন।

প্যালেস্টাইনে আবু ফুৎরুস নদীর তীরে দ্বিতীয় মারওয়ানের কিছুদুর ও নিকট আত্মীয় বসবাস করতেন। আব্দুল্লাহ্-ইবন-আলী তাঁদের একজনকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিবিরে আনয়ন পূর্বক অতি নির্মমভাবে হত্যা করে চরম বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় দেন, উমাইয়া বংশের যে স্বল্প সংখ্যক উমাইয়া সমর্থক এই নিধন-যজ্ঞ হতে রক্ষা পেয়েছিলেন—তন্মধ্যে হিশামের দৌহিত্র আব্দুর রহমান অন্যতম। তিনি প্রাণ ভয়ে স্পেনে পলায়ন পূর্বক তথায় একটি উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি।

চরিত্র ঃ দ্বিতীয় মারওয়ান ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে যে কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা সত্যিই বিরল। ধৈর্য ও বীরত্ব ইত্যাদির জন্য তাঁকে আরব ঐতিহাসিকগণ 'আল-হিমার' বা গর্দভ উপাধি দান করেন। জীবন-যাত্রার দিক থেকে তিনি অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর ছিলেন। উমাইয়া রাজত্বের কয়েকজন খলিফাকে বাদ দিলে তাঁর সমতুল্য খলিফা সমগ্র উমাইয়া বংশে বিরল। উমাইয়া বংশের যে বিশেষ সাতজন খলিফার মধ্যে ৬ জন আপন কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন, দ্বিতীয় মারওয়ান তাঁদের একজন। কিন্তু ভাগ্য তাঁর সহায় না হওয়ায় তিনি কিছুই করতে পারেন নি । ইবনুল আসির বলেন ঃ "As destiny had put a term on his reign both his valour and wisdom came to naught". আমীর আলী বলেন—"তিনি উমাইয়া বংশের একজন অন্যতম সাহসী ও শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন এবং উত্তম ভাগ্যলাভের যোগ্য ছিলেন।" দ্বিতীয় মারওয়ান-চরিত্রে আমরা কিছু মারাত্মক দোষও লক্ষ্য করি। তিনি সঙ্কীর্ণমনা ও আপোষহীন চরিত্রের লোক ছিলেন। তাই আমীর আলী বলেন—"রাজনীতিবিদদের উদারতা ও বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় আপোষ যুক্ত মনোভাব যদি তাঁর থাকত, তা হলে এশিয়ার ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত"।

সবকিছু ত্রুটি সত্ত্বেও দ্বিতীয় মারওয়ান ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি উমাইয়া খেলাফতের বিশেষ সাত জনের একজন, (১) প্রথম মুয়াবিয়া, (২) প্রথম ইয়াজীদ, (৩) আব্দুল মালিক, (৪) প্রথম ওয়ালিদ, (৫) প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিতীয় ওমর, (৬) হিশাম, (৭) দ্বিতীয় মারওয়ান। একমাত্র প্রথম ইয়াজীদ ঐতিহাসিক কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য চরম কুখ্যাতি যোগে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছেন, বাকি ৬ জনের কিছু না কিছু সুখ্যাতি আছে। দ্বিতীয় মারওয়ান সেই ৬ জন সুখ্যাতবানদের একজন।

কৃতিত্ব ও পরাজয়ের কারণ ।। সক্ষম খলিফার জীবনে অক্ষমতার ছাপ কেন ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত উমাইয়া খলিফা হিশাম বিদ্রোহীদের আক্রমণ হতে উমাইয়া খেলাফতকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান খলিফা হিশাম অপেক্ষা কম শক্তিধর পুরুষ ছিলেন না, তবুও কোন্ কারণে তিনি সক্ষম ব্যক্তি হয়েও খেলাফত রক্ষা করতে অক্ষমতার পরিচয় দিলেন। আমরা প্রথম লক্ষ্য করি খলিফা হিশামের সময় বিদ্রোহের যে তীব্রতা ছিল, খলিফা মারওয়ানের সময় ঐ তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। খলিফা হিশামের সময় বিদ্রোহ ছিল বিক্ষিপ্ত, কিন্তু দ্বিতীয় আবু মুসলিমের নেতৃত্বে ঐ বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহসমূহ কেন্দ্রীভূত হয়ে খলিফা হিশামের পরবর্তী তিন জন অপদার্থ খলিফার সময় বিদ্রোহের আগুন প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। যার ফল ভোগ করতে হয় খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে। দ্বিতীয় কারণ লক্ষ্য করি— খলিফা হিশাম তাঁর রাজ্য রক্ষার্থে খেলাফতের প্রথম দিন হতে তাঁর খেলাফত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এতটুকুও শিথিলতা প্রকাশ করেন নি, প্রশাসনের প্রতি কোথাও অন্যমনস্ক বা অমনোযোগী হন নি। নিষ্ক্রিয়তা বা নিস্তেজ তাঁকে কোনদিনই গ্রাস করতে পারে নি, তিনি ছিলেন সদাই প্রাণচঞ্চল ও সতর্ক। যার ফলে সহজে কেউই বিদ্রোহ প্রকাশে সাহস পেত না। কিন্তু খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান খেলাফতের প্রথম জীবনে বা প্রথম দিকে যে উদ্যমশীলতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, রাজধানী হাররানে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সেই উদ্যমে যথেষ্ট ভাটা পড়তে দেখা যায়। অথচ এই সময় তাঁর আরো বেশি সচেতন ও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা, বিদ্রোহ তখন বিরাটাকারে দেশ জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু খলিফা অন্যমনস্ক, অমনোযোগী ও উদাস হওয়ায় বিদ্রোহের আগুন সহজেই অতি প্রবলতর হয়ে উঠল। সুতরাং খলিফার অমনোযোগিতা ও উদাসভাবও তাঁর পতনের একটি প্রধান কারণস্বরূপ। তৃতীয় কারণ লক্ষ্য করি দেশ জুড়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে অগ্নিপ্রবাহ, তার মূলে ছিল উমাইয়া খলিফাদের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের এই পক্ষপাতমূলক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই দেশবাসীকে তাঁদের শত্রুতে পরিণত করেছিল। কিন্তু খলিফা মারওয়ান তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে দেশবাসীকে আপন মিত্রে পরিণত করতেও পারেন নি। আপন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে অপরকে আপন করতেও পারেন নি। খলিফা নিজেই দল, গোষ্ঠী, বংশ ও সংকীর্ণ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জড়িত ও জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন, কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। অতএব

তাঁর এই অনুদারতা সংকীর্ণতাও তাঁর পতনের জন্য কম দায়ী নয়। চতুর্থ কারণ, খলিফা মারওয়ানের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীগণ তেমন সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, যার ফলে খলিফা সদাই বিব্রত বোধ করতেন এবং যথাসময়ে সঠিক নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াও হত না, যার পরিণতি হত অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীষণ মারাত্মক। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের এই মারাত্মক ভুলের সুযোগ বিদ্রোহীগণ নিতে কোন দিনই ভুল করেন নি। একটি সাধারণ মানুষের ভুল ও একটি বিশেষ মানুষের বা সম্রাটের ভুল কখনও এক বস্তু নয়। যার জন্য খলিফা মারওয়ানকে তাঁর এই ভুলের শেষ মাশুল দিতে হ'ল ভগ্ন-হৃদয়ে মিশরের নীলনদের পারে এক পরিত্যক্ত ভগ্ন গীর্জায়। পঞ্চম কারণ বলতে পারি—সক্ষম খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের ভাগ্য যেন তাঁর সহায় হয় নি, উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনেও আমরা এই একই কথা উচ্চারণ করেছি—ভাগ্য যেন সহায় হ'ল না মহাবীর আলীর। উমাইয়াদের এই পতনের দিনেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি রয়ে গেল ইতিহাসের পাতায়, তাই আমরা বলতে বাধ্য—উমাইয়া রাজত্বের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান তাঁর রাজত্ব রক্ষা করতে যে সাহসিকতার পরিচয় রেখে গেছেন তা বিরল, কিন্তু তা অপেক্ষাও দেশব্যাপী বিরল ও বিশাল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তাই সক্ষম খলিফার জীবনে রাজ্য রক্ষার্থে অক্ষমতার ছাপ রয়ে গেল।

আবু মুসলিমের অবদান : এই জগতের বুকে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছেন মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ), এবং এই প্রতিষ্ঠান পর্বে যাঁরা তাঁকে সর্বত্যাগী পুরুষের ন্যায় সাহায্য করেছিলেন—তাঁরা ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থাৎ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), ও হযরত আলী (কঃ)।

আবার এই খোলাফায়ে রাশেদীনকে টিকিয়ে রাখতে যাঁরা আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর ভক্ত সাহাবাগণ, সেনাপতিদের মধ্যে অজেয় বীর খালেদ-বিন-ওয়ালীদ, এবং মজলিশ-উস্-শুরার সভ্য বা সদস্যবৃন্দ— উবাইদা-বিন-জারাহ, সাদ, তালহা, জুবাইর, ও আব্দুর রহমান বিন আউফ অন্যতম।

অতঃপর উমাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠাতে মুয়াবিয়াকে তিনজন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছিলেন, এবং যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত উমাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভব হত কিনা কে জানে, তাঁরা—আমর বিন আস, জিয়াদ বিন-আবিহ্ ও মুগিরা বিন-সুবাহ্। এঁরা তিন জনেই ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, ভুলে হোক, ভ্রান্তিতে হোক, লোভে হোক, প্রলোভনে হোক, আবেগে

হোক, উচ্ছ্বাসে হোক অন্ধের মত মুয়াবিয়াকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং উমাইয়া রাজত্বের জন্মলগ্ন চিরদিনই এই তিন জনের নিকট চির-ঋণী।

আমাদের দেশেও ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠাতে কয়েকজন দেশবাসী—(মীরজাফর, উমিচাঁদ, রায় দুর্লভ, জগৎ শেঠ) একদিন নিজ জাতিকেই ডুবিয়ে দিলেন। ইতিহাসের এই একই ধারায় সুদীর্ঘ আববাসীয় রাজত্বের উত্থানে ও প্রতিষ্ঠাতে আবু মুসলিম যে অসামান্য অবদান, যে সাহস সহিষ্ণুতার, যে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার, এবং যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় রেখে গেছেন, যে সফল ও সার্থক সংগঠকের সবুজ স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে কোনদিনই মলিন হওয়ার নয়, যার জন্য আববাসীয় রাজত্বকালের জন্মলগ্ন চিরদিনই আবু মুসলিমের নিকট ঋণ স্বীকার করবে। এককথায় উমাইয়া রাজত্বের পতনে ও আববাসীয় রাজত্বের জন্মলগ্নে আবু মুসলিমের অবদান অপরিমিত অসামান্য।

নবম অধ্যায়

উমাইয়া রাজত্বের পতন

প্রধান কারণ

[আত্মিক অবনতি—প্রাকৃতিক নিয়ম—ইসলামী খেলাফতের পরিবর্তন—মনোনয়ন নীতির অভাব—ইসলামের মূল নীতিতে আঘাত—বিশ্বাসঘাতকতা—নিষ্ঠুরতা—বীরের প্রাণদণ্ড—অনৈস্লামিক কার্যকলাপ—গান-বাজনা—মদ্যপ খলিফাগণ—নৈতিক অধঃপতন—ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন—অযোগ্যতা—সাম্রাজ্যের বিশালতা—উমাইয়া গৌরব-রবির প্রাণনাশ—গৃহ-দ্বন্দ্ব—মুসলমান-অমুসলমান—আরব-অনারব—আরব মুসলমান, অনারব মুসলমান—হাশিমী-উমাইয়া দ্বন্দ্ব—হিমারীয়-মুদারীয় কলহ—খারিজী ও শিয়াদের বিদ্রোহ—আববাসীয় আন্দোলন।]

ছোট বড় ২৫-টা কারণে বিশাল উমাইয়া রাজত্বের বিরাট শক্তিধর পুরুষদের পতন অনিবার্য হয়েছিল ঃ

১। আরবীয়দের আত্মিক অবনতি ঃ ৬৬১-৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ৯০ বছর উমাইয়াদের রাজত্বকাল। এই যুগকেই ইসলামের বৃহৎ রাজ্য সম্প্রসারণের স্বর্ণ যুগও বলা হয়। আবার উমাইয়াদের আত্মধবংসের যুগও বলা হয়, তাই ঐতিহাসিক গ্রুনিবাম বলেন—"ইহাকে (উমাইয়া যুগকে) জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে আরবদের আত্মধবংসের যুগও বলা যেতে পারে।" উমাইয়া যুগকে আত্মধবংসের যুগ এই জন্য বলা হয় যে, মহানবী (সাঃ) মানবমণ্ডলীকে দুটি পথ দিয়ে গিয়েছিলেন, — একটি পথ ছিল — মানুষকে ভাল করা, এবং অন্য পথটি ছিল—মানুষের ভাল করা। উমাইয়াগণ প্রথম পথটি পরিত্যাগ করল। যার ফলে উমাইয়াদের আত্মার অবনতি অনিবার্য হয়ে উঠল।

মহানবী (সাঃ) এই প্রথম পথটির জন্যই তাঁর মহাজীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেছিলেন, ধন-জন-মান বা রাজত্বের পেছনে নয়, এবং বার বার মানবমণ্ডলীকে সতর্ক করেছিলেন—মানুষকে ভাল কর, নচেৎ মানুষের ভাল করে কোন ফল হবে না। অসুস্থকে সুস্থ কর, নচেৎ তার জন্য বিরাট অট্টালিকা করে লাভ হবে না। সন্তানকে সুসন্তান কর, মানুষ কর, নচেৎ তাকে বিশাল রাজত্ব দিয়েও কোন লাভ হবে না, সে মানুষ না হলে অবলীলায় যা পাবে, অবহেলায় তা হারিয়ে ফেলবে। উমাইয়াগণ কিন্তু মানুষকে ভাল করার পথ একেবারেই পরিত্যাগ করে শুধু দ্বিতীয় পথটিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকল। তাই আমরা লক্ষ্য করি—উমাইয়া রাজত্বের সর্বমোট ১৪ জন খলিফার মধ্যে একমাত্র মহামানব

খলিফা দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত অন্য কাউকেই মহানবীর প্রকৃত উম্মত বা অনুসারী বা শিষ্য বলা যায় না। তাঁরা প্রত্যেকেই অল্পবিত্তর ভ্রষ্ট চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাই তাঁরা রাজত্ব রক্ষা করতে পারেন নি, রাজত্বও তাঁদের রক্ষা করতে পারে নি। সুতরাং মানুষকে ভাল না করে শুধু মানুষের জন্য ভাল করে লোকসান ব্যতীত লাভ হয় না। আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সারা বিশ্ব-জুড়ে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। আজ বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের ভালর জন্য বহু কিছু আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু মূল মানুষকে ভাল করার চেষ্টা না থাকায়, সেই মানুষের ভাল করার উপকরণগুলো ধবংসের জন্য বিশ্ব যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। তাই কোরআন ও মহানবীর নীতি বিবর্জিত উমাইয়াগণ তাদের পতনের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পায় নি।

২। **প্রাকৃতিক নিয়ম ঃ** বিশ্ব-বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ইবন খালদুন বলেন— "যে কোন রাজবংশের ঠিকমত স্থিতিকাল একশ' বছর। যে কোন ক্ষমতাসম্পন্ন রাজবংশকে তিনটি অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়,— (১) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, (২) শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা, (৩) ক্রমাবনতি ও পতন। সমাজ-বিজ্ঞানী খালদুনের এই সংজ্ঞানুযায়ী উমাইয়া খেলাফতও ৯০ বছর টিকে ছিল। এবং তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল — মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠা, ওয়ালিদ কর্তৃক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি, দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় পতন। সমাজবিজ্ঞানী খালদুন বলেন—"দ্বিতীয় পুরুষদের যুগে মারওয়ান ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাঁর গুণাবলীও সুপরিচিত। আব্দুল মালিকের পুত্রগণ একের পর এক ক্ষমতার অধিকারী হলেন। যাঁদের অসাধারণ ধর্মভীরুতা সুবিদিত। তাঁদের মাঝামাঝি সময়ে রাজত্ব করেন—ওমর ইবন আব্দুল আজীজ। তিনি যত্ন-একাগ্রতা ও অকৃত্রিমতার সাথেই প্রথম চার খলিফার ও সাহাবাদের পথ অনুসরণের চেষ্টা করেন। অতঃপর এলেন—পরবর্তী যুগের উমাইয়া খলিফাগণ। জাগতিক বিষয়ে তাঁরা রাজশক্তির চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতেন। তাঁরা সচেতন ভাবে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন না, এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের কাজ কর্মের মধ্যে যে সততা ও নির্ভরশীলতা ছিল তা ভুলে গেলেন। এর ফলে জনগণ তাঁদের কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে থাকল, এবং উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আববাসীয়দের প্রচারই তারা গ্রহণ করল। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেও উমাইয়া বংশের ধবংস অনিবার্য ছিল।

৩। **ইসলামের খেলাফতের পরিবর্তন ঃ** ইসলাম জগতের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সাঃ) ইসলামকে দুটি জিনিসের উপর স্থাপন করে গিয়েছিলেন,

প্রথমটি—গণতন্ত্র, দ্বিতীয়টি—(১) সত্য, (২) শান্তি, (৩) সাম্য, (৪) মৈত্রী ও (৫) বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। উমাইয়া প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া খেলাফত লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই মহানবীর (সাঃ) দুটো ধারাকেই কবরস্থ করলেন। প্রথম গণতন্ত্রের পরিবর্তে আনলেন স্বৈরতন্ত্র, নির্বাচনের স্থলে এলো মনোনয়ন, খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ খেলাফতের স্থান লাভ করল—বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, বায়তুল মাল (সরকারি কোষাগার) হল—খলিফার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি। স্বয়ং খলিফা (গণ প্রতিনিধি) হলেন সম্রাট। দ্বিতীয় অধ্যায় সত্য-শান্তি-সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের স্থানে এল—মিথ্যা, অশান্তি, অসাম্য, হিংসা ও বিদ্বেষ। যার ফলে ইসলামের গণতন্ত্রভিত্তিক ঐ পাঁচটি নীতির পরিবর্তে উমাইয়া বংশের স্বৈরতন্ত্র ভিত্তিক বিপরীত পাঁচটি ধারার প্রবর্তন হল। তাই বার্নার্ড লুইস বলেন—"মুয়াবিয়ার কাজ ছিল—ইসলামি রাষ্ট্রের পরিবর্তে উমাইয়া বংশের কৌলিণ্যের ভিত্তিতে একটি আরব রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।" এই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে খোলাফায়ে রাশেদীনের যবনিকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমস্ত নীতিরও সমাধি হল। ফলে খেলাফতের এই পরিবর্তনে একমাত্র উমাইয়া ব্যতীত জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে কোথাও সরবে, কোথাও নীরবে বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকল।

৪। মনোনয়ন নীতির অভাব ঃ উমাইয়া খেলাফতের উত্তরাধিকার নিয়োগের কোন সুষ্ঠু বা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। যার ফলে খেলাফতকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-কলহের কোন অন্ত ছিল না। এই অভ্যন্তরীণ কলহ ও গৃহবিবাদই সর্বাপেক্ষা বেশি আঘাত দেয় উমাইয়া খেলাফতকে। উমাইয়া প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজীদকে খলিফা মনোনয়ন করে যান। কিন্তু বিচক্ষণ মুয়াবিয়া এটাকে কোন নিয়ম বা নীতিতে রূপ দিয়ে যান নি। এই দিক থেকে মুয়াবিয়া রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নি। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক হিসাবে এটা তাঁরই কর্তব্য ছিল। তাঁর এই বিরাট ভুল উমাইয়া খেলাফতের পতনের অন্যতম কারণস্বরূপ। ইবন খালদুনের মতে—"বয়োঃজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই খলিফা নিযুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু এই নীতি পরবর্তীকালে পালন করা হয়নি।" ১৪ জন উমাইয়া খলিফার মধ্যে মুয়াবিয়া আপন পুত্র ইয়াজীদকে মনোনয়ন করেন, ইয়াজীদ তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়াকে, এবং প্রথম মারওয়ান তাঁর পুত্র আব্দুল মালিক ও আব্দুল আজীজকে, এবং আব্দুল মালিক তাঁর পুত্রগণকে মনোনয়ন করেন। সুতরাং যাঁর যেটি ভাল লেগেছিল, তিনি আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারই প্রয়োগ করেছিলেন, এখানে নীতির কোন বালাই ছিল না। আব্দুল মালিক মৃত পিতার অছিয়ত মত

আপন ভ্রাতা আব্দুল আজীজকে বঞ্চিত করে আপন পুত্রগণকে মনোনীত করেন। প্রথম ওয়ালিদ আপন ভ্রাতা সুলাইমানকে বঞ্চিত করে আপন পুত্রকে মনোনয়ন করতে ব্যর্থ হলে সুলাইমান খলিফা হন। আবার সুলাইমান আপন ভ্রাতা দ্বিতীয় ইয়াজীদকে বঞ্চিত করে পিতৃব্য-পুত্র (চাচাত ভাই) দ্বিতীয় ওমরকে, দ্বিতীয় ওমর দ্বিতীয় ইয়াজিদকে ও ইয়াজিদ তাঁর ভ্রাতা হিশামকে, হিশাম দ্বিতীয় ওয়ালিদকে মনোনীত করেন। ওয়ালিদকে তৃতীয় ইয়াজীদ সিংহাসনচ্যুত করেন। তৃতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম খলিফা হলে প্রথম মারওয়ানের পৌত্র দ্বিতীয় মারওয়ান তাঁকে আইন-আল-জারের যুদ্ধে পরাজিত করে খেলাফত দখল করেন। সুতরাং খেলাফতের ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়নের এইরূপ খাম-খেয়ালী-স্বেচ্ছাচারী, অনিশ্চিত, অনির্ধারিত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনোনয়ন নীতির ফলে ক্ষমতা লাভের জন্য রেস-কোর্সের ঘোঁড়-দৌড়ের মত উমাইয়া বংশধরগণ সিংহাসনকে কেন্দ্র করে অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের মহা সর্বনাশ ডেকে আনেন। সুস্থ-সবল সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত মনোনয়ন নীতির অভাব উমাইয়া বংশের পতনের পথকে অনেকখানি প্রশস্ত ও মজবুত করে দিয়েছিল।

৫। **ইসলামের মূল নীতিতে আঘাত ঃ** ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) ইসলামী রাজ্যকে মূলত চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপন করেছিলেন— (১) গণতন্ত্র, (২) নৈতিকতা, (৩) সাম্য ও (৪) ভ্রাতৃত্ব। উমাইয়াগণ সিংহাসন লাভ করলে শুধু যে একটি বংশেরই পরিবর্তন হলো, তা নয়। ইসলামি রাজ্যের সমগ্র কাঠামোটিরও পরিবর্তন হলো। অমীর অলি বলেন—"উমাইয়াদের সিংহাসন আরোহণ শুধুমাত্র শাসক বংশেরই পরিবর্তন সূচনা করে নাই, বরং একটি নীতির আমূল পরিবর্তন ও কতকগুলো নীতিতে এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি করে।" শঠতা ও ষড়যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে মুয়াবিয়া হযরত আলীকে খেলাফত হতে বঞ্চিত করে নৈতিক কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন, তাকে ইসলামের মৌলিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্মভীরু সাহাবীগণ কোন দিনই ভাল চোখে দেখেন নি। উমাইয়া বংশ রাজত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সৎ-মানুষের সহানুভূতি ও আস্থা হারালো। তাই উমাইয়া বংশের পতন-বৃক্ষের বীজ এখানেও রোপিত হয়েছিল।

৬। **বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ঃ** সিফফিনের যুদ্ধে সিংহাসন লাভের জন্য পবিত্র কোরআনকে নিয়েও হযরত আলীর সাথে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করতে মুয়াবিয়ার মনে এতটুকুও সঙ্কোচ জাগে নি। স্বয়ং মহানবীর দৌহিত্র ইমাম

হাসানকে গভীর ষড়যন্ত্রে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করতেও মুয়াবিয়ার চিন্তা জগৎ ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত হয় নি। আবার ইমাম হাসানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইমাম হোসেনকে খেলাফতের উত্তরাধিকার মনোনয়ন না করে আপন অযোগ্য অপদার্থ মদ্যপ পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনয়ন করে মুয়াবিয়া যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটিও জনসাধারণের মনের কোণে উমাইয়া বংশের পতনের কারণ রূপে কম অবদান জোগায় নি। শুধু তাই নয়, ষড়যন্ত্রমূলক দূরভিসন্ধি তে গণতন্ত্রের মাধ্যমে মজলিস-উস-সুরা কর্তৃক খলিফা নির্বাচন প্রথাটির বিলোপ সাধন ও বংশানুক্রমিক রাজবংশের প্রতিষ্ঠার জন্য মুয়াবিয়া আজও ইসলাম জগতের নিকট দায়ী। তাঁর এই দায়িত্বহীনতাও রাজ্যের পতনের জন্য কম দায়ী ছিল না।

৭। **নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা ঃ** পরবর্তী অধ্যায়ে কারবালা মরু-প্রান্তরে মহানবীর (সাঃ) বংশকে একেবারে নির্বংশ করতে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ কর্তৃক ইমাম হোসেনের প্রতি নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন নির্মম নিষ্ঠুরতাকেও ম্লান করে দেয়, এই ঘটনা সমগ্র আরব-অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনের শাণিত রক্তেই উমাইয়া বংশের ধ্বংসের মূল বীজটি দানা বেঁধেছিল। ইয়াজিদের খেলাফতের দ্বিতীয় পর্বে মদীনা-লুণ্ঠন দ্বারা মহানবীর (সাঃ) দূর ও নিকটতম সকল সাহাবীর অফুরন্ত অভিশাপ কুড়িয়েছিল উমাইয়া বংশ।এই ইয়াজিদের খেলাফতের তৃতীয় বা শেষ কাজ মক্কার পবিত্র কাবাতে অগ্নি সংযোগ উমাইয়া বংশের পতনকে কম তরান্বিত করে নি। উমাইয়া রাজত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া আপন পুত্র নরাধম ইয়াজিদকে নিষ্কণ্টক করার নিমিত্ত দুই পূত-পবিত্র ইমামকে অকাতরে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে আপন বংশকে তো রক্ষা করতে পারেনই নি, অধিকন্তু এই অমানুষিক কাজের দ্বারা উমাইয়া বংশেরও মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন।

৮। **বীরের প্রাণদণ্ড ঃ** উমাইয়াদের নজীরবিহীন নৃশংসতা ও বর্বরতা মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের সঙ্গেই শেষ হল না। বরং এটা ছিল সূচনা পর্ব। পরবর্তীকালে আব্দুল মালিক এবং ওয়ালিদের সময় বিশ্ব-বিখ্যাত নিষ্ঠুর হাজ্জাজের আবির্ভাব। বহু ঐতিহাসিকের মতে হাজ্জাজ ১,১২,০০০ মানুষকে হত্যা করেন। তদানীন্তন মক্কা মদীনার ধার্মিক শাসনকর্তা আবুল্লাহ-বিন-জুবাইয়েরকে হত্যা করে তাঁর প্রাণহীন দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে বিদেহী মস্তক ও মস্তকবিহীন দেহকে শূলে চাপিয়ে সমগ্র মক্কা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে সর্বশেষ তাঁর শোকাতুরা অতিবৃদ্ধ জননীর নিকট উপহার স্বরূপ উপঢৌকন পাঠিয়ে দিয়ে

বিদ্রূপাকারে যে পৈশাচিকতার পরিচয় দেন, তা যে কোন পশু প্রকৃতি অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট ছিল। দূর অতীতের এই নিকৃষ্টতম নৃশংসতা উমাইয়া শক্তিকে দুর্বল ব্যতীত সবল করেনি। পরবর্তীকালে আবার এই নিষ্ঠুর হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধার্থে খলিফা সুলাইমান যে অগ্নিরূপ ধারণ করলেন, সে আগুনেই আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হলেন ইসলামের ইতিহাস-বিখ্যাত বহু বীর সেনা—সিন্ধুবিজয়ী মহম্মদ-বিন-কাসেম, স্পেন বিজয়ী মূসা, জিব্রালটার বিজয়ী তারিক এবং আরো অনেকে। ইসলাম জগতের নিরপরাধ এই সমস্ত বীর সেনাদের অতি মর্মান্তিক প্রাণদণ্ড সমগ্র উমাইয়া রাজত্বের মৃত্যুদণ্ডকেই ত্বরান্বিত করেছিল। হাজ্জাজের অতি নিষ্ঠুরতা যেমন সুলাইমানের অতি নির্মমতার জন্ম দিয়েছিল, তেমনি খলিফা সুলাইমান কর্তৃক বহু বীরের প্রাণদণ্ড নীরব সংকেতে ঘোষণা করেছিল—উমাইয়া রাজবংশের মৃত্যুদণ্ড।

৯। **খলিফাদের অনৈস্লামিক কার্যকলাপ ঃ** (পদস্খলন হতে মনস্খলন) খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন—পবিত্র কোরআন ও হাদিসের একান্ত অনুসারী। তাঁরা ছিলেন মানবতার দুর্জয় সাধক, দুর্গত মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ ; ধর্মে ছিলেন ধীর, কর্মে ছিলেন মহাবীর, আদর্শে ছিলেন চিরউন্নত শির। উমাইয়া খলিফাগণের মধ্যে দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সকলেই খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত আদর্শকে একেবারেই বিসর্জন দিয়ে চরম ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেন। মহানবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের অতি সাধারণ অনাড়ম্বর ইমারতগুলোর পরিবর্তে বিরাট ও বিশালাকার জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের উদ্ভব হল। স্থাপত্যশিল্পের এই উন্নতি নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া খলিফাগণ ভোগ-লালসায়, বিলাস-ব্যসনে এতই মত্ত হয়ে উঠলেন, মনে হল তাঁরা যেন আবার সেই প্রাক-ইসলাম যুগের অন্ধকারে ফিরে গেলেন, আবার সেই অসভ্য আরব বেদুইনের পঙ্কিল জীবন পদ্ধতিতে যেন অনুরক্ত হলেন। তাই ক্রেসওয়েল বলেন—"পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ আরব বেদুইনদের জীবন পদ্ধতিতে অনুরক্ত ছিলেন বলে তাঁরা মরুভূমিতে অনেক প্রমোদ-প্রাসাদ নির্মাণ করেন।" খলিফাগণ রাজধানী দামেস্ক ছাড়াও সাম্রাজ্যের বহুস্থানে অসংখ্য প্রমোদ-প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই সমস্ত প্রাসাদের শয়নকক্ষে ও স্নানাগারে বহু দেওয়াল-চিত্রাবলী, এমন কি অনেক নগ্ন চিত্রাবলী, যেগুলোর অনেক গুলোতেই—জীবজন্তু-পশু-পক্ষী হতে মানুষের যৌনমিলনের নগ্ন ছবিও স্থান লাভ করে উমাইয়া খলিফাদের বিকৃত রুচির নগ্ন পরিচয় তুলে ধরেছিল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ইসলাম মানুষের একটি সাধারণ ভদ্র ফটো সম্পর্কেও সতর্কবাণী ঘোষণা করেছে। এইভাবে উমাইয়া খলিফাদের শুধু পদস্খলনই হয়নি,

মনস্খলনও হয়েছিল। তাই উমাইয়াদের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

১০। অসঙ্গত গান-বাজনায় অজ্ঞান খলিফাগণ ঃ জোসেফ হেল বলেন—"বায়জানটাইন হতে বিলাস দ্রব্যাদি, মক্কা হতে সঙ্গীত-শিল্পীদের, বসরা ও কুফা হতে মনের খোরাক মদ ও মেয়েদের খলিফাদের দরবারে সরবরাহ করা হত।" দরবারে সর্বপ্রথম প্রেমের কবির আবির্ভাব হল, উমর-ইবন-আবি রাবিয়াকে সর্বপ্রথম প্রেমের কবির আখ্যা দেওয়া হয়, দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালিদের দরবারে পারস্যের ইবন-মুহারিজ, মদীনার মা'বাদ ও মহিলা গায়িকা জামিলা উমাইয়া খলিফাদের মনোরঞ্জন করতেন। রাজদরবারে এই সমস্ত অনৈস্লামিক ঘটনার প্রথম প্রচলন করেছিলেন পাপিষ্ঠা ও দুরাত্মা প্রথম ইয়াজিদ। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ইয়াজিদ রাজদরবারের পাপের ভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাঁর জামিলা, হাবিবা ও সাল্লামাহ্ নামক গায়িকাদের নিয়ে এতই মত্ত ও মগ্ন থাকতেন যে, একদিন ঐ মত্ত অবস্থায় গায়িকা হাবিবার মুখে একটি আঙ্গুর দিলে অতি আকস্মিকভাবেই আঙ্গুরটি গায়িকার গলায় আটকিয়ে তাঁর জীবনাবসান হয় এই ঘটনায় খলিফা শোকাভিভূত হয়ে তিন দিন পর্যন্ত গায়িকার সমাধিকরণ নিষিদ্ধ করে শুধু মাতম করতে থাকেন, এবং ঐ অবস্থায় নিজেও জ্ঞানহারা হয়ে মারা যান। কোথায় খোলাফায়ে রাশেদীনদের মানুষের জন্য জীবনদান, আর কোথায় উমাইয়া খলিফাদের আকণ্ঠ ভোগে অজ্ঞান হয়ে নগ্ন নর্তকীর জন্য জীবনাবসান। কি বিপরীত ছবি।

১১। মদ্যপ খলিফাগণ ঃ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার অপদার্থ পুত্র ও উমাইয়া বংশের অভিশাপ প্রথম ইয়াজিদ দুটো বস্তুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন—'মদ ও নারী।' যখন মদকে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজদরবারে স্থান দিলেন, তখন হতে তাঁকে মদ্যপায়ী ইয়াজিদ বলে অভিহিত করা হত। পরবর্তীকালে এই অধর্ম, অনাচার, ব্যভিচার ও অন্যান্য সকল অনৈস্লামিক কার্যকলাপ মাত্রা ছড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় ওয়ালিদ মাসাত্তা নামে একটি অতুলনীয় প্রমোদ-প্রাসাদ নির্মাণ করে সেটিকে ভোগ বিলাসের যাবতীয় উপকরণে সাজিয়ে তোলেন। কোথাও বিরাট চত্বর, কোথাও বা সেই চত্তরে নগ্ন নর্তকীদের নৃত্য, চারিদিকে সুশোভিত চৌবাচ্চা, কোনটিতে পানি, কোনটিতে মদ। খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ অজ্ঞান ও আত্মহারা হয়ে ঐ মদের চৌবাচ্চায় ঝাঁপ দিয়ে পশুর ন্যায় আকণ্ঠ মদ পান করতেন। খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ কোন এক দিন পবিত্র কোরআন খুললে তাঁর চোখে একটি আয়াত (বাক্য) পড়ে, সেটা ছিল—"সমস্ত বিপথগামী নৃপতিগণ ধবংস হবে।" এইটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে অধম অজ্ঞান খলিফা তীর ধনুকের সাহায্যে পবিত্র কোরআনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। একদিন শুধু আল্লাহর দূতের

পত্রকে পারস্য সম্রাট খসরু অবজ্ঞা ভরে ছিঁড়ে ফেলে দিলে আল্লাহর দূত মহানবী বলেছিলেন—"যে আল্লাহর দূতের পত্রকে ছিঁড়ে দিয়েছে, আল্লাহও অচিরাৎ তার সাম্রাজ্যকেও ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।" পরিণতি তাই-ই হয়েছিল, ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত স্বাধীন পারস্যের কোন চিহ্ন মাত্রই ছিল না—ইসলামের পতাকা তলে শোভাবর্ধন করেছিল। নিশ্চয় আজ মহাঘাতক খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের এই অতীব কুৎসিৎ, অতীব নিন্দনীয়, অতীব অসহনীয় কাজে আল্লাহর দূত মহানবীর (সাঃ) অমর অভিশাপ ছাড়া আশীর্বাদ করে নি। আজ নরাধাম উমাইয়া খলিফা শুধু আল্লাহর দূতের পত্রকেই (হাদিস শরীফ) ছিন্নভিন্ন করল না, ছিন্নভিন্ন করল স্বয়ং আল্লাহর পত্রকেই (কোরআন শরীফকে)। আল্লাহর পত্রকে এইভাবে ছিন্নভিন্ন করাতে উমাইয়া রাজত্বের পতনের শমন উমাইয়া রাজত্বের দ্বারে করাঘাত করতে শুরু করে।

১২। নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত রূপ (হারেম প্রথা প্রচলিত) ঃ পবিত্র কোরআন সজোরে ঘোষণা করেছে—ব্যভিচার করা তো বহু দূরের কথা, "ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না।" কোরআন ঃ ৪ ঃ ১৫, ১৭ ঃ ৩২, ২৩ ঃ ৫, ২৪ ঃ ২। বিবাহে উৎসাহ দেওয়া এবং ব্যভিচারে প্রাণদণ্ড—এই হলো ইসলামের বিধান। উমাইয়া খলিফাগণ সেই ইসলামের কর্ণধার হয়ে নর-নারীর অবৈধ যৌন-মিলনকে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে, যুবক-যুবতীদের প্রকাশ্য পরিণয়ে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে আপন আপন কার্যকলাপের মাধ্যমে এরূপ উৎসাহ দিলেন যে, আপন আপন ক্রীতদাসীগণকেও ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় পরিশেষে খলিফা ওয়ালিদ বাইজানটাইনদের অনুকরণে হারেম প্রথা প্রচলিত করে অন্তঃপুরে নপুংসক প্রহরী রাখার ব্যবস্থা করে অসংখ্য পরামাসুন্দরী ক্রীতদাসীগণকে অপরাপর পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা হতে রক্ষা করেন। জোসেফ হেল বলেন—"উমাইয়া রাজত্বের শেষের দিকে পুরুষ ও রমণীগণের অবাধ মেলামেশা যখন গুপ্তপ্রেম ও ষড়যন্ত্রে পরিণত হল, তখনই আমরা উমাইয়া রাজত্বে হারেম প্রথা ও নপুংসকদের দেখতে পাই।" ভন ক্রেমার বলেন—'ওয়ালিদের সময় হারেম প্রথা প্রচলিত হয় এবং বাইজানটাইনদের প্রথার অনুকরণে তাঁর অন্তঃপুরে নপুংসক প্রহরী রাখার ব্যবস্থা হয়।" এইভাবে বহু অনৈস্লামিক কার্যকলাপ—মদ্যপান, অবৈধ ও অবাধ নারী-সঙ্গ, অশ্লীল গান বাজনা, হারেম ও নপুংসক প্রথা প্রবর্তনের ফলে উমাইয়া খেলাফতের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। মহানবী বলেন—"আমরা কওমের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি

ভয় করি—কাম প্রবৃত্তি ও দীর্ঘ আশার জন্য।" দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফাকেই এ দুটোর যে কোন একটি বা দুটোই যেন ভূতের মত পেয়ে বসেছিল।

১৩। ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন—"একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করা আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ।" তাঁর আবির্ভাব ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের উমাইয়া কর্ণধারগণ ক্রীতদাস প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করে আরব সমাজকে আবার কলুষিত করে মহানবীর ইচ্ছা ও আদর্শকে পদাঘাত করল। এই ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের জন্য মহানবী (সাঃ) জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা—মুয়াবিয়ার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন জিয়াদবিন আবিহ। জিয়াদ ছিলেন দক্ষিণ আরবের তায়েফের এক গণিকার গর্ভজাত মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের ঔরষজাত অবৈধ সন্তান। ঐতিহাসিক আমীর আলী যাঁকে জারজ-সন্তান (the Bastard) বলে অভিহিত করেছেন। এই ভাবে উমাইয়া রাজত্বের জন্মলগ্ন হতেই পুনরায় জন্ম নিল ক্রীতদাস প্রথা, আর প্রভাব বাড়ল গণিকাদের। দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত এমন একজন উমাইয়া খলিফা নেই, যাঁর কোন. উপপত্নী ছিল না। এমন কি এই সমস্ত গণিকাদের গর্ভজাত সন্তানও খলিফার আসন অলংকৃত করে ইসলামের পূত-পবিত্র খেলাফতকে যেন বারবণিতার বাসভূমিতে পরিণত করে কত গণিকার বাসর-শয্যা সাজিয়ে তুলেছিলেন। খলিফা প্রথম আল্-ওয়ালিদের পুত্র খলিফা তৃতীয় ইয়াজিদ একজন ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁর পরবর্তী বংশাবলীতেও ঐ ধারাই অপরিবর্তিত ছিল। এই সমস্ত পাপরাশি উমাইয়া জীবনী শক্তিকেই একদিন গ্রাস করে ফেলে। হিট্টি বলেন—"উমাইয়া সভ্যতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাপসমূহ বিশেষভাবে মদ, নারী, ও গান-বাজনা মরুভূমির সন্তানদের আকৃষ্ট করে, এবং উদীয়মান আরব সমাজের জীবনী শক্তিকে ক্ষীণ ও লীন করে।'

১৪। অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ঃ প্রথম যুগের উমাইয়া খলিফাগণ নৈতিক দিক থেকে পাপী হলেও, রাজ্য পরিচালনায় ও প্রশাসনে ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী, সংগঠক, সমরনীতি বিশারদ, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও কর্মদক্ষ, কিন্তু পরবর্তী যুগের নৃপতিগণ পাপাসক্ত তো ছিলেনই, অধিকন্তু রাজ্য পরিচালনায় একেবারেই অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন। যার জন্য উমাইয়া বংশের শেষোক্ত নৃপতিগণকে গণিকাগারের ম্যানেজার বলা যেতে পারে, যাঁদের দ্বারা রাজ্য পরিচালনা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই অযোগ্য খলিফাদের

অযোগ্যতার জন্যই উমাইয়া বংশের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় ইয়াজিদের (৭২০-২৪) সময় হতেই উমাইয়া রাজত্বের অধঃপতন শুরু হয়। খলিফা হিশাম তাঁর সুযোগ্য প্রশাসনের ও সাংগঠনিক দক্ষতার দ্বারা এই অধঃপতনকে সাময়িকভাবে রোধ করতে সক্ষম হন, কিন্তু হিশামের মৃত্যু এই অধঃপতনকে আবার তরান্বিত করে। ৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে হিশামের মৃত্যুর পর হতে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চারজন খলিফা রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় মারওয়ানকে বাদ দিলে বাকি তিন জন দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৪৪), তৃতীয় ইয়াজীদ (৭৪৪ এপ্রিল-সেপ্টম্বর), ইব্রাহীম (৭৪৪ খ্রীঃ) তাঁদের অযোগ্যতার জন্য অভ্যন্তরীণ অরাজকতা দমনে একেবারেই অক্ষম ছিলেন। এই তিন জন অপদার্থ খলিফার কালে পরিস্থিতি এতই বিপর্যয়পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সক্ষম দ্বিতীয় মারওয়ানও তা দমন করতে অক্ষম হলেন। খলিফাদের এই চরম চারিত্রিক দুর্বলতার প্রভাব থেকে মন্ত্রীগণও নিষ্কৃতি পান নি। তাঁরাও ধীরে ধীরে আপন স্বেচ্ছাচারিতা, গোপন অর্থ লোলুপতা, অকর্মণ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁদের দেখাদেখি সেনাবাহিনীরও গোপন ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নৈতিক অধঃপতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। ফলে সব মিলে খলিফাদের অযোগ্যতা, মন্ত্রীদের অদক্ষতা ও সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা উমাইয়া রাজ্যের পতনকে অনিবার্য করে তুলল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন—দ্বিতীয় ওমরের অসামরিক ও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান নীতির জন্য উমাইয়া সামরিক শক্তি অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সে কথা আদৌ সত্য বলে মানা যায় না। কেননা দ্বিতীয় ওমর সেনাবাহিনীকে দুর্বল করেন নি বরং তাদেরকে আক্রমণাত্মক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থেকে দূরে রেখেছিলেন মাত্র। তাঁর নীতি পরবর্তীকালেও অনুসৃত হলে উমাইয়া বংশ কতকাল রাজত্ব করত তা কে জানে?

১৫। সাম্রাজ্যের বিশালতা : সাম্রাজ্যের বিশালতাও শেষ উমাইয়াদের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপই হল, আরব ভূখণ্ডের বাইরে ইসলাম সর্বপ্রথম প্রসারিত হয় হযরত ওমরের সময়ে। ঐ প্রসারতা আল্-ওয়ালিদের রাজত্বকালে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। চীন-সাম্রাজ্যের সীমান্ত থেকে ইউরোপের পীরিনেজ পর্বতমালা হতে আফ্রিকার কোল পর্যন্ত সুবিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যে শুধু মুসলমানরাই বসবাস করতেন না, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রীস্টান অগ্নি উপাসক পৌত্তলিক প্রভৃতি নানা জাতি, নানা বর্ণ একসাথে পাশাপাশি বসবাস করতেন। উমাইয়া খেলাফতের প্রথম দিকের সুযোগ্য খলিফাগণ অত্যন্ত শক্ত হাতেই

শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী খলিফাগণ শাসনকার্য পরচালনায় একেবারেই অযোগ্যতার পরিচয় দেন। স্পূলার বলেন—"বিজয়ের ফলে যে কোন সাম্রাজ্যের সীমানা সুদূরপ্রসারী হলে আয়তনের জটিলতায় ও ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় শাসক ব্যতীত যে কোন দুর্বল শাসকের আমলে বিচ্ছিন্নতাবাদ উদ্ভব না হয়ে পারে না।" উমাইয়া বংশের শেষ দুর্বল খলিফাদের আমলেও উমাইয়া খেলাফতও এর থেকে মুক্তি পায় নি, এই খেলাফতের শুরু হতেই চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছিল। কিন্তু সুযোগ্য শাসকদের যোগ্য শাসনে সব কিছুই প্রশমিত ছিল—সুযোগ্য খলিফাগণ নানা দিক থেকে বিদ্রোহ ও অসন্তোষকে দূরীভূত করার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি খ্রীস্টান মহিলাদের বিবাহ করেও তাঁদের তুষ্ট করতে, আস্থাভাজন হতে বা পৃষ্ঠপোষকতা করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু সমগ্র উমাইয়া রাজত্বের একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত কোন খলিফাই বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তির একটানা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন নি। একমাত্র তিনিই তাঁর অতি মানবীয় নীতির দ্বারা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই নিকট অজাতশত্রুর গৌরব লাভ করেছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের এই বিশাল আয়তন প্রথম দিকের খলিফাগণের নিকট সুখ ও সম্পদ স্বরূপ ছিল ; দ্বিতীয় ওমরের নিকট ছিল আশীর্বাদস্বরূপ একান্নবর্তী পরিবার, কিন্তু পরবর্তীদের জন্য ইহা হল অভিশাপ।

১৬। উমাইয়া গৌরব-রবির প্রাণনাশ ঃ সমগ্র উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশাল ভাগ্যাকাশে একটি মাত্র মানুষ সূর্যের মত দেখা দিয়েছিলেন—খলিফা দ্বিতীয় ওমর। অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-মারামারি, ষড়যন্ত্র-হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা-পরশ্রীকাতরতা, অশান্তি-অজ্ঞতা, ইত্যাদি সকল কিছুই দূরীভূত হয়েছিল—তাঁরই উদারতায় উন্নত চিন্তায় ও জ্ঞানালোকে, তিনি মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন মুসলমান-অমুসলমানের কলহ, আরব-অনারবের দ্বন্দ্ব, উমাইয়া-হাশেমীর ঝামেলা, মুদারীয়-হিম্মারীয়দের গোত্র বিদ্বেষ, শিয়াদের অসন্তোষ, খারিজীদের বিদ্রোহ, ও আব্বাসীয়দের আন্দোলন। এই সমস্ত কিছুকে শান্ত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন কোন বিশাল সমরায়োজনে নয়, কোন মর্মান্তিক নর হত্যায় নয়, কোন পাপ ও প্রতারণার আশ্রয়ে নয়, মহামানব একটি মাত্র অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, সেটি ছিল তাঁর সরল মনের শান্তি কামনা,—মানব মাত্রকেই ভাই বলে আহ্বান। যাঁর এই অতিমানবিক যাদুদণ্ডে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র গোষ্ঠী-দল সকল কিছু নির্বিশেষে সকলেই হলেন তাঁর মিত্র। তিনি হলেন অজাতশত্রু খলিফা দ্বিতীয় ওমর।

নির্বোধ উমাইয়াগণ চেয়েছিলেন—মহামানব দ্বিতীয় ওমরকে তাঁদের হীন ইচ্ছার দাসে পরিণত করতে, কু-কামনার ও অসৎ বাসনার বাহন করতে, যেহেতু তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশজাত সন্তান। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন ও বুঝতে অক্ষম হয়েছিলেন—মহামানব দ্বিতীয় ওমরের জীবন-উত্তরণ হয়েছিল কত ঊর্ধ্বে, কত উন্নত গগনে, যাঁকে সমগ্র আরব পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন (পঞ্চম সৎ খলিফা) উপাধি দান করেছিলেন, যে উপাধি ইসলামের জগতে অন্য কোন খলিফার ভাগ্যে জোটেনি; সেই অতিমানব, উত্তম পুরুষ, খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্ভেজাল উত্তরসূরী, মহানবীর (সাঃ) প্রকৃত প্রেমিক ও অকৃত্রিম অনুসারী দ্বিতীয় ওমর আপন বংশ উমাইয়াদেরই গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দাইর সীমান নামক স্থানে আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন। খলিফা দ্বিতীয় ওমর খুন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে জখম হল উমাইয়া বংশ, উমাইয়া গোত্রের গৌরব-রবি অস্তমিত হল। ইসলামি সাম্রাজ্য হারাল সূর্যের আলো, ঘনীভূত হল অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। উমাইয়াদের আপন হাতেই তাঁদের পতনের পথ যথারীতি ভাবে প্রস্তুত হল, যথাযথ ভাবে প্রশস্ত হলো।

১৭। আরব দ্বন্দ্বের দ্বার খুলে গেল ঃ খলিফা দ্বিতীয় ওমরকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া রাজত্বের একান্নবর্তী সোনার সংসার যেন ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেল। রাজ্যের চারদিক জুড়ে বিদ্রোহের বলাকা যেন ঝাঁকে ঝাঁকে গগন ভেদী শব্দে কলরব করে উঠল। কলহের এই কলরবকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত করা, ক্ষান্ত করা আর কোন উমাইয়া খলিফার পক্ষেই সম্ভব হয় নি। যে স্বর্গীয় শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ দ্বিতীয় ওমর সৃষ্টি করেছিলেন, সকলকে নিয়ে যে শান্তির নীড় গড়ে তুলেছিলেন তা যেন নরকে রূপান্তরিত হয়ে আবার দ্বন্দ্বের বহু দ্বার খুলে গিয়ে বিশাল উমাইয়া রাজত্বের উত্তরাধিকারীগণকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। এ ধ্বংস-দ্বার খোলার জন্য দায়ী ছিলেন তাঁরাই।

১৮। পক্ষপাতিত্ব।। মুসলমান ও অমুসলমানদের ব্যবধান ঃ উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া তাঁর রাজ্য গড়তে এমন কোন হীন কাজ নেই, যা করেন নি, বা করতে কোন দিন এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেছিলেন, কিন্তু রাজ্য স্থাপনের পর সেই রাজ্যকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করতে তিনি যে রাজনৈতিক প্রতিভা ও মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন তা তুলনাহীন। মুয়াবিয়ার অসাধারণ শক্তি ছিল মানুষ চেনার। তিনি আপন কাজ উদ্ধারের জন্য মুসলমান-অমুসলমান কোন কিছুই দেখতেন না। রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর একটাই লক্ষ্য ছিল—রাজ্য স্থাপন। এই রাজ্য স্থাপনে তিনি মুসলমান ও অমুসলমানকে

সমভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। শাসক হিসেবে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল—সুশাসন। এই শাসন পরিচালনায় তাঁর নিকট মুসলমান ও অমুসলমানের কোন ভেদাভেদই ছিল না। তাঁর নিকট ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের যথাযথ পালন। দ্বিতীয় ওমর তাঁর উদার মন ও উন্নত মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ মাত্রকেই একচোখে দেখেছিলেন। কিন্তু শেষার্ধের উমাইয়া খলিফাগণ মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রাজ্যের শক্তিক্ষয় ব্যতীত আর কিছুই করেন নি।

১৯। আরব-অনারব বৈষম্য ঃ উমাইয়াগণ ছিলেন জাতিতে আরব। কিন্তু উমাইয়া রাজ্য বিস্তৃত হল বহু এলাকা জুড়ে। উমাইয়া রাজত্বের প্রথম অর্ধের খলিফাগণ কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে রাজ্য পরিচালনা করায় যথেষ্ট কৃতকার্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাঁরা নিজেদের যেমন রাজা মনে করতেন, তেমন রাজ্যের বাকি সকল অধিবাসীকেই প্রজা মনে করতেন। এখানে কোন রকম ভেদাভেদ করতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন—একটি বিরাট রাজ্য তার বিশালতাকে নিয়ে ততক্ষণেই টিকে থাকতে পারে, যতক্ষণ রাজ্যের প্রজাবৃন্দের আন্তরিকতা সে পাবে, পাবে তাদের সকলেরই সাহায্য শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি। একথা তাঁরা মনে প্রাণে জানতেন যে কোন বিশাল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সকলেরই শুভেচ্ছাতে, শুধু সামরিক শক্তিতে নয়, দুর্বুদ্ধিতেও নয়, দমনেও নয়, পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ সাম্রাজ্য রক্ষার এই শাশ্বত নীতিটি একেবারেই ভুলে অনারব প্রজাবৃন্দকে করলেন দারুণ অসন্তুষ্ট। অসংখ্য মানুষের এই নির্বিকার মনকষ্ট ও মর্মভেদী অসন্তোষ উমাইয়া খলিফাগণের জন্য অভিশাপ ব্যতীত কিছুই ছিল না ; ভন ক্রেমার বলেন—"অন্য যে কোন ঘটনা অপেক্ষা শাসিত প্রজাদের প্রতি উমাইয়া খলিফাগণের বিমাতৃসুলভ আচরণ উমাইয়া বংশের অস্তিত্বকে অধিক বিপদ-সঙ্কুল করে তুলেছিল, ইহা এমন একটি ভয়াবহ সামাজিক বিদ্রোহের সূচনা করে, যা শুধু উমাইয়াগণের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত আরব শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।"

২০। আরব-মুসলমান ও অনারব মুসলমানের ব্যবধান ঃ ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় নীতি—মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। সত্যিকারে ইসলামের আবির্ভাবও ঘটেছিল মানুষে মানুষে ভেদের বিলোপ সাধন করার জন্য। মানুষের জন্মগত এবং শাশ্বত অধিকার তাকে পাইয়ে দেওয়া—এই যার মূল নীতি, এই যার বক্তব্য ও লক্ষ্য, সেই ইসলাম কি করে আরব মুসলমানে ও অনারব মুসলমানে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে? একথা যেমন অবান্তর তেমনি অসম্ভব ও অলীক। ইসলামের নামে যাঁরা একথা প্রচার করেন, তাঁরা ইসলামের ছদ্মবেশী ঘোর শত্রু।

প্রথম হতে শেষাবধি উমাইয়া খলিফাগণ এই দোষ হতে খুব একটা মুক্ত ছিলেন না। উমাইয়া খলিফাগণ ইসলামের সাম্য-মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে কোন দিনই তাঁরা আরব ও অনারব মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারতেন না। বিশাল উমাইয়া রাজত্বের বিস্তৃত অঞ্চলে আরব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তথাকার নবদীক্ষিত অনারব মুসলমানগণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা অবিচারের ও অসাম্যের সম্মুখীন হয়ে বস্তুত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিগণিত হলেন। একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসনকাল ছিল এর ব্যতিক্রম। বিভিন্ন অঞ্চলের অনারব মুসলমানগণ মুসলমান হয়ে হাজ্জাজের কবলে পড়ে জিজিয়া ও খারাজ দিতে বাধ্য হলেন। আবার আরবদের মত কোন নির্দিষ্ট ভাতাও নিয়মমত তাদের ভাগ্যে জুটত না। পারস্যবাসী মুসলমানগণ ইসলামের সেবায় ধন-জন-মান-প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেও আরব মুসলমানের সম সারিতে দাঁড়াবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হলে আরব মুসলমানদের এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তাঁদের মধ্যে যত বড়ই সমর-বিশারদ, সেনা বা যোদ্ধা থাকুন, তাঁকে পদাতিক বাহিনীতেই যোগদান করতে হত। যেহেতু তিনি অনারব-মুসলমান। অথচ স্বয়ং ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (সাঃ) মানুষকে তার আপন গুণের জন্যই মর্যাদা দিয়ে গেছেন, তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে আজও মসজেদে ইমামের পুত্রের ইমাম হওয়ার কোন অধিকার নাই, আপন যোগ্যতা ব্যতীত। বংশ-কূল-গোত্র-গোষ্ঠী উর্ধ্বে তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন—একজন নিগ্রো-কাফ্রীকেও মেনে নিও, তার আপন যোগ্যতার জন্য। অথচ নির্বোধ উমাইয়া খলিফাগণের অনেকেই সেই মহানবী (দঃ)-কে ভাঙ্গিয়ে আরব-অনারব মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান গড়ে তুললেন এই বলে—তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় দূতকে প্রেরণ করেছেন, সুতরাং তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। এই ভ্রান্ত ধারণা, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস উমাইয়া খলিফাগণের সর্বনাশের মূল ছিল। এ পাপ ছিল তাঁদের ইচ্ছাকৃত, তাঁরা ছিলেন জ্ঞানপাপী। তাই আরব-মুসলমান ও অনারব মুসলমানের মধ্যে স্বয়ং মহানবীকেও (দঃ) ব্যবধানের হেতু স্বরূপ খাড়া করে তাঁকেও ভাঙ্গিয়ে খেতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁদের পতন তাঁদের এ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত ফল।

২১। হাশেমী ও উমাইয়া বংশদ্বন্দ্ব ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের পূর্ব হতেই কোরাইশ বংশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—হাশেমী ও উমাইয়া। এই দুই গোত্রের কলহ প্রবল গতিতে প্রবাহিত ছিল। কারণে-অকারণে

তাঁরা সামান্য ব্যাপারকে নিয়ে অসামান্য কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন। চলতে থাকত বছরের পর বছর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। মহানবী (সাঃ) মক্কায় সর্বাপেক্ষা বেশি বাধা পেয়েছিলেন উমাইয়াগণের দ্বারা। তাঁরা মহানবীকে (সাঃ) সমূলে ধ্বংস করার সমস্ত পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন, এমন কি শেষের তিন বছর তাঁকে একঘরে বা সমাজ-চ্যুতও করেছিলেন। সর্বশেষ প্রচেষ্টা ছিল ১৪ জন বীর যুবকের দ্বারা তাঁকে বধ করা। তাই মহানবী (দঃ) আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করে দূর ইয়াসরেবে (মদীনায়) হিজরত করেন। উমাইয়াগণের মহানবীর (দঃ) প্রতি যত আক্রোশ ছিল, তা অপেক্ষা অনেক বেশি ঘৃণা বিদ্বেষ ও হিংসা এবং ঈর্ষা ছিল হাশেমী বংশীয় নবীর প্রতি। পরবর্তীকালে উমাইয়া প্রধান আবুসুফিয়ান উড়তে না পেরে পোষ মানেন, এবং মক্কা পতনের পর বশ্যতা স্বীকার করেন, আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু এঁরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। মহানবীর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত কাল শেষ হতে না হতেই হযরত ওসমানের সময় হতেই আরম্ভ করলেন আপনাদের চির স্বভাবজাত কার্যকলাপ। যার ফলশ্রুতিতে হল হযরত ওসমানের জীবনাবসান। এই জীবনাবসানকে কেন্দ্র করেই উমাইয়াদের ভাবী বৃহত্তর খেলার সূচনা। ফলে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী শহীদ হলেন, তাঁর প্রথম পুত্র ইমাম হাসান বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্রে শহীদ হলেন, দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হোসেনও করুণভাবে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হলেন। এর পূর্বেই খেলাফত উমাইয়াগণের হস্তগত হল। আরম্ভ হল হাশেমীদের প্রতি অবিচার, অত্যাচার, অভিশাপ। এমনকি মসজেদে জুম্মার নামাযে খুৎবা (বক্তৃতা) শেষে হাশেমীদের উপর অভিসম্পাত দেওয়া আরম্ভ হল— এই ঘৃণ্য প্রথার রহিত করেছিলেন দুজন উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমর ও হিশাম। হাশেমীদের প্রতি উমাইয়াদের এই ঘৃণা-বিদ্বেষ; হিংসা, অবিচাব, অত্যাচার এবং নানা অনৈস্লামিক কার্যকলাপ আরবের মাটিতে জন্ম দিল—শিয়া ও সুন্নী, খারেজী-মাওয়ালী, মুদারীয় ও হিমারীয় গোত্রের তীব্র বিরোধিতা এবং শেষ পর্যন্ত আববাসীয় আন্দোলন। নবীবংশ হাশেমীদের একেবারেই নির্মূল করতে গিয়ে উমাইয়াগণ যে পথ ধরলেন, যে পন্থা অবলম্বন করলেন, ঐ পথই ছিল উমাইয়াদের পতনের পথ। উমাইয়া পথিকরা ছিলেন জ্ঞানহারা, পন্থা ছিল তাঁদের ভুলে ভরা। এই ভুলেরই ফুটন্ত ফুল—আববাসীয় রাজত্ব!

২২। হিমারীয় ও মুদারীয় গোত্র-কলহ ঃ পূর্বে মুয়াবিয়া অধ্যায়ে হিমারীয় ও মুদারীয় গোত্রের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত হিমারীয়গণ দক্ষিণ

আরবের অধিবাসী ছিলেন এবং মুদারীয়গণ উত্তর আরবের। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই উত্তর আরবের মুদারীয়গণের অনেকেই ইরাকে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানে তাঁরা তাইগ্রীস নদীর তীরে দিয়ার-ই-রাবিয়া (গোত্রের বাসভূমি) এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে 'দিয়ার-ই-মোজার (মোজারী গোত্রের বাসভূমি) প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং দক্ষিণ আরবের হিমারীয়গণের অনেকেই সিরিয়ায় বসবাস করতে থাকেন। এঁদের প্রধান গোত্র ছিল কালব। খোরাসানের অধিকাংশ অধিবাসী উত্তর আরব হতে আগত ছিলেন।

বহুকাল থেকে এই দুই গোত্র নানা কলহে, বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িত ছিলেন। মাঝে মাঝে এই কলহ মারাত্মক রূপ ধারণ করত। মহানবীর (দঃ) আবির্ভাবের পর হতে খোলাফায়ে রাশেদীন-এর সময় পর্যন্ত এই কলহ বন্ধ ছিল। পরে এই কলহ পুনরায় মারাত্মকভাবেই মাথাচাড়া দেয়। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফাই এই সুপ্ত কলহে ইন্ধন দিতেন আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে। একমাত্র খলিফা হিশাম ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফাই মুদারীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গোত্রের মধ্যে ভয়াবহ ঝগড়ার সূচনা হত। যেমন একজন মুদারীয় একজন হিমারীয় গোত্রের বাগান হতে একটি তরমুজ চুরি করলে ভীষণ যুদ্ধ বেধে যায়। ঘটনাগুলো এই রূপ নগণ্যই ছিল। কিন্তু খলিফাগণ এ গুলোর একটা মীমাংসা করে দেওয়ার পরিবর্তে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উভয় দলকে প্ররোচনা জোগাতেন। ফলে এই ঝগড়া উমাইয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তখন উমাইয়া খলিফাগণ যে আগুন নিজ হাতে ছড়ালেন, তা নির্বাপিত করার শক্তি হারিয়ে ফেললে অবস্থা হয়ে ওঠে ভয়াবহ। রাজ্যের অনিবার্য পতন যখন ঘনিয়ে এল তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন, এ আগুন নিয়ে খেলার পরিণতি কি ভীষণ। আরবে নানা দলের মধ্যে প্রধান ছিল দুটি দল— মুদারীয় ও হিমারীয়। এই দুটির আওতাতে সকলেই পড়ত। সুতরাং এদের সহাবস্থানের উপর নির্ভরশীল ছিল সমগ্র দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার উন্নতি, আবার এই দুটির অশান্তিতে দেশও অশান্ত। অধিকাংশ উমাইয়া খলিফা শুধু সামরিক সুবিধার জন্য দেশের এই দুই প্রধান শক্তিকে সংগ্রামে নামিয়ে নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। জগতের ইতিহাস ও অতীতের বহু ঘটনা এর জ্বলন্ত সাক্ষী— ঝগড়া-বিবাদ-কলহ-বিদ্বেষ-হিংসা বাধিয়ে কোনদিনই কেউ শেষাবধি সুফল পেতে পারে না, এবং বিপরীতটাই ঘটতে দেখা যায়। অদূরদর্শী উমাইয়াদের ভাগ্যেও তাই ঘটল। সুতরাং পতন ছিল তাঁদের প্রাপ্য বস্তু।

২৩। খারিজীদের বিরোধিতা ঃ খারিজীদের উত্থান ও মূল সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের মুয়াবিয়া অধ্যায়ে ও ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড— 'সৎ খলিফাগণে'র চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। খারিজীগণ আয়রাকী ও সুবাইয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতারিত হয়ে হযরত আলী যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রকারান্তরে বাধ্য হলে তাঁর ১২,০০০ সৈনিক দ্বিমত পোষণ করে আলীর সেনা বাহিনী পরিত্যাগ করে, পরবর্তীকালে এঁদেরকেই খারাজ বা খারিজী নামে অভিহিত করা হয়। উমাইয়া রাজত্বের সূচনা হতে শেষাবধি এই খারিজী দল মহানবীর প্রদর্শিত পথ—সত্য ও ন্যায় বিচারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। এই খারিজী দল সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতে প্রবলভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উমাইয়াদের তিনটি জিনিসকে কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেন নি—(১) বলপূর্বক ছলে-বলে-কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতায় খেলাফত দখল, (২) নবী-বংশের প্রতি অবমাননা ও অভিসম্পাত, (৩) খেলাফতের পার্থিবকরণ অর্থাৎ গণতন্ত্রমুখী খেলাফতের রাজতন্ত্রীকরণ। সমাজকে আবার পঙ্কিল মুক্ত করতে, উমাইয়াদের কবল হতে রক্ষা করতে খারিজীগণ এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে জিয়াদ-ইবন-আবিহ্‌-এর মত অত্যাচারী, হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের মত নজীরবিহীন নিষ্ঠুর ব্যক্তি নানা নির্যাতন ও দিবারাত্রি রক্তপাত করা সত্ত্বেও নিটোল ও নিখুঁত খারিজী বিদ্রোহকে নির্মূল করতে সক্ষম হন নি। যেখানেই দমনের উচ্চ খড়্গ তুলে ধরেছেন, সেখানেই বেধেছে ভয়াবহ ও ভীষণ দ্বন্দ্ব। বহু ঐতিহাসিকের মতে নিষ্ঠুর হাজ্জাজ পূর্বদেশীয় শাসনকর্তা রূপে অতি নির্মমভাবে ১,১২,০০০ মানুষকে হত্যা করেও উমাইয়া বিরোধিতাকে প্রদমিত করতে পারেন নি। বরং এর ফল হল বিপরীত, এই নজীরবিহীন নৃশংসতা ও বর্বরতার জন্য দেশের সাধারণ মানুষও উমাইয়াদের থেকে দূরে সরে গেলেন, ছোট বড় সমস্ত বিরোধী শক্তিগুলো একে একে একত্রিত হল। সকলের সমর্থনে ও শুভেচ্ছায় খারিজী দল ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় হল শক্তিশালী। সকলের সহানুভূতি-পুষ্ট এই শক্তিশালী দলের সর্বশেষ সমর্থন লাভ করলেন আব্বাসীয়গণ তাঁদের ঐতিহাসিক আব্বাসীয় আন্দোলনে, যে আন্দোলন উমাইয়া শক্তির প্রতি শেষ মৃত্যুবাণ হানল।

২৪। শিয়াদের বিরুদ্ধাচরণ ঃ উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ—নবী বংশের প্রতি অবমাননা, অত্যাচার, নির্যাতন। প্রথম উমাইয়া খলিফাগণ মুয়াবিয়া ও তাঁর পুত্র ইয়াজীদ হযরত আলী ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্যাতন করেন, শিয়া সম্প্রদায় তাকে

কোন দিনই সহ্য করা তো দূরের কথা, ক্ষমার চোখেও দেখেন নি। এই অনুশোচনাকারী বা প্রতিশোধ গ্রহণকারী দলের নেতৃত্ব দিলেন মুখতার, যদিও মুখতার উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণ হারান। তবুও সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তিনি যে মক্কা ও মদীনার প্রাধান্য ও পবিত্রতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মহানবীর (সাঃ) বংশধরদের প্রতি অভিসম্পাত অবলুপ্তির জন্য ও তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর জন্য তিনি যে সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর সাধনা ও সংগ্রাম এবং জীবনদান ব্যর্থ যায় নি। এমন কি কারবালার ঐতিহাসিক কসাই হোসাইনের হত্যাকারী উবাই-দুল্লাহ্-বিন-যিয়াদের প্রতি প্রতিশোধার্থে তাঁর যে প্রতিজ্ঞা ছিল, তা তিনি পূর্ণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ কারবালা প্রান্তেই উবাইদুল্লার জীবনাবসান হয়। তাঁরই ধারা পরবর্তীকালে অনুসৃত হল—মহম্মদ-ইবন-আল-হানাফিয়া দ্বারা ও বিবি ফাতেমার বংশোদ্ভূত অসংখ্য অনুচর এবং হযরত আলীর অসংখ্য সমর্থক দ্বারা। উমাইয়াগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত পাপে ক্ষুব্ধ-নির্যাতিত ও বঞ্চিত শিয়াগণ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় কোরে প্রথম ইরাকে শিয়া বীজটিকে রোপণ করে পরে ইরানে ঐ শিয়া চারাগাছটিকে সযত্নে গড়ে তোলেন। তখন মাওয়ালী অর্থাৎ অনারব (বিশেষ করে ইরানি) মুসলমানগণ এই শিয়া শক্তিকে মূলধন করে উমাইয়াদের বিশাল সাম্রাজ্যের বিরাট আধিপত্যকে একেবারেই বিধ্বস্ত করে তোলেন।

২৫। আব্বাসীয় আন্দোলন ঃ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আববাসীয়গণ বহুদিন হতে একটি মহাক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন। যখন সমগ্র উমাইয়া রাজত্ব জুড়ে বিদ্রোহের বলাকা কলরব করে উঠল, যখন কলহ, বিদ্রোহ, বিরোধিতা, অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতায় সারা দেশ ছেয়ে গেল, তখন আববাসীয়গণ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই মহাক্ষণটি যেন হাতে পেলেন। মহানবীর (সাঃ) আপন চাচা আবুল আববাসের বংশধরগণ এই সুযোগে খেলাফতের দাবী করলেন। তাঁদের এই দাবী ছিল—হাশেমী বংশ ভিত্তিক। কেননা হযরত আলী ও আবুল আববাস উভয়ই ছিলেন হাশেমী বংশোদ্ভূত। আববাসীয়গণের প্রথম দিকে প্রচারের গুপ্ত ঘাঁটি ছিল—মর্মর সাগরের তীরে 'হুমাইমা' নামক একটি অতি অখ্যাত গ্রাম। অনারব মুসলমানগণ পারস্যের মুসলমানগণ আরব মুসলমানের ন্যায় সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা না পেয়ে নিজদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বা মুসলমান বলে মনে করত। বিদ্রোহ্ এখানেই দানা বাঁধল। গ্রুনিবাম বলেন—"ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে মাওয়ালীগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ

করেনি, যদিও মহানবীর গণতান্ত্রিক বাণীতে তাদের সম অধিকার দানের কথা ঘোষিত ছিল। অনারব মুসলমান (মাওয়ালীগণ) যোদ্ধাগণ অন্যান্য আরব মুসলমান যোদ্ধাদের ন্যায় অবসর ভাতা পেতেন না। তাঁরা যেন দিন-মজুর ছিলেন। তাঁরা যত বড়ই যোদ্ধা হন, কোন দিনই পদাতিক ব্যতীত অশ্বারোহী যোদ্ধা হতে পারতেন না।" সৈনিকের প্রতি এই অসম্মান ও অবমাননা তাঁদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তাই হিট্টি বলেন—"এই সমস্ত অসন্তুষ্ট অসুখী নব দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও আব্বাসীয় মতবাদের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।" ইরাকের দ্রুতগামী শিয়া মতবাদ, পারস্যের খরস্রোত মাওয়ালী মতবাদ একত্রে খোরাসানে গিয়ে যেন এক মিলন মোহনায় আব্বাসীয় মতবাদের জন্ম দিল। বিদ্রোহের এই গতিকে বেগবান করল খারিজী দল, বিশালতা দিল—মুদারীয় ও হিমারীয় দল। সর্বশেষে ইরাকের শিয়া, পারস্যের মাওয়ালী, হিজাজের খারিজী, উত্তরের মুদারীয়, দক্ষিণের হিমারীয় সকল বিদ্রোহ এক সাথে মিলিতভাবে সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী বেগবান ধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়ে বিদ্রোহের এক ঐতিহাসিক মিলন মোহনায় মিলিত হল, যার নাম আব্বাসীয় আন্দোলন, সৃষ্টি করল—মহাসাগরের, রূপ নিল মারাত্মক, ডুবিয়ে দিল উমাইয়া-রণতরী, ধ্বংস হল উমাইয়া খেলাফত, স্তব্ধ হল আরব জাহান।

বার্নার্ড লুইস বলেন—"যে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় উমাইয়া শাসনের পতন হল, তা ছিল—আরব গোত্র সমূহের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা।" হিট্টি বলেন—"শিয়া ও খোরাসানীদের এবং আব্বাসীয় শক্তির সমন্বয়ে উমাইয়া রাজত্বের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল।"

অনারব মুসলমান ইরাকী আবু মুসলিম উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যে প্রচার আরম্ভ করেন তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—আবু মুসলিমের দূরদর্শিতা কর্মদক্ষতা বিচক্ষণতা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও রণ-নৈপুণ্য ব্যতীত আব্বাসীয়গণ এত সত্বর খেলাফতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারতেন না। সমগ্র সাম্রাজ্যের বিদ্রোহের বহুমুখী বিবিধ ধারাকে আপন উদ্দেশ্য সাধনে একমুখী করতে তিনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তুলনাহীন। তাই আমীর আলী বলেন—"মুদারীয় এবং হিমারীয় গণকে সুকৌশলে আপন কাজে লাগাবার জন্য ম্যাকিয়াভেলীর মত দূরদর্শিতা আবু মুসলিমের ছিল।" তিনি আব্বাসীয় বংশের নেতা ইব্রাহীম-ইবন-মহম্মদ-বিন-আলী কর্তৃক তাদের প্রচারক ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অসামান্য সফলতার পরিচয় দিয়ে খোরাসানে শোক-নির্দেশক কাল পতাকা উড্ডীন করে প্রকাশ্য

বিদ্রোহ ঘোষণা করে মার্ভ দখল করেন। অতঃপর দ্বিতীয় মারওয়ান কর্তৃক ইব্রাহীম নিহত হলে বিদ্রোহের গতিকে আরো বেগবান করে ইরাক দখল করেন। অতঃপর ৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে কুফার মসজেদে আবুল আব্বাসকে খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়। কুফা খোরাসান মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানের পতনের পরই উমাইয়াদের শেষক্ষণটি ঘনিয়ে এল। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী জাব নদীর পূর্ব প্রান্তে আব্বাসীয় প্রতিনিধি আবু মুসলিম ও পশ্চিম প্রান্তে উমাইয়া শেষ খলিফা যেন শেষ মুহূর্তের জন্য সম্মুখ সমরে মুখোমুখি দণ্ডায়মান। এ যেন প্রকৃতির মহাবিধানেই পশ্চিম তীরেই উমাইয়া বংশের স্বাধীনতার-রবি চির অস্তমিত হল। আরম্ভ হল আব্বাসীয় যুগ।

সর্বমোট (৬৬১—৭৫০ খ্রীঃ) ৯০ বছরের রাজত্বকালে উমাইয়া খলিফাগণ অনেক ভাল কাজও করেছেন। কিন্তু ভাল কাজ অপেক্ষা শেষের দিকে মন্দ কাজের পাল্লা ভারী হওয়ায় সমগ্র দেশবাসী কর্তৃক উমাইয়াদের ভাগ্যে পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কারই জুটল। পৃথিবীর যে কোন রাজ-বংশকে, যে কোন শাসনকালকে ধবংস করার জন্য, শেষ করার জন্য উমাইয়াদের এই ২৫টি অকাজের কয়েকটিই যথেষ্ট।

উমাইয়া রাজ্য ধ্বংস হলো, আব্বাসীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু মহানবীর পবিত্র খেলাফত আর ফিরে এলো না। উমাইয়াগণ পবিত্র খেলাফতের পতন ঘটিয়েছিলেন রাজ্য লাভের জন্য। পবিত্র খেলাফতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়ই। আবার অব্বাসীয়গণ উমাইয়াদের পতন ঘটালেন সেই রাজ্য লাভের জন্যই, অন্য কিছুই না। সুতরাং এগুলো ছিল রাজনীতির জুয়াখেলা বা দাবাখেলা মাত্র।

মানুষ খলিফা শুধু খাদেম খোদার
এ কথা জানে না যেই নহে জনতার।
শেখাইলে মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
গড় নাই রাজতন্ত্রে মানব-সমাজ
শিখাইলে গণতন্ত্রে সভ্য-সমাজ।

।। দশম অধ্যায় ।।

উমাইয়া খেলাফতে শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-জীবন

প্রধান দিক

[সামরিক বিভাগ—যোগাযোগ বিভাগ—রাজস্ব বিভাগ—বিচার ও ডাক বিভাগ—রেজিস্ট্রি বিভাগ—শাসন ব্যবস্থায় আরবী ভাষা—আরবী মুদ্রার প্রচলন—প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা।]

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) গণতন্ত্র ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। তাঁর নীতি অনুসরণ করে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন—খোলাফায়ে রাশেদীন—সৎ খলিফাগণ । তখন রাজ্য গঠনে ছিল — গণতন্ত্র এবং রাজ্য পরিচালনায় ছিল অনাড়ম্বর জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু উমাইয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এবং অনাড়ম্বর জীবনের পরিবর্তে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। মজলিস-উস-সুরা অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন প্রথা রহিত হল। শাসন-ব্যবস্থায় ও সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হল।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ঃ মুয়াবিয়া শুধু যে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থারও প্রচলন করেছিলেন। এবং এই শাসন-ব্যবস্থা পরবর্তী প্রায় সকল উমাইয়া খলিফাই মেনে চলেন। শেষের অধ্যায়ে কতিপয় অযোগ্য, অপদার্থ খলিফা শাসন-নীতির এই প্রয়োগ ঠিক মত করতে না পারায় উমাইয়া রাজত্বের পতন তরান্বিত হয়েছিল। উমাইয়া রাজত্বের কেন্দ্রীয় কাঠামো ছিল অত্যন্ত শক্ত, সমগ্র প্রশাসন-যন্ত্রকে মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল ঃ

১। দিওয়ান-আল-জুনদ — সামরিক বিভাগ।

২। দিওয়ান-আল-রাসায়েল — যোগাযোগ বিভাগ।

৩। দিওয়ান-আল-খারাজ — রাজস্ব বিভাগ।

৪। দিওয়ান-আল-বারিদ — ডাক বিভাগ।

৫। দিওয়ান-আল-খাতাম — রেজিস্ট্রি বিভাগ।

১। **দিওয়ান-আল-জুনদ ঃ** খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় হতে উমাইয়া শেষ খলিফা পর্যন্ত সকল খলিফাই সামরিক বিভাগের সর্বময়কর্তা ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরও এই দায়িত্ব পালন করতে হত। খলিফা হতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পর্যন্ত সকলেরই প্রধানত তিনটি দায়িত্ব ছিল—সামরিক দায়িত্ব, প্রশাসনিক দায়িত্ব ও ধর্মীয় দায়িত্ব। এইজন্যই বলা হয় ইসলামিক স্টেটের কর্ণধারকে মুসলিম হতে হবে, কেননা তাঁকে ধর্মীয় দায়িত্বও পালন করতে হবে। উমাইয়া খেলাফতে দিওয়ান-আল্-জুনদের কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। খলিফা প্রথম ওমরের সময় সামরিক বেতন ভুক্ত কর্মচারীগণ নিয়মিত ভাতাও পেতেন। আরব মুসলমান ও অনারব মুসলমানের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। উমাইয়া খেলাফতে আরব মুসলমানদের বাইতুল মাল হতে দেওয়া এই ভাতা বন্ধ করা হয়। খলিফা হিশামের সময় এই নিয়মের আমুল পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি শুধু যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যই সামরিক ভাতার ব্যবস্থা করেন। এবং এই ভাতা তাঁদের বেতন হিসেবে পরিগণিত হয়। এই নীতি এত কঠোরভাবে পালিত হলো যে, কোন যুবরাজও যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে তাঁকেও ভাতা দেওয়া হত না। পক্ষান্তরে কোন দীনাতিদীন ভিখারীও যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত তাকেও সম ভাতা দেওয়া হত।

২। **দিওয়ান-আল্-রাসায়েল ঃ** সমন্বয়কারী যোগাযোগ বা প্রচার বিভাগ ঃ মহানবী (দঃ)-এর সময় হতে খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করছি—তাঁদের চিঠি-পত্র, আদেশ-নিষেধ, প্রভৃতি নির্দেশাবলীকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার জন্য কিছু কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। কিন্তু উমাইয়া রাজত্বের সময় যখন রাজ্যের বিশালতা বহু গুণে বেড়েযায়, তখন এই কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি পৃথক স্বয়ং সম্পূর্ণ বিভাগের প্রয়োজন হলে উমাইয়া খলিফাগণ এই বিভাগের প্রবর্তন করেন। এই বিভাগের মূল দায়িত্ব ছিল খলিফার নির্দেশকে প্রচার করা ও প্রতিটি প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া, তাই এই বিভাগকে প্রচার বিভাগ বলা যায়।

৩। **দিওয়ান-উল-খারাজ ঃ** খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় হতেই রাজস্ব বিভাগ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল। দুটি বিভাগকে তাদের অসাধারণ গুরুত্বের জন্য খলিফা তাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তার আওতা হতে সরাসরি নিজের অধীনে রেখেছিলেন, একটি রাজস্ব বিভাগ অন্যটি বিচার বিভাগ। যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী রাজস্ব সচিবের অধীনে পরিচালিত হত। তিনি রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব রক্ষা করতেন। এই রাজস্ব আদায়ের কয়েকটি

উৎস ছিল—(১) যাকাত, (২) খারাজ, (৩) জিজিয়া, (৪) আল ফে, (৫) আল-ওশব, (৬) উশুর, (৭) গনিমাহ ইত্যাদি। যাকাত — ইসলামের পঞ্চস্তরের একটি, এর উদ্দেশ্য ছিল গরিবকে সাহায্য করা। খারাজ — ভূমির রাজস্ব বা খাজনা। খলিফা প্রথম ওমর জমির জরিপের দ্বারা এই ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে প্রবর্তন করেন। জিজিয়া—ছিল অমুসলমানদের উপর সামরিক কর। যাঁরা যুদ্ধ করতে অসম্মত ছিলেন তাঁরাই শুধু এই কর দিতেন। আল-ফে—মালিক বিহীন জমির আয়। আল-ওশর—সেচযুক্ত জমির কর, উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{১০}$ অংশ। আল-উশুর—বাণিজ্যিক কর। গানিমাহ—যুদ্ধলব্ধ ধন।

৪। দিওয়ান-আল-বারিদ ঃ খলিফা প্রথম ওমর সর্বপ্রথম ডাক বিভাগের প্রচলন করেন। আর এই বিভাগকে পূর্ণ রূপ দেন উমাইয়া রাজত্বের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া। প্রথম রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এই বিভাগ প্রচলিত হয়, পরে জনসাধারণের সুবিধার জন্যও এই বিভাগের কাজকে সম্প্রসারিত করা হয়। ঘোড়া ও উটের মাধ্যমে দূর হতে দূর অঞ্চলে ডাক প্রেরণ করা হত। ১২ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলীর ব্যবস্থা ছিল। যাতে দ্রুততর গতি হ্রাস না হয়। খলিফা আব্দুল মালিকের সময় এই বিভাগের আমূল পরিবর্তনসহ প্রভূত উন্নতি হয়।

৫। দিওয়ান-আল-খাতাম ঃ মহানবীর (সাঃ) সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যখন তিনি কোন চিঠিপত্র কোন রাজা-বাদশার নিকট পাঠাতেন, তখন সেটাকে খাতাম বা সীল করে দিতেন। তখন হতেই এটা প্রচলিত। খোলাফায়ে রাশেদীন তাকে প্রাথমিক রূপ দেন। পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া এই বিভাগকে খুবই শক্তিশালী করেন। খলিফার যাবতীয় নির্দেশাবলী যাতে কোন প্রকারে নকল হতে না পারে তার জন্য ঐগুলোকে সীল করা হত। এবং খলিফার সমস্ত নির্দেশাবলী সীলমোহর দ্বারা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট প্রেরিত হত এবং সদরদপ্তরে রক্ষিত থাকত।

বিচার বিভাগ ঃ বিচার-বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকত। এই বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজীদের দ্বারা পরিচালিত হত। খলিফাগণ মজলিস-উস-শূরা বা উপদেশ মণ্ডলী দ্বারা সতর্কভাবে অত্যন্ত চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কাজী নিযুক্ত করতেন। বিচার হত পবিত্র কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী। তাই বিচারকগণ পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি হতেন। তখনকার দিনে ওয়াকফ্ সম্পত্তি বা দেবত্ব কাজীদের তত্ত্বাবধানে ছিল। এই অসামান্য চরিত্রের কাজীগণ বিচারে স্বয়ং মহামান্য খলিফাকে এতটুকুও মুক্তি দিতেন না। তাই আজও প্রবাদ আছে কাজীর বিচার। অমুসলমানদের জন্য তাঁদের

আপন আপন ধর্মমতে তাঁদেরই সুপণ্ডিতগণ তাঁদের বিচারকার্য নিষ্পত্তি করতেন। এখানে স্বয়ং খলিফারও কিছুই করার ছিল না। বিচার সম্পর্কে সর্বসময় তাঁরা মহানবী (দঃ)-এর একটি কথা স্মরণ রাখতেন—"৬০ বছরের অতিরিক্ত উপাসনা অপেক্ষা একটা ন্যায়বিচার উত্তম।"

শাসন ব্যবস্থায় আরবী ভাষা ঃ মহানবী (সাঃ) হতে আরম্ভ করে খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত এবং মুয়াবিয়া হতে প্রথম আল-ওয়ালিদ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারি ভাষা ছিল তাদের আপন আপন আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা। উমাইয়া খেলাফতে খলিফা আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম আরবী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হতে গ্রীক, পাহ্লবী, সিরীয়ক ও কপটিক ভাষাগুলো প্রশাসন হতে বিদায় নিল। একদিকে আরবী ভাষার বহু উন্নতি সাধিত হল, সকল প্রাদেশিক সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থাও সহজ হল।

আরবী মুদ্রার প্রচলন ঃ প্রশাসনে আঞ্চলিক ভাষা যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি আঞ্চলিক মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। তবে আঞ্চলিক মুদ্রা বলতে রোমীয় ও পারসিক মুদ্রাই প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া প্রথম দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) প্রচলন করেন। কিন্তু উমাইয়া খলিফা মালিকই প্রথম বিশুদ্ধ আরবী মুদ্রার প্রচলন করেন। এর জন্য দামেস্ক ও অন্যান্য শহরে প্রয়োজনমত টাকশালও নির্মাণ করেন। মুদ্রার উপর কোন খলিফার ছবি বা ছাপ থাকত না। সেখানে শুধু কলমা (ইসলামের স্বীকৃতি বাক্য—আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়) ও টাকশালের নাম থাকত।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ঃ উমাইয়া খেলাফতে সমগ্র সাম্রাজ্যকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেক বিভাগকে আবার কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়, প্রদেশগুলোকে জেলা ভিত্তিক ভাবে ভাগ করা হয়। এইভাবে জেলা থেকে আরম্ভ করে গ্রাম পর্যন্ত সুশাসনের জন্য একটা ধারাবাহিক যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। গ্রামেও কাজীর বিচার প্রসারিত ছিল।

পাঁচটি বিভাগ ঃ (১) আরব দেশের চারটি প্রদেশ, যথা — (ক) হিজাজ, (খ) ইয়ামেন (গ) উমান, (ঘ) হাজর, এদের রাজধানী ছিল মক্কা। (২) ইরাক বিভাগের এগারোটি প্রদেশ; যথা—(ক) কুফা, (খ) বসরা, (গ) ওয়াসিত, (ঘ) মাদাইন, (ঙ) হুলওয়ান, (চ) সামররা, (ছ) খোরাসান, (জ) ট্রান্স অক্সিয়ানা, (ঝ) সিন্ধু, (ঞ) পাঞ্জাব, (ট) সিজিস্তান, এদের রাজধানী ছিল — কুফা। (৩) মিশর বিভাগের প্রধানত দুটো প্রদেশ, যথা— (ক) নিম্ন ও (খ) উচ্চ মিশর, এদের

রাজধানী —ফুসতাত। (৪) এশিয়া মাইনরের চারটি প্রদেশ — (ক) এশিয়া মাইনর, (খ) জর্জিয়া , (গ) আর্মেনিয়া, (ঘ) আজারবাইজান, এদের রাজধানী মসুল। (৫) আফ্রিকা,— (ক) উত্তর আফ্রিকা, (খ) স্পেন, (গ) দক্ষিণ ফ্রান্স, (ঘ) সিসিলি, (ঙ) সার্ডিনিয়া, (চ) ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, এদের রাজধানী কায়রোয়ান।

চোদ্দটি প্রদেশ ঃ শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য উমাইয়া খলিফাগণ পরবর্তীকালে সমগ্র রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে ভাগ করেন — (১) আরব, (২) ইরাক, (৩) জর্জিয়া, (৪) সিরিয়া, (৫) মিশর, (৬) প্রাচ্য-প্রদেশ, (৭) আল-মগরিব, (৮) আদ্-দাইলাম, (৯) আর-রিহার, (১০) আল্-জিবাল, (১১) খুজিস্তান, (১২) ফারস, (১৩) কিরমান, (১৪) সিন্ধু প্রদেশ।

শাসন ব্যবস্থা ঃ খলিফা তাঁর বিশ্বস্ত কোন যোগ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বিভাগের রাজ প্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত করতেন। তিনি তাঁর বিভাগীয় কাজের জন্য খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। বিভাগীয় শাসনকর্তাগণ খলিফার অনুমোদন ক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিভাগীয় শাসনকর্তার অনুমোদন ক্রমে জেলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কেন্দ্রের মত প্রদেশেও সকল সরকারি অফিস প্রচলিত ছিল, যেমন— দিওয়ান-আল্-জুনদ, দিওয়ান আল্-রাসায়েল, দিওয়ান-আল্-খাতাম, দিওয়ান-আল্ বারিদ, দিওয়ান-আল্-খারেজ ইত্যাদি।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঃ (১) আমীর বা ওয়ালী— প্রাদেশিক শাসনকর্তা, (২) কাতিব-উদ-দিওয়ান — প্রধান উপদেষ্টা বা সচিব, (৩) সাহিব-উল-খারাজ—রাজস্ব-উপদেষ্টা বা সচিব, (৪) সাহিব-উল-আহদাস—পুলিশ উপদেষ্টা বা সচিব, (৫) সাহিব-উল-বাইতুল মাল—কোষাধ্যক্ষ (৬) এবং কাজী—বিচারক।

উমাইয়া খেলাফতের সামরিক বিভাগ ঃ

[বাইজানটাইন প্রথা — সামরিক ঘাঁটি — সৈন্যদের স্তর বিন্যাস — বেতন — নৌবহর — পঞ্চম নৌবহর।]

বাইজানটাইন প্রথা ঃ উমাইয়া খেলাফতের সামরিক বাহিনীর গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। কেননা এই বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যে উমাইয়া রাজত্বের বিশাল বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের ভূমিকা ছিল — একদিকে গৃহযুদ্ধের অবসান করা, অন্যদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করা। নিজেদের

যুদ্ধকৌশল ছাড়াও উমাইয়া বাহিনী বাইজানটাইনদের সংস্পর্শে এসে রোমান যুদ্ধ নীতির সঙ্গে পরিচিত হন। রোমীয়দের যুদ্ধকৌশল আরবদের তেজ-দীপ্ত প্রাণে এক নতুন জোয়ার আনল। তখন হতেই যুদ্ধের আকৃতি ও প্রকৃতি যেন নতুন রূপ লাভ করল। নতুন জাতীয় জীবনে নবপ্রেরণা ও নবপদ্ধতি মিলিত হয়ে উমাইয়া বাহিনীকে করল বেগবান।

সামরিক ঘাঁটি ঃ কুফা-বসরা, ফুসতাত এবং ওয়াসিতে উমাইয়াগণ সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও ঘাঁটি ছিল, — যেমন মদীনা, মিশর, হিমস্ প্যালেস্টাইন, মসুল ও দামেস্ক প্রভৃতি। এই সমস্ত ঘাঁটিতে প্রভূত পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাবাহিনী নিযুক্ত থাকতেন। তাঁদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল— প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কুফা ও বসরার সামরিক ঘাঁটিতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। অবশ্য অনেকেই স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতেন। মুয়াবিয়ার খেলাফত কালে শুধু সিরিয়াবাসীদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এই প্রথা রহিত হয়, এবং সকলেই সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন। উমাইয়া খেলাফতে সামরিক বিভাগে আর একটি জিনিস লক্ষণীয়— গোত্র ভিত্তিক সেনা বাহিনী গঠন। যার প্রভাব ভারতেও পড়েছিল—পাঠান রেজিমেন্ট, গোর্খা রেজিমেন্ট প্রভৃতি।

সৈন্যদের স্তর বিন্যাস ও সমরসজ্জা ঃ উমাইয়া খেলাফতে রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। এই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরও লক্ষ্য করা যায়। সেনাবাহিনী প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক ও অশ্বারোহী। তীরন্দাজ, বাহক, সেবক ও স্কাউটগণ ছিলেন পদাতিকের অন্তর্গত, তাঁরা তীর ধনুক ও তরবারি ব্যবহার করতেন। অশ্বারোহীগণ সাধারণত বর্শা ও তরবারি ব্যবহার করতেন। সমগ্র সেনাবাহিনী মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল—অগ্র-পশ্চাৎ, বাম-ডান ও মধ্য। অশ্বারোহীগণ ডানে ও বামে থাকতেন, যেন তাঁরা অতর্কিতে কোন বিপদের সম্মুখীন না হন। আবার পদাতিকগণও তিন ভাগে নিজেদের ভাগ করতেন— বামে-ডাইনে বর্শাধারী ও ধনুকধরগণ এবং মধ্যভাগে সাধারণ পদাতিক। সৈনিকগণ সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে তীর-ধনুক-বর্শা-তরবারি, বল্লম ও দুমুখো তরবারি ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। এবং নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাথাতে লোহার বর্ম ও শরীরে কয়েক পর্দা-বিশিষ্ট চামড়ার জামা ব্যবহার করতেন। উমাইয়া খেলাফতে —প্রতি দশজন সৈন্যতে একজন আরিফ থাকতেন, প্রতি পঞ্চাশ জনে একজন খলিফা, প্রতি শয়ে একজন নকীব,

প্রতি হাজারে একজন অধিনায়ক বা কায়েদ ছিল। সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন সেনাধ্যক্ষ বা সিপাহসালার।

যুদ্ধ সূচনা : মুসলমান সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে প্রথম বেজে উঠত দামামা ও ভেরী, এই গুরু গম্ভীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী ঈমানের (আল্লাহতে বিশ্বাস) অফুরন্ত তেজে অতি বিক্রমে আকাশ-পাতাল মুখরিত করে বজ্রনিনাদে ধ্বনি দিতেন—'আল্লাহ্-আকবর' সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধকারীগণ (পাঠকারী) সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের আয়াত (বাক্য) পাঠে—সৈন্যগণকে উৎসাহিত করতেন—আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, জয় তোমাদের গাজীর সম্মান দান করে এবং পরাজয় ও মৃত্যু তোমাদের শহীদের মর্যাদা দান করে।

সৈন্যদের সংখ্যা ও বেতন : প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার সময় সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ হাজার। এবং শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ হাজার। এই বিশাল সেনা বাহিনীর জন্য বার্ষিক ৬ কোটি দিরহাম ব্যয় হত। বেতন হিসাবে সৈনিকগণ বার্ষিক ১০০০ দিরহাম পেতেন। তবে এই বেতনের শ্রেণীভাগ ছিল। বেতনের সঙ্গে সঙ্গে ছিল খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত। সৈনিকদের উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে ভাতা বৃদ্ধি করা হত। প্রথম ইয়াজীদ মদীনার সেনাবাহিনীকে বঞ্চিত করে শুধু সিরীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের জন্য [illegible]০০ দিনার ভাতা বৃদ্ধি করেন। একমাত্র তৃতীয় ইয়াজীদ সৈনিকদের বে[illegible] ১০ দিরহাম হ্রাস করেন। যাই হোক, প্রথম যুগের উমাইয়া খলিফাগণ সৈনিকদের সুখ-সুবিধার প্রতি অত্যন্ত নজর রাখতেন।

নৌ-বহর : ইসলামি রাজত্বের সম্প্রসারণের মূলে নৌ-বহরের অবদান সর্বজনবিদিত। মুয়াবিয়া তখন খলিফা হননি, তিনি তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমানদের প্রতিরোধ করতেই একটি ছোট নৌবহর গঠন করেন। এই দিক দিয়ে মুয়াবিয়াই মুসলিম নৌ-বহরের জনক। ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে মুয়াবিয়া প্রথম খেলাফত লাভ করেই সিরিয়াতে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা তৈরি করেন। অতঃপর সাম্রাজ্যের সীমারেখা আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করলে তিনি একটি শক্তিশালী নৌ-বহর গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই কার্য সম্পন্ন করে খলিফা মুয়াবিয়া বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টানটিনোপল অবরোধের চেষ্টা করেন। এই অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন তাঁর পুত্র ভাবী খলিফা ইয়াজিদ। কিন্তু অভিযান ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে তাঁর খেলাফত কালে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হলে—ভূমধ্যসাগরের কতিপয়

দ্বীপ মুসলমানদের অধিকারে আসে। ৬৭২ খ্রীস্টাব্দে রোডস, এবং ৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রীট অধিকৃত হয়। খলিফা মুয়াবিয়ার আমলে জুনাদাহ বিন আলী এবং আব্দুল্লাহ বিন কায়েস নামক দুজন প্রখ্যাত নৌধ্যক্ষ ছিলেন। জুনাদাহ বাইজানটাইনদের নিকট হতে রোডস ও ইরওয়াদ দ্বীপপুঞ্জ দুটি দখল করেন। আব্দুল্লাহ সর্বমোট ৬০টি নৌ-অভিযান পরিচালনা করে বহু বিজয়ের সাক্ষ্য রেখে গেছেন। মুসলিম নৌবহরের উৎপত্তি ও অনুপ্রেরণার মূলে যদি কার কোন পরোক্ষ অবদান থেকে থাকে, তা বাইজানটাইন সম্রাটের আক্রমণ। এই রোমান আক্রমণ প্রতিরোধার্থেই এর জন্ম।

উমাইয়া খেলাফতের প্রথম দিকেই মুসলমানদের ১৭০০টি দ্রুতগামী যুদ্ধ জাহাজ সম্বলিত একটি সুসজ্জিত নৌবাহিনী ছিল। খলিফা আব্দুল মালিকের সময় এই নৌবহর আরও অনেক উন্নত মানে রূপান্তরিত হয়, তিনি তিউনিসিয়ায় একটি বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কারখানা তৈরি করেন। কিন্তু খলিফা স্থল-যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় নৌবহরে খুব বেশি একটা মনোনিবেশ করতে পারেন নি। মুসলিম-নৌবহর প্রতিষ্ঠিত হয় মুয়াবিয়ার দ্বারা, এবং চরম উৎকর্ষ লাভ করে খলিফা আল-ওয়ালিদের সময়। এই সময় পূর্বদেশীয় শাসনকর্তা ছিলেন — হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ। যখন মুসলিম বণিকগণ তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল দ্বীপে যাতায়াত করতেন , তখন কয়েকজন ভারতীয় জলদস্যু মুসলিম জাহাজ লুট করলে, তাঁরা রাজা দাহিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিচার প্রার্থনা করেন, রাজা আরব বণিক ও হাজ্জাজের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে সিন্ধু মুসলিম নৌবহর দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হয়। ঐতিহাসিক হুসাইনী বলেন — "পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অধিকাংশ দ্বীপপুঞ্জ ও স্পেন এবং সিন্ধুদেশ শক্তিশালী মুসলিম নৌবহরের সহায়তায় বিজিত হয়।"

পঞ্চম নৌবহর ঃ উমাইয়া খেলাফতে আমরা মুসলিম নৌবহরকে পাঁচটি ভাগে ও স্থানে লক্ষ্য করি, যেমন—(১) সিরীয়া—কেন্দ্রীয় অফিস, (২) আফ্রিকায় তিউনিস, (৩) মিশর, (৪) ব্যবিলন, (৫) নীলনদের অববাহিকা প্রভৃতি।

মুসলিম নৌবহরে কার্যত দুটো স্থানে কার্যরত ছিল— ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও ভারত মহাসাগর। এই দুই অঞ্চলের নৌ-যান গুলোও ছিল ভিন্ন ধরণের । ভূমধ্যসাগরীয় জাহাজগুলো লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের জাহাজগুলো অপেক্ষা আকৃতিতে অনেক বড় ছিল। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের জলের লবণাক্ততার জন্য জাহাজগুলোর নির্মাণ কৌশলও ভিন্ন প্রকারের ছিল।

সেখানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাহাজগুলোর পাটাতনে শুধু লোহার পেরেক ব্যবহারই যথেষ্ট ছিল। রোমানদের আক্রমণেই মুসলিম খলিফাকে নৌ-দৃষ্টি সম্পন্ন করার মূল কারণ ছিল। নচেৎ আরব মরুভূমির খলিফাগণ এই রণ-কৌশলটি আদৌ জানতেন না, এবং জানার তেমন কোন ঔৎসুক্যও প্রথমদিকে ছিল না। তাই রোমান আক্রমণ মুসলমানদের জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদই হয়েছিল—পরবর্তীকালে রাজ্য সম্প্রসারণের দিক থেকে।

উমাইয়া খেলাফতে সমাজ জীবন ঃ

সমাজ জীবনের প্রধান দিক ঃ [সামাজিক স্তর — সম্প্রদায় — অভিজাত সম্প্রদায় — খলিফাদের ধর্মীয় জীবন — আরব ও অনারব মুসলমান —জিম্মী — ক্রীতদাস — নারীর স্থান — পোশাক-পরিচ্ছেদ — আহার-বিহার]

সামাজিক স্তর ঃ ইসলামের মূল নীতির দ্বারা পরিচালিত সমাজ জীবন ছিল—খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বারা পরিচালিত সমাজ—যা ছিল সরল, অনাড়ম্বর, মানুষের কল্যাণমুখী সমাজ। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন পদ্ধতি আরবদের অন্ধকার যুগের সমাজ জীবনের অবসান ঘটিয়ে ঊষার আলোকের আবির্ভাবও ঘটাল, উমাইয়া খলিফাগণ সেই অন্ধকার যুগে পুরোপুরি ফিরে না গেলেও মহানবী (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত খোলাফায়ে রাশেদীনের সেই আলোকজ্জ্বল সমাজের চরিত্রকেও সঠিক রাখতে পারেন নি। একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমর চেষ্টা করেছিলেন—খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ধারায় চলতে ও চালাতে। তেমনি আবার এমন কয়েকজন খলিফাও ছিলেন যেমন প্রথম ইয়াজীদ, দ্বিতীয় ওয়ালিদ প্রমুখ খলিফাগণ আপন আপন আচারে আরবের সেই অন্ধকার যুগকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। এইভাবে আমরা উমাইয়া খেলাফতে সমাজ জীবনের কয়েকটা স্তর পাই। যেমন—(১) রাজ সম্প্রদায়, (২) অভিজাত সম্প্রদায়, (৩) মাওয়ালী, (৪) জিম্মী, (৫) ক্রীতদাস, প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ব্যতীত তাঁদের সমাজ জীবনে লক্ষ্য করা যায়-- নারীর স্থান, ধর্মের স্থান ও পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

রাজ সম্প্রদায় ঃ উমাইয়াগণ সিংহাসন লাভ করার পর শুধু যে রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হল তা নয়। শুধু যে ইসলামের গণতন্ত্র রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হল, তাও নয়। ইসলাম মানুষের মধ্যে যে জীবন ধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছিল, মানুষকে যে ভাবে গঠন করতে চেয়েছিল, সমাজ-জীবনকে যেভাবে রূপ দিতে চেয়েছিল, তার আমুল পরিবর্তন হল উমাইয়াগণের সিংহাসন আরোহণে। ইসলাম চেয়েছিল প্রথমে মানুষকে ভাল করে, সেই ভাল মানুষের

ভাল করতে। অমানুষ ও চরিত্রহীনের হাতে সে কিছুই তুলে দিতে চায় নি। কিন্তু ইসলামের এই মূল ধারা ও পথ থেকে উমাইয়াগণ দূরে সরে গেলেন। এদিক দিয়ে উমাইয়া খলিফাদের পদস্খলনের সংশোধন আববাসীয় খলিফাদের মধ্যেও দেখা যায় না, যার সকরুণ পরিণতি উমাইয়া ও আববাসীয় উভয় খেলাফত হতে পরবর্তীকালের মুসলিম জাহানকেও গ্রহণ করতে হল।

ইসলামের সৎ খলিফাগণের পর প্রথম মুয়াবিয়া সরাসরি ইসলামি নির্দেশের বিপরীতমুখী কাজ না করলেও তিনি ইসলামী শরীয়তের বা ধর্মের পরিপন্থী ছিলেন। তাই ইসলামের ইতিহাসের বিশ্ববিখ্যাত প্রবক্তা মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন—"তাঁরা (উমাইয়ারা) যে শুধু ইসলামের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করে ছেড়েছে, তাই নয়, অবশ্য ওটাও কোরআনের দৃষ্টিতে কুফরী বৈ নয়।" সুতরাং মওলানা আজাদের দৃষ্টিতে প্রথম মুয়াবিয়া ইসলামী গণতন্ত্রকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে কুফ্‌রীর পথে কাফেরের দরজায় হাজির। অতঃপর তাঁর পুত্র ইয়াজীদ খলিফা হয়ে রাজদরবারে প্রথম সরাসরি অনৈস্লামিক কার্যকলাপ আরম্ভ করেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রকাশ্য মদ্যপ। এইজন্য তাঁকে আল্‌-খুমার উপাধিও দেওয়া হয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায় মদ একেবারেই নিষিদ্ধ ও অবৈধ—২ ঃ ২১৯, ৪ ঃ ৪৩, ৫ ঃ ৯০-৯১। সুতরাং উমাইয়া দ্বিতীয় খলিফা প্রথম ইয়াজীদ পবিত্র কোরআনকে শুধু অস্বীকারই করেন নি, প্রকাশ্যে তার অপমানও করেছেন। পরবর্তী খলিফাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—আব্দুল মালিক মাসে একবার, প্রথম ওয়ালিদ একদিন অন্তর, হিশাম সপ্তাহে একবার মদ্যপান করতেন। খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ সাঁতার কাটার জন্য মদের চৌবাচ্চা বা পুকুর তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয় ইয়াজীদও তাই। ব্যতিক্রম দ্বিতীয় ওমর।

ব্যক্তিজীবন ঃ ব্যভিচার ইসলামে ঘোর অন্যায় এবং অমার্জনীয় পাপ—৪ ঃ ১৫, ১৭ ঃ ৩২, ২৩ ঃ ৫, ২৪ ঃ ২। এ সত্ত্বেও অধিকাংশ উমাইয়া খলিফা হারেমে (অন্দর মহল) অসংখ্য পরমাসুন্দরী উপপত্নী রাখতেন। খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজীদ সালামাহ এবং হাবীবা নামী দুজন নর্তকী ও গায়িকার দ্বারা সর্বদাই পরিবেষ্টিত থাকতেন। নারী সম্পর্কিত জঘন্য চিত্রাবলী তাঁরা তুলে ধরে গেছেন। এই সমস্ত জঘন্য চরিত্রের খলিফাগণ জনবহুল রাজধানী দামেস্ক পরিত্যাগ করে দামেস্ক ও পালমির মধ্যবর্তী স্থানে মরু-দুর্গ তৈরি করে অতিরিক্ত ভোগ বিলাসে পশুজীবন যাপন করতেন। তাঁদের এই ইন্দ্রিয় পরায়ণতার ভোগ বিলাসের নানা উপকরণ ছিল— গীত, বাদ্য, নৃত্য, শিকার, ঘোড়-দৌড়, পাশাখেলা, দাবাখেলা

ও রমণী বিহার ইত্যাদি। উমাইয়া প্রথম খলিফাদের দুটোদিক ছিল কার্যকলাপে অনৈস্লামিক হলেও শাসনে বড়ই শক্ত ছিলেন। পরবর্তীগণ একদিকে অনৈস্লামিক ছিলেন, আবার অন্যদিকে শাসন পরিচালনায় একেবারেই অপদার্থ অযোগ্য ছিলেন। যাঁদের কোন দিকই ছিল না।

খলিফাদের ধর্মীয় জীবন ঃ ইসলামি রাজত্বে খলিফাদের তিনটি প্রধান দায়িত্ব ছিল (১) সাধারণ প্রশাসন পর্যবেক্ষণ, (২) সামরিক বিভাগ পরিচালনা, (৩) ধর্মীয় প্রার্থনা পরিচালনা। কিন্তু এই দায়িত্বগুলো মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক ও দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত কেউই সঠিকভাবে পালন করেন নি। অন্যান্য দিকগুলো কিছুটা পালন করলেও ধর্মীয় দায়িত্বটিকে এই তিনজন ব্যতীত কেহই পালন করেন নি। এমন কি অনেকে ধর্মের চরম বিরোধিতাই করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভানক্রেমার বলেন—"দামেস্ক আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র, গান-বাজনার আখড়াখানা, এবং বিলাস-ব্যসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল, জীবন ছিল শুধু ভোগের ভূমি। ধর্ম ছিল ভণ্ডামী মাত্র। উমাইয়া খেলাফতে দামেস্ক ছিল একটি সুরম্য নগরী"। একই ভাব প্রতিধবনিত হয়েছে হিট্টির কথায়—উমাইয়াদের রাজত্বে হারেম প্রথা চরম আকার ধারণ করে, এবং ক্রীতদাসী ও পরমাসুন্দরী উপ-পত্নী দ্বারা হারেম পরিপূর্ণ থাকত। দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময় ইহা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দামেস্কের বাইরেও মরূদ্যানে প্রাসাদ নির্মাণ করে বিলাসী-ভোগী খলিফাগণ উপ-পত্নীদের নিয়ে ভোগ-বিলাসের জীবন অতিবাহিত করতেন এবং চরম বিলাস-ব্যসনে থাকতেন। এইরূপ একটি মরু-প্রাসাদের নাম-'কুসাইর-আকরা'। সুতরাং শেষের দিকে খলিফাগণের ধর্মীয় জীবন প্রশাসকের জীবন বা সামরিক জীবন কোনটাই ছিল না। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সঠিকভাবে ধর্মীয় জীবন মাত্র একজন খলিফাই পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি হলেন খলিফা দ্বিতীয় ওমর। যাঁকে ইসলামের পঞ্চম সৎ খলিফা বলা হয়।

অভিজাত সম্প্রদায় ঃ রাজপরিবারের পরই ছিল অভিজাত সম্প্রদায়—আমীর-ওমরাহ নবাব জমিদার তালুকদার মনসবদার প্রভৃতি। এঁদেরও জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত উচ্চ। শিক্ষাদীক্ষায় তারা ছিলেন উন্নতমানের মানুষ।

আরব মুসলমান ঃ জীবন যাত্রার উচ্চমানের দিক থেকে আমীর ওমরাহদের পরই ছিল আরব মুসলমানদের স্থান। উমাইয়া যুগে সমাজ-জীবনে আরব মুসলমানদের অনেক কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল যেগুলো কোন অনারব-মুসলমান ভোগ করতে পারতেন না। এটা কিন্তু মোটেই ইসলামি বিধান নয়। ইসলাম

মুসলমানে-মুসলমানে কোন প্রকারেরই পার্থক্য রাখে না। এমনকি মানুষে-মানুষে কোন ভেদ রেখা স্বীকার করে না। এই দিক দিয়ে উমাইয়াগণের সমাজ ব্যবস্থাও অনৈস্লামিক ছিল। ইসলাম বলে স্রষ্টা এক, তাঁর সৃষ্টিও এক, মানুষও এক। ইসলাম বলে মানুষের মর্যাদা তাঁর চরিত্র ও গুণে; বংশে নয়, জাতিতে নয়, গোত্রে নয়-গোষ্ঠীতেও নয়। এককথায় গুণে ও জ্ঞানে।

অনারব মুসলমান ঃ আরব মুসলমানের পরই অনারব মুসলমান। এঁদের মাওয়ালীও বলা হত। কেননা, তাঁরা নাকি আরব মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত বা 'আশ্রিত' রূপে থাকত। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও প্রকৃত মুসলমানের পদমর্যাদা লাভ করতে পারে নি। এঁরা সাধারণত শহরে বাস করতেন। মুসলমানদের সাথে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করার পরও তাঁদের বিধর্মীদের ন্যায় 'জিজিয়া' কর দিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও অশ্বারোহী হওয়ার সুযোগ পেতো না। এক সময় মাওয়ালীগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ছিলেন। একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমর এই জঘন্য প্রথা রহিত করেছিলেন। অনারব মুসলমানদের এই অসন্তোষই একদিন আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। উমাইয়াদের পঞ্জীভূত পাপের মূলে ছিল তাঁদের অনৈস্লামিক প্রথা। পরবর্তীকালে যা তাঁদের পথের কাঁটা রূপে দেখা দিল।

জিম্মী ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান সম্প্রদায়কে জিম্মী বলা হত। ইহুদী, খ্রীস্টান, পারসিক (অগ্নি-উপাসক) ও অন্যান্য আশ্রিত অমুসলমানগণকে জিম্মী নামে অভিহিত করা হত। এঁরা সমাজে অনারব মুসলমানদের পরবর্তী নাগরিক হিসেবে গণ্য হতেন। এঁদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হত। কিন্তু তাঁদের সমস্ত প্রকারের নিরাপত্তা দেওয়া হত। তাঁরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য তাঁদের একটি কর দিতে হত, যার নাম জিজিয়া। অনারব দেশে আরবগণ জমির মালিক হতে পারতেন না, সেখানকার অধিবাসীগণই তথাকার জমি-জায়গা চাষ-আবাদ করতেন, যার জন্য খারাজ নামে একটি কর দিতেন।

জিম্মীগণ খলিফাদের আস্থাভাজনও ছিলেন। খলিফা মুয়াবিয়ার সময় থেকে অনেকেই তাঁদের রাজকার্যেও নিযুক্ত করতেন। খলিফা মুয়াবিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন খ্রীস্টান। তিনি বহু খ্রীস্টান গীর্জা মেরামত করার নির্দেশ দেন। মুয়াবিয়ার খেলাফতে ৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে এডেসার ভগ্নপ্রায় সুবৃহৎ গীর্জাটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। খলিফা দ্বিতীয় ওমর অমুসলমান প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে নাজরানের খ্রীস্টানদের কর ২০০০ হাজার

হতে ২০০-তে পরিণত হয়। ওলহাউ সন বলেন—"খলিফা দ্বিতীয় ওমর অমুসলমানদের সুবিধার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন, এবং তাদের সঠিক উন্নতির জন্য চেষ্টার কোনরূপই ত্রুটি করতেন না।" জিম্মীদের ব্যাপারে সকল খলিফাই সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাই উমাইয়াদের গৃহ-বিবাদে জিম্মীগণ সব সময় নিরপেক্ষ ছিলেন। এমন কি পতনের মহাক্ষণেও জিম্মীদের বিশেষ কোন ভূমিকা দেখা যায় না।

ক্রীতদাস ঃ উমাইয়া রাজত্বে সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ক্রীতদাস। কিন্তু ইসলাম দাসপ্রথার ঘোর বিরোধী। ইসলাম এই ঘৃণ্য প্রথা বিলোপের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন — "একটি দাসকে আজাদ করা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ।" কিন্তু দুঃখের বিষয় উমাইয়া খেলাফতে দাস প্রথা ঘৃণ্য আকার ধারণ করে। সরল যুদ্ধবন্দীকেও দাস রূপে গণ্য করা হত। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাসত্ব প্রথাও প্রসারিত হয়। অবশ্য দাসকে মুক্ত করাটা খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। তাই একদিন ইসলামের ইতহাসে দাস বংশের রাজত্বও সৃষ্টি হল। গজনী, হিরাট, মিশর (মামলুক) ও ভারত উপমহাদেশে দাসদেব প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি সকলের নিকটই সুবিদিত। তাই ডাউটি বলেন--"দাসদের অবস্থা মোটামুটি সহনযোগ্য ও সুখকর ছিল।"

নারীর স্থান ঃ ইসলামে পর্দা প্রথার প্রচলন থাকলেও উমাইয়া যুগে নারীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই নারীর পূর্ণ মর্যাদা সংরক্ষিত ছিল। এই যুগে ইমাম হোসাইনের কন্যা সখিনা ও তাল্হার কন্যা অয়েশা চরম বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। প্রথম ওয়ালিদের পত্নী বিদুষী উম্মুল বানু ভারতের সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি তাঁর স্বামী খলিফা ওয়ালিদকে রাজকার্য পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করতেন। এ যুগেই তাপসী রাবেয়ার মত মহিলা জন্ম নেন। অন্যান্য সাধারণ মহিলাগণও তাঁদের জ্ঞানচর্চার সুযোগ পেতেন। কেননা সে যুগের নৃত্য, গীত, গান, কবিতা রচনা ও আবৃত্তি প্রভৃতি নারী সমাজের জীবন-স্ফুরণ ক্ষেত্রের সাক্ষ্য বহন করে।

পোশাক-পরিচ্ছেদ, আহার-বিহার ঃ উমাইয়া খেলাফতে সমাজ জীবনের আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। উমাইয়া খলিফাগণ নিজেদের পরাক্রান্ত রাজা হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁদের আচার-ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছদ, আহার-বিহার কোন কিছুই পারস্য বা রোমান সম্রাট অপেক্ষা কম ছিল না। তাঁদের বাসস্থান, তাঁদের দরবার সকল কিছুই ছিল অন্যান্য রাজা-বাদশাদের ন্যায় অতি জাঁকজমকপূর্ণ। আচারে-বিচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে তাঁরা নিখুঁত রাজ-

পরিচয়ই রেখে গেছেন। খলিফা বা প্রতিনিধি শব্দের কোন রূপ তাৎপর্য একমাত্র দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত অন্য কোন খলিফারই জীবনে ফুটে ওঠে নি।

ধাপে ধাপে সাধারণ মানুষের জীবনেও এর প্রভাব পড়েছিল। ধনী মানুষেরা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ নাগরিকগণ—ঢিলা পায়জামা, লাল জুতা, বিরাট পাগড়ী পরিধান করত। সেখানে বেদুঈনগণ ঢিলা লম্বা জামা পরিধান করত এবং মাথায় রুমাল বাঁধতে অভ্যস্ত ছিল। অনেক অভিজাত সম্প্রদায় রেশমী পোশাক পরিধান করে তরবারি ও বর্শা নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাতায়াত করতে ভালবাসতেন।

তখনকার যুগে পর্দা প্রথাও ছিল। তবে সকলেই এ প্রথাকে অনুসরণ করতেন না। মহিলাগণ সাধারণত ঢিলা-পায়জামা, কামিজ, ও বক্ষোপরি উড়না ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। গোত্র ও গোষ্ঠী প্রীতি তখন আবার মাথা চাড়া দিয়েছিল, তাই এক একটি গোত্র পৃথক পৃথক ভাবে বসবাস করত। সাধারণ মানুষ সকলেই আপন আপন সামর্থানুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

উপসংহার ঃ উমাইয়া খেলাফতে সমাজ-জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপ বলতে আমরা যা পাই—রাজা-বাদশাদের অতি জাঁক-জমকপূর্ণ জীবন ধারণ, রাজদরবারে অনেক অনৈস্লামিক প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, যে প্রথাকে খোলাফায়ে রাশেদীন একেবারেই রহিত করেছিলেন। অভিজাত শ্রেণীর আবির্ভাব, দাসপ্রথার প্রবর্তন। উমাইয়া খলিফারা শুধু রাজ্য জয়ই করেন নি, ঐ বিজিত রাজ্যের কিছু কিছু অসামাজিক উপাদান খলিফাদেরও জয় করেছিল। বাইজানটাইনের গায়িকা ও নর্তকী প্রথা এবং পারস্যের বহুবিধ মদ যেমন একদিন এই দুই বিশাল সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলেছিল, তেমনি যথাসময়ে উমাইয়া খলিফাদেরও একদিন এরা নীরবে হজম করে ফেলল। এই ক্ষেত্রে ঐ দুই সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস প্রথাও উমাইয়া খলিফাদের কম প্রভাবান্বিত করে নি। খলিফা দ্বিতীয় ওমর ছিলেন একমাত্র এই সবের ব্যতিক্রম। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল স্বয়ং মহানবীর (দঃ) জীবনাদর্শ।

উমাইয়া খলিফাদের দরবারের জীবন যাই হোক, তাঁরা সাধারণ প্রজাবর্গের সুখ সুবিধার জন্য যথেষ্ট মনসংযোগ করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খলিফাগণ প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধার জন্য যথেষ্ট সচেতন ও সজাগ ছিলেন। আইন-শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। খলিফাগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের বহু নজীর রেখে গেছেন। যদিও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনধারা তাঁদের ছিল না, তাঁরা নিজেদেরকে নির্জলা

সম্রাট বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন, এবং উমাইয়া সমাজ-জীবনও সেই ভাবেই পরিচালিত হয়েছিল।

উমাইয়া যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান দিক ঃ [ইসলামে শিক্ষার স্থান ও মান — শিক্ষার উন্মেষ — শিক্ষাব্যবস্থা — শিক্ষা ধারা — ইতিহাস— ইতিহাসের মূল উৎস — সাহিত্য ও ভাষা — বক্তৃতা ও বাগ্মিতা — দর্শন — বিজ্ঞান — চিকিৎসাশাস্ত্র — রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি।]

ইসলামে শিক্ষার স্থান ও মান ঃ ইসলাম ধর্ম মূলত শিক্ষা ও জ্ঞান ভিত্তিক, এবং কর্ম ও সাধনা ভিত্তিক। স্বয়ং মহানবীর (সাঃ) কথায় শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত, কর্ম ও সাধনা ব্যতীত ধর্ম (তেমন) কোন মর্যাদা পায় নি। স্বয়ং কোরআন বলে—"আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো"। ২৪ ঃ ৩৫। এই আল্লাহ্ রূপ আলোকে এবং এই আলোকরূপী আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য মহানবী (সাঃ) যে পথ ও পন্থা দিলেন, তা শিক্ষার পথ। তিনি বলেন—"জ্ঞানই আলো"। সুতরাং স্বয়ং মহানবীর দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেছে, সে যেন আলোকে লাভ করেছে, এবং যে আলো লাভ করেছে, সে যেন আল্লাহ্‌কে লাভ করেছে। ইসলাম ধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস, অতুলনীয় জিনিস, আপোষহীন জিনিস—'এক আল্লাহ্।' এই 'অদ্বিতীয় আল্লাহ্'কে পাওয়ার জন্য ইসলাম যে পথ দিল — তা শিক্ষার পথ, জ্ঞানের পথ, সংযমের পথ ও সাধনার পথ। মহানবী (সাঃ) তাঁর উম্মৎ বা অনুসারীদের জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা করে গেছেন—"অশিক্ষিত ব্যক্তির এবাদৎ বা উপাসনা অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির নিদ্রা উত্তম। শহীদের রক্ত অপেক্ষা জ্ঞানীর কলমের কালীর মূল্য বেশি। প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন অতি অবশ্যই কর্তব্য।" ইসলামের স্বয়ং আল্লাহ্ও মানুষকে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন—"হে প্রতিপালক (প্রভু) আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" ২০ ঃ ১১৪। সুতরাং ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ প্রাপ্তি যদি মূল কথা হয়, তাহলে জ্ঞান-প্রাপ্তি তার প্রথম সোপান ও প্রধান সহায়। অতএব আল্লাহ্র বাণী ও তাঁর দূতের ঘোষণাতে ইসালামে শিক্ষার স্থান ও মান অত্যন্ত মর্যাদা সহকারেই নির্ণীত হয়েছে।

উমাইয়া যুগে শিক্ষার উন্মেষ ঃ উমাইয়া যুগে ইসলামের সাম্রাজ্য যেমন বিস্তৃতি লাভ করেছিল, শিক্ষাও তেমনি বিস্তার লাভ করেছিল। মরুবাসী আরবগণ শুধু রাজ্য লাভ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বিজিত অঞ্চলগুলো হতে আহরণ করেছে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান। গ্রীক, আর্মিনীয়া পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের

প্রভাবে মুসলমানগণ নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন আরম্ভ করেন। আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বৃক্ষটি মহীরুহ রূপে দেখা যায়, উমাইয়া যুগে ঐ জ্ঞান-বৃক্ষের বীজটি রোপিত না হলে এটা সম্ভব হত না। উমাইয়া যুগ আজও বিখ্যাত তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের জন্য।

উমাইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন না থাকলেও উমাইয়া খলিফাগণ শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী ছিলেন। সিরিয়ার মরুভূমিতে 'কুসাইর আক্‌রা' যুবরাজদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ করত। মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে পারলে তাঁকে শিক্ষিত বলা হত। শিক্ষিত মানুষের চারিত্রিক ও গুণগত দিক বলতে তাঁরা মনে করতেন—কর্তব্যবোধ, উদারতা, অতিথিপরায়ণতা, পৌরুষ, বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। শিক্ষাকেন্দ্র বলতে যা ছিল, সেগুলো প্রধান প্রধান শহর, যেমন—মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, মিশর প্রভৃতি স্থান। শিক্ষালয় বলতে যা ছিল—সেটি মসজেদ। তখনকার দিনে মসজেদগুলোই ছিল শিক্ষালয়। এবং শিক্ষার সূচনা হত পবিত্র কোরআন ও হাদিসকে নিয়ে। মসজেদ ব্যতীত কিছু কিছু শিক্ষালয় ছিল, যেমন—কুফায় জাহ্‌হাক ইবন-মুজাহিমের অবৈতনিক বিদ্যালয়। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বেতনও গ্রহণ করা হত। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উপাধিও দেওয়া হত, যেমন—দাখেল প্রবেশিকা পরীক্ষা, আলেম-মাধ্যমিক, ফাজেল গ্রাজুয়েট, মমতাজুল মুহাদ্দেসীন, মমতাজুল ফোকাহ—এম. এ. (হাদিস বিশারদ ও ফেকা-নীতি শাস্ত্র বিশারদ) ইত্যাদি।

উমাইয়া যুগে শিক্ষাধারা ঃ উমাইয়া যুগে শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ ধারা ছিল, যেমন—(১) আরবী ব্যাকরণ, (২) কোরআন, হাদিস ও ফেকা শাস্ত্র, (৩) ইতিহাস, (৪) সাহিত্য ও ভাষা, (৫) বাগ্মিতা, (৬) দর্শন, (৭) বিজ্ঞান, (৮) চিকিৎসাশাস্ত্র, (৯) রসায়ন শাস্ত্র।

১। আরবী ব্যাকরণ ঃ আরবী ব্যাকরণের জনক হযরত আলী (কঃ)। উমাইয়া যুগে কুফা ও বসরায় আরবী ব্যাকরণের উদ্ভব হয়। অনারব মুসলমানদের কোরআন পাঠ ও কোরআনের অর্থ অনুধাবন করার জন্য আরবী ব্যাকরণের প্রথম উৎপত্তি। সে যুগের বিখ্যাত আলেম ও হযরত আলীর শিষ্য বসরার অধিবাসী আবুল আসওয়াদ দু'য়ালী ৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্রনির্ধারণ এবং তার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। ইবনে খাললিকান বলেন—"হযরত আলী (কঃ) তাঁকে আরবী ব্যাকরণ রচনার

জন্য উৎসাহিত করেন ও নির্দেশ দেন—আরবীতে তিনটি পদ থাকবে—বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয়।" আরবী ব্যাকরণের পরবর্তী পণ্ডিত বসরার বিখ্যাত বৈয়াকরণ —খলিল-ইবন-আহম্মদ। তিনিই সর্বপ্রথম 'কেতাবুল আইনি' নামে আরবী অভিধান রচনা করেন। এবং তিনি আরবী ছন্দের প্রয়োগ এবং তার বিশ্লেষণও করেন। তাঁরই ছাত্র পারস্যের সিরাওয়াইহ্ ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে আল্-কিতাব নামে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আরবী ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। যে গ্রন্থখানির রচনা কৌশল আজও সমাদৃত। আরবী ব্যাকরণে কিছু গ্রীক তর্কশাস্ত্রের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বসরার দেখাদেখি কুফাও এই কার্যে আগ্রহী ভূমিকা গ্রহণ করে।

২। কোরআন, হাদিস ও ফেকাহ্ শাস্ত্র ঃ নিখুঁতভাবে কোরআন পাঠ ও তার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার ফলে সূচনা হলো—শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের। এই কোরআন পাঠকে শুদ্ধ করার জন্য, সহজ ও সরল করার জন্য, আরব ও অনারব মুসলমান ও অমুসলমানদের নিকট সহজে বোধগম্য করার জন্য খলিফা আব্দুল মালিকের যে অসামান্য অবদান, তা সর্বজনবিদিত। তিনিই 'হরকৎ' (আকার-একার-উকার) প্রবর্তন করে পবিত্র কোরআন ও হাদিস পাঠকে সহজ করে গেছেন। আরম্ভ হল হাদিসের উপর গবেষণা। এই কোরআন ও হাদিস চর্চাই একদিন ফেকাহ্ ও মুসলিম আইনের জন্ম দেয়। উমাইয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিসবিদ ছিলেন—ইমাম হাসান-আল্-বাসরী, যিনি সে যুগের বহু ধর্মীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সূফীগণ তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, মুতাজিলাগণ তাঁকে তেমনি ভক্তি করতেন। এবং সুন্নীগণও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। এককথায় তিনি ছিলেন সে যুগের কালজয়ী যুগমানব এবং মুহাদ্দেস। এই যুগের অপর একজন হাদিসবিদ ছিলেন ইবন শিহাব জহুরী। কুফার আব্দুল্লাহ ইবন-মামুদ প্রায় ৪৮৪টি হাদিস বর্ণনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি কুফার একটি স্কুলেরও প্রধান ছিলেন হাদিসবিদ ইবন-শারাহ্বিল আশশাবী জগদ্বিখ্যাত ইমাম আবু হানিফার শিক্ষক ছিলেন। মক্কা ও মদীনার হাদিসবিদগণের মধ্যে মদীনার আনাস-ইবন-মালিক এবং আব্দুল্লাহ্ ইবন-ওমর ও মক্কার আব্দুল্লাহ্ ইবন-আব্বাস বিখ্যাত ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম হাসান বসরী বসরায় ধর্ম, ফেকাহ, দর্শন প্রভৃতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে আজও অমর। তাঁর স্বনামধন্য ছাত্র ওয়াসিল-বিন-আতা পরবর্তীকালে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

৩। ইতিহাস—ইতিহাসের সূচনা যুগ ঃ আরবে উমাইয়া খেলাফতের পূর্বেই বিক্ষিপ্তভাবে ইতিহাস রচনার সূচনা দেখা যায়। এর মূলে ছিল একমাত্র মহানবীর (সাঃ) জীবন বৃত্তান্ত। মহানবীর (সাঃ) পরলোকগমনের পর অধিকাংশ মানুষই

আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকল—তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে জানার জন্য। তখনও মহানবীর (সাঃ) বহু সাহাবী সৈন্য জীবিত, যাঁদের সাথে দিবারাত্রি ঐ মহামানব, ঐ মহাজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সুতরাং অগণিত মানুষের ইচ্ছায় ও আগ্রহে কিছু কিছু সাহাবী কলম ধরলেন—মহানবীর (সাঃ) দৈনন্দিন জীবন চিত্রকে তুলে ধরতে। এইভাবে মহানবীকে (দঃ) কেন্দ্র করেই জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় একদিন আরব-ভূমিতে জন্ম দিল ইতিহাসের। এই যুগ ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ। এটা ছিল ইতিহাসের চারা বৃক্ষের কাণ্ডের যুগ।

ইতিহাসের শাখা যুগ ঃ এর পরবর্তী যুগ হল—উমাইয়া খেলাফত। হিট্টি বলেন—"এই যুগে আরবী ইতিহাস শিখন হাদিসকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে।" আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে লক্ষ্য করেছি—মানুষ তখন একমাত্র পরলোকগত মহানবীর (সাঃ) জীবনধারা ও কার্যাবলীকে জানার জন্য খুবই উৎসুক ছিলেন, তাই তখন শুধু তাঁকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের প্রথম সূচনা দেখা যায়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ উমাইয়া যুগে মানুষ খোলাফায়ে রাশেদীন ও মহানবীর (সাঃ) বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের (সাঃ) জীবনধারা ও কার্যপ্রণালী জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠায় ঐতিহাসিকগণ তাঁদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করলেন। এটি ছিল শিশু ইতিহাস-বৃক্ষের কাণ্ড হতে শাখার যুগ।

ইতিহাসের প্রশাখা যুগ ঃ অতঃপর ইতিহাসের যে রূপ আমরা লক্ষ্য করি, তার শুধু প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার সময় থেকে। মুয়াবিয়া ছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠপোষক। তিনি প্রাক-ইসলামি যুগের ঘটনা, বিশ্বের রাজা-বাদশাদের কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি জানতে ও শুনতে ভালবাসতেন। সুতরাং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের ইতিহাসের নব যুগের সূচনা হয়। এবং তারই সময়ে প্রথম প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দক্ষিণ আরবের আবিদ ইবন-শারইয়াহ মতান্তরে সরাইয়ার আবির্ভাব । তিনি খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় 'কিতাব আল মুলক ওয়া আখবারুল মাদীণ' নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াহাব-ইবন-মোনাবিব প্রথম মুসলিম আরব ও অনারব দেশের ইতিহাস রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 'জন্ম বৃত্তান্ত' সম্পর্কে তিনি যে কালজয়ী লেখনী ধারণ করেছিলেন— তা আজও বিস্ময়ের বস্তু। খলিফা মুয়াবিয়ার শিক্ষক ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত ইহুদী—কাব-আল-আহবাব। তিনি পরবর্তীকালে খলিফার উপদেষ্টার মর্যাদাও লাভ করেন, এবং ইহুদী গল্প-গাঁথা ইত্যাদি উপকরণ সহ বহু মূল্যবান ইতিহাস ও সাহিত্য রচনা

করে উমাইয়া যুগকে সমৃদ্ধিশালী করতে সাহায্য করেন। এই যুগকে ইতিহাসের কাণ্ড হতে শাখা ও শাখা হতে প্রশাখার বা পল্লবের যুগ বলা হয়। সুতরাং এই যুগেই শিশু-ইতিহাস বৃক্ষের চারা গাছটি শাখা-প্রশাখায় তার চৌদিক প্রসারিত করে নানা মনীষার দানে-অবদানে এক বিশাল মহীরুহতে পরিণত হয়। এর পূর্বে বিশ্ববাসীর নিকট যে ইতিহাস পরিচতি ছিল, তা ঘরোয়া ইতিহাস বা ঘরের ইতিহাস। তা ছিল কোন একটি বিশেষ দেশ-জাতি-গোত্র বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে মাত্র। কিন্তু আরব দুনিয়াতে ইতিহাস রচনার যে উদ্যোগ দেখা গেল, তা যে কোন একটি দেশ জাতি, বা গোত্রকে অতিক্রম করে সম্প্রসারিত হল—বিশ্বের ও বিশ্ব মানবের ইতিহাসে। এইভাবেই একদিন মরুবাসী আরব-মুসলমানদের হাতে জন্ম নিল—বিশ্ব-জোড়া ইতিহাসের যুগ।

ইতিহাসের মূল উৎস ঃ একটি কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে, কি করে কোন গুপ্তধন হাতে পেয়ে আরব-দুনিয়া বিশ্ববুকে বিশ্ব জোড়া ইতিহাস-যুগের জন্ম দিল। একটু অনুধাবন করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি—জ্ঞান-ভাণ্ডার পবিত্র কোরআনই তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল এই কাজে এবং তাঁদের এই পথকে প্রসারিতও করেছিল। পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা মানব-জীবনের, মানব সমাজের এমন কোন অধ্যায় নেই, যার সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় না। যে কোন জ্ঞানীর জন্য ঐ ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তাই আরব দুনিয়া ধরে ফেলল বিশ্ব ইতিহাসের ধারা, জন্ম দিল—কত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর। যাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন পবিত্র কোরআনের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতকে, এবং আপন আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করলেন এক একটি অমর ইতিহাস গ্রন্থে। পবিত্র কোরআন অতীতের বহু ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়েছে, — কোথাও নবীদের (দূত) কাহিনী — ঈসা (আঃ). মুসা (আঃ), ইলিয়াস (আঃ), ইউনুস (আঃ), সালেহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ) এবং আরো বহু ; কোথাও ধ্বংস প্রাপ্ত জাতির কাহিনী—আদ ও সামুদের কথা, কোথাও অত্যাচারী রাজা-বাদশাদের কাহিনী—ফেরাউন ও কারুনের কথা, কোথাও দূর অতীতের পুরুষ ও রমণী হৃদয়ের পরিণয়ের কথা — ইউসুফ-জোলেখার প্রণয় কাহিনী ইত্যাদি মরুবাসী আরব বেদুঈনকে বিজ্ঞ করে তুলল—ইতিহাসে ও ইতিহাস রচনায় ;মুসলিম জাহান জানতে পারল—শুধু ইতিহাস নয়, জ্ঞানের উৎস কোথায়—পবিত্র কোরআন। এই জ্ঞান-ভাণ্ডার পবিত্র কোরআনই ইতিহাসের মূল উৎস, প্রধান সোপান ও প্রথম সহায়। তাই এই ইতিহাসের যুগ সৃষ্টি করায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি মাঝে মানবমণ্ডলীকে সতর্ক,

সাবধান করার ও সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠালেন তাঁর সর্বশেষ দূত—মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)।

৪। সাহিত্য ও ভাষা ঃ একথা বলাই বাহুল্য যে আরবগণ প্রাক্-ইসলাম যুগ থেকেই কাব্যপ্রিয় জাতি বলে সর্বজনবিদিত। সে যুগের গদ্য রচনা 'মাকামাতে হারিরী' ও পদ্য রচনা 'সাবা মুয়াল্লাকা' সাহিত্যের এমনি উৎকৃষ্ট নিদর্শন যে, আজও সারা বিশ্বের যত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী পড়ান হয়, সেখানকার পাঠ্যক্রমে আজও এদের স্থান অম্লান। সাহিত্যের উৎকর্ষের দিক থেকে এদের মান অতি উচ্চস্তরের। সে যুগের 'কাসিদাহ' নামক প্রেমের কবিতাগুলোকে অবলম্বন করে উমাইয়া যুগের বহু প্রেমের উপাখ্যান রচিত হয়। এ যুগে রাজনৈতিক কবিতারও উন্মেষ দেখা যায়। খলিফা মুয়াবিয়া কর্তৃক মিসাফিন আদ-দারীমি তার পুত্র ইয়াজীদের মনোনয়ন সম্পর্কে বহু কবিতা রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। হাম্মাদ উর রাবিয়াহ নামক একজন কবি জাহিলিয়া (মূর্খ) (৭১৩-৭২) যুগের কবিতা সংগ্রহ করে খলিফার নির্দেশ পালন করেন। ওমর ইবন আবি-রাবিয়া এ যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি অসংখ্য প্রেমের কবিতা রচনা করে আরবদের অভিড আখ্যায় ভূষিত হন। উমাইয়া যুগের চারণ কবিদের মধ্যে—ফারাজদাক, জারীর ও আখতাল বিখ্যাত ছিলেন। আখতাল খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং অত্যন্ত জোরাল ভাষায় উমাইয়াদের খেলাফতের দাবী সমর্থন করতেন। দারীর ও ফারাজদাক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ও উভয়ই ব্যঙ্গ রসাত্মক কবিতায় পারদর্শী ছিলেন। তবে সভাকবি হিসাবে ফারজদাকই (৬৪০-৭৩২খ্রীঃ) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইয়ামেনের জামিল (মৃত্যু ৭০১) 'লায়লা মজনু' আখ্যানকে কেন্দ্র করে বহু প্রেমের কবিতা রচনা করেন। কবি হাম্মাদ-উর-রাবিয়া ২৯০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ কাসিদাহ আবৃত্তি করে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের নিকট হতে ১,০০,০০০ দিরহাম পুরস্কার লাভ করেন। এ যুগের সৃষ্টি লায়লা মজনুর প্রেমের উপাখ্যান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌছায়, এবং বিশ্বসাহিত্যে যা আজও এক অমর সৃষ্টিরূপে গণ্য। এই যুগে আরবী ভাষা সাহিত্যেরও লেখন পদ্ধতির বহু উন্নতি হয় ভাষাবিদ আব্দুল হামিদ কর্তৃক।

৫। বক্তৃতা ও বাগ্মিতা ঃ কবিতা ও বাগ্মিতা আরবদের জন্মগত প্রতিভা তবে এই বল্গাহীন বাগ্মিতাকে, জন্মগত প্রতিভাকে সুষ্ঠুভাবে পথ ধরাল—ইসলাম। শুক্রবারে নামাযের পুর্বে খুৎবা (বক্তৃতা) পাঠ হয়, এবং ঐ উপলক্ষে প্রদত্ত ধর্মীয় ভাষণ মুসলমানদের বাগ্মী করার ও বাগ্মিতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (কঃ) প্রখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। উমাইয়া যুগেও প্রখ্যাত কয়েকজন বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বা ধর্মীয় নেতা হিসেবে, কেহ বা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় রেখে গেছেন। ধর্মীয় বক্তাদের মধ্যে ঈমাম হাসান আলবসরীর বক্তৃতা জগদ্বিখ্যাত, এবং রাজনৈতিক বক্তাদের মধ্যে জিয়াদ বিন আর্বিহ্ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বক্তৃতামালা আজও সাহিত্যে অপূর্ব সম্পদ। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাধ্যক্ষগণও এক একজন উচ্চশ্রেণীর বক্তা বলেই সমাজে সমাদৃত হতেন। আরবরা মনে করতেন—মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য—মানুষ কথা বলতে পারে, প্রাণী বা জীবজন্তু তা পারে না। তাই তাঁরা বাগ্মিতার জন্য সাধনাও করেছেন—সফলও হয়েছেন। আরবদের নারীকুলও বাগ্মিতায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। আরব রমণীকুলই অতি সংকট সময়ে চরম বাগ্মিতা দ্বারা তাঁদের পিতা-পুত্র ও স্বামীকে নানা সঙ্গীতে নানা সংকেতে উৎসাহিত করে শক্তি দিতেন, সাহস দিতেন। উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার বাগ্মিতা আজও প্রবাদবাক্য। উমাইয়া যুগে পুরুষ-রমণী উভয়েরই বাগ্মিতার বহু উৎকর্ষ সাধিত হয়।

৬। দর্শন ঃ (মুতাজিলা) উমাইয়া যুগকে একদিকে 'চিন্তার মুক্তি' যুগও বলা যেতে পারে। কেননা এই যুগে দুটো পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় মতবাদ গড়ে উঠে। একটি অদৃষ্টবাদ অন্যটি মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মদক্ষতা। এই দুটো মতবাদ বা দর্শনকে কেন্দ্র করে দুটো দল গড়ে উঠে। একটির নাম—'জাবরিয়া', যাঁরা অদৃষ্টকে সমর্থন করতেন এবং অন্যটির নাম— 'কাদরিয়া', যাঁরা মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। উমাইয়া খলিফাগণ সাধারণত নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য 'জাবরিয়া' মতবাদকে সমর্থন করতেন। কিন্তু পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণের অনেকেই এই মতবাদকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন নি। দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ও তৃতীয় ইয়াজীদ 'কাদরিয়া' মতে বা 'চিন্তার মুক্তিতে' বিশ্বাসী ছিলেন। কাদরিয়াদের প্রভাবে বা অনুরূপ মতামতে এই যুগেই 'মুতাজিলা' সম্প্রদায়ের উদ্ভব। বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম হাসান-আল-বাসরীর প্রখ্যাত শিষ্য ওয়াসিল ইবন-আতা আপন শিক্ষাগুরুর সাথে মতবিরোধ হলে তিনি তাঁর দল ত্যাগ করায় 'মুতাজিলা' (দলত্যাগী) আখ্যা লাভ করেন। এই হতেই 'মুতাজিলা' সম্প্রদায়ের জন্ম। এই সম্প্রদায় কাদরিয়াদের মত মানুষের স্বাধীন কর্মদক্ষতায় ও চিন্তার মুক্তিতে বিশ্বাসী। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায় আল্লাহর একক অস্তিত্বে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নিজেদের আহ্লুল-আদল্-ওয়াত-তাওহীদ' (সুবিচার ও একত্ববাদে বিশ্বাসী) বলে অভিহিত করতেন। এই যুগেই

বিখ্যাত মহীয়সী মহিলা সাধ্বী রাবেয়া বসরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সাধনা ও তপস্যার জন্য এবং স্বর্গ-নরক ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান বর্জিত ধর্মীয় দর্শনের জন্য চির অমরত্ব লাভ করেছেন।

খারিজী দল ঃ এই যুগের মানুষের স্বাধীন চিন্তাতে ও দর্শনে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি রাজনৈতিক দলেরও আবির্ভাব হয়। খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে এই দলগুলোর জন্ম হয়। যেমন হযরত আলীর (কঃ) সাথে মুয়াবিয়ার সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের পর জন্ম নিল—'খারিজী' দল। এঁরা খলিফা হযরত আলীরই অনুগত ছিলেন, কিন্তু মুয়াবিয়ার প্রতারণামূলক প্রস্তাবে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতিবাদে তাঁরা খারিজী (পৃথক) নাম ধারণ করে দল ত্যাগ করেন। তাঁদের অভিমত ছিল — খলিফা সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হবেন, এই মতবাদের পক্ষে ও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে তাঁরা সমগ্র উমাইয়া রাজত্বকালে বহু রক্তাক্ত সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন।

মুরজিয়া ও শিয়া দল ঃ মুরজিয়াগণের অভিমত ছিল—মুসলমান পাপিষ্ঠ হলেও কাফের হতে পারে না। তাঁরা এই পাপীদের বিচারভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তঁদের মতে উমাইয়াগণ যতই পাপ করুন, তাঁরা মুসলমান, সুতরাং তাঁদের খলিফা হওয়ার অধিকার আছে। এককথায় তাঁরা তাঁদের চিন্তায় উমাইয়া খলিফাদের সমর্থন করতেন। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত একটি দলও ছিল। তাঁরা 'শিয়া' নামে পরিচিত। শিয়াদের স্বাধীন মতবাদ ছিল—সব সাহাবীদের মধ্যে নির্বাচনেও নয়, বলপ্রয়োগেও নয়, শুধু হযরত আলীর বংশধরগণের মধ্য হতেই খলিফা নির্বাচন করতে হবে, এই ছিল তাদের দাবী। এই দিক থেকে মুরজিয়া ও শিয়া দল আপন আপন স্বাধীন মতবাদে পরস্পর চরম বিরোধী দল ছিলেন। রাজনৈতিক পটভূমিকার দিক হতে খারেজীগণের স্বাধীন মতবাদই সুদূর প্রসারী ছিল।

৭। বিজ্ঞান ঃ আরব একদিন যে জ্ঞানালাকে সমগ্র ইউরোপকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, তার সূচনা এই উমাইয়া যুগেই। সাহিত্য, শিল্পকলা, ছাড়াও অঙ্ক, এ্যালজেবরা, ভূবিদ্যা, নৌবিদ্যা, আকাশবিদ্যা, ফলিত বা জ্যোতিষশাস্ত্র, ও জ্যোতির্বিজ্ঞান (অ্যাস্ট্রনমি) চিকিৎসা, রসায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উমাইয়া যুগের সাধনা পূর্বতন বীজরূপে না রয়ে গেলে পরবর্তীকালে আবাবাসীয় যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশছোঁয়া উন্নতি সম্ভব হত কিনা কে জানে। উমাইয়া যুগের পণ্ডিতগণ কোরআনের জ্ঞানালোকে ইঙ্গিত পেয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত হতে থাকলেন। খালদি-ইবন-ইয়াজীদ গ্রীক বিজ্ঞান হতেও আলকেমী,

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেন। ইমাম জাফর আস্‌সাদিক আল-কেমীও জ্যোতিষের প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা বলে আজও বিখ্যাত। এই যুগের ইহুদী ও খ্রীস্টান চিকিৎসকগণও খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করে আরবের জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন।

৮। **চিকিৎসাশাস্ত্র** ঃ আরব বিজ্ঞানীদের মতে বিজ্ঞানের প্রধানত দুটো শাখা। একটি ধর্মসংক্রান্ত ও অন্যটি শরীর সংক্রান্ত। আরব চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রীক ও পারস্য চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত। হিজরীর প্রথম সনে (৬২২ খ্রীঃ) আরব চিকিৎসাশাস্ত্র প্রথম বিকশিত হতে শুরু করে। দক্ষিণ আরবের অন্তর্গত তায়েফের আল হারিস ইবন-কালাদা (৬৩৪) অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রচুর সুনামের অধিকারী হয়ে 'আরবদের চিকিৎসক' ও 'আরবের জাতীয় চিকিৎসক' আখ্যা লাভ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন কতকগুলো জিনিস আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপেও অনুসৃত হয়, মুয়াবিয়ার গৃহ চিকিৎসক ইবন উথাল, হাজ্জাজের গৃহ চিকিৎসক তায়াজুক এবং মারওয়ানের গৃহ চিকিৎসক মাসারযাওয়াহ গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য খলিফা দ্বিতীয় ওমর আলেকজান্দ্রিয়া হতে বহু চিকিৎসকের এস্টিয়েকও হাররানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে এই সাধনা বিশ্ববিখ্যাত হেকেমী শাস্ত্রের জন্ম দেয়।

৯। **রসায়নশাস্ত্র** ঃ চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় আরবগণ রসায়নশাস্ত্রেও যথেষ্ট উন্নতি করেন। দ্বিতীয় উমাইয়া খলিফা ইয়াজীদের পুত্র খালিদ (মৃত্যু ৭০৪ খ্রীঃ) এই শাস্ত্রে অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। তিনি মারওয়ানদের 'চিকিৎসক বা হাকিম' হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ ধৈর্য ও সাধনা দ্বারা গ্রীক ও কপটিক ভাষা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করে আরব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথকে প্রশস্ত করেন। জবির-ইবন হাররান (৭৭৬) রসায়নশাস্ত্রে এই যুগের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ও চিকিৎসক ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে জাফর আল-সাদিকের (৭০০-৭৬৫ খ্রীঃ) নাম আজও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্তমান।

উপসংহার ঃ উমাইয়া যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মোটামুটি একটি রূপরেখা দেওয়া হলো। আরবগণ সেই সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত বলতেন, যাঁরা শুদ্ধভাবে আরবী বলতে ও পড়তে পারতেন, যাঁরা সাঁতার কাটতে ও তীর ছুঁড়তে

পারতেন। যাঁরা উচ্চস্তরের শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তাঁদের ওরা কামিল বা পূর্ণ বলতেন। অবস্থাপন্ন বা বিত্তবান মানুষরা ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষিত করার জন্য আপন আপন গৃহ শিক্ষকও রাখতেন। সাধারণ মানুষও শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। প্রতিটি মসজেদ-সংলগ্ন একটি মক্তব বা মাদ্রাসা থাকত, যেখানে সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ পেত। এখানে প্রথম কোরআন ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হত। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ভার বহন করতেন ধনী শ্রেণীর সৎ ও ধার্মিক মানুষ। এগুলো ছিল তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান, এই নীতি অনুসৃত হয়েছে বহুদিন পর্যন্ত। এমন কি আরবের বাইরেও। আজ দেড় হাজার বছর পরও অনুসন্ধান করলে জানা যাবে এই ভারতেরও এমন কোন একটিও মুসলিম অধ্যুষিত বড় গ্রাম নেই, যেখানে মসজেদ সংলগ্ন একটি ছোট মক্তব বা মাদ্রাসা নেই। যার পরিচালনার জন্য-প্রভূত ওয়াকফ-দেবত্ব। সম্পত্তি সঞ্চিত থাকে। সুতরাং উমাইয়া যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উমাইয়া যুগের সাধনা সফল হয়েছে।

উমাইয়া যুগের চিত্রকলা ও সঙ্গীত শিল্প : (Art and Music in Umayyad period)

১। চিত্রকলা (Art) : চিত্রকলা ও সঙ্গীত প্রতিটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শন । কিন্তু ইসলাম জগতের সংস্কৃতির ইতিহাসের পাতায় এদের কোন প্রাধান্য বা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ছবি আঁকা ও গান বাজনাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণার চোখে দেখেছেন। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) মানুষ এবং প্রাণীজগতের ছবি আঁকাকে উৎসাহিত না করে বরং নিরুৎসাহিতই করেছেন। নিরাকার আল্লাহর দূত মহানবী প্রাণীজগৎকে নিজ হাতে আকারে এনে ও এঁকে তাদের প্রতিষ্ঠা করা কোনদিনই পছন্দ করেন নি। এর মূলে ছিল তাঁর কঠোর 'ওয়াহদানিয়াত, বা একেশ্বরবাদ নীতি। কোন মূর্তি বা প্রতিমূর্তি কোনদিনই যাতে এক আল্লাহর স্থানে স্থানাভিষিক্ত না হয়ে পড়ে এই দিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও নিপুণ সতর্কতা। এখানে আল্লাহর দূত ছিলেন আপোষহীন অনন্য মানুষ। সঙ্গীত সম্পর্কেও মহানবীর সতর্কবাণী ছিল যেন মানব চরিত্র কলুষিত না হয়। এখানেই তাঁর ছিল সতর্কতা। সুতরাং মহানবীর (দঃ) এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে উঠল—মুসলিম জাহানের চিত্রকলা ও সঙ্গীত জগৎ। তাই মুসলিম জাহানের চিত্রকলা ফুটে উঠল—উদ্ভিদজগৎ-প্রাকৃতিকজগৎ এবং নক্সাজগৎকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যেও স্থান লাভ করল—দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা, জয়-বিজয় ইত্যাদির প্রতীক

রূপ। কিন্তু উমাইয়া যুগে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। কোথাও বন্য-পশুর ছবি, কোথাও ব্যাঘ্রের হরিণ আক্রমণ, কোথাও হিংস্র বন্য পশুর লড়াই, কোথাও তাদের যৌন মিলনের নগ্নরূপ ইত্যাদি। আবার মনুষ্য জগতের ছবি আঁকতে উমাইয়া যুগ কম পারদর্শিতার পরিচয় দেয়নি। খলিফাদের দরবার হতে অগণিত সুন্দরীদের বালাখানায় (হারেমে)—কোথাও নর্তকী, কোথাও গায়িকা, কোথাও বিচারালয়ের নিস্তব্ধ দৃশ্য।

২। **সঙ্গীত বা গান-বাজনা ঃ** (Music) যদিও মুসলিম ধর্মান্ধ ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ গান-বাজনাকে ঘৃণার চোখেই দেখেছিলেন, তবুও উমাইয়া যুগে এদের প্রচলন ছিল ব্যাপক, উন্নতি ও উৎকর্ষ ছিল— অসাধারণ। গান-বাজনার উন্নতি সাধনের জন্য গায়ক বা গায়িকা ও বাদক বা বাদকীর জন্য উচ্চহারে বেতন নির্ধারিত থাকত, খলিফাগণ উন্নত গায়ক ও বাদকদের দেশের দূর প্রান্ত হতে আনয়ন করে রাজসভাকে অলংকৃত করতেন। প্রধান যন্ত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো ছিল—প্রাক-ইসলামি যুগের, এবং কতকগুলোকে পারস্য ও রোম হতে আমদানি করা হয়। এইভাবে উমাইয়া খলিফাদের দরবার সঙ্গীতের মধুর কলতানে কল্লোলিত হয়ে উঠত। আবার বেদুঈনের অকৃত্রিম অনুরাগ পারস্যের উৎকর্ষ, রোমের নিপুণতা ও খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা এক সঙ্গে মিলিতভাবে আরব-সঙ্গীত জগতে আনল বিশ্ব জোয়ারের ডাক। বিশ্ব যেন সঙ্গীত জগতের নতুন স্বাদ লাভ করল। যন্ত্রের এই সফলতা ও উৎকর্ষ যেমন আরব খলিফাদের গৌরব, সঙ্গীতের ঐ সার্থকতা ও সৌন্দর্য তেমনি উমাইয়া যুগের সৌরভ। সঙ্গীত জগতে এই জগৎ জোড়া গৌরব ও সৌরভ আজও মুসলিম জাহানের গর্বের বস্তু।

উমাইয়া যুগে সঙ্গীতচর্চা এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে একটি সম্প্রদায় শুধু সঙ্গীতকেই তাঁদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়কে 'মুখান্নাসুন' নামে অভিহিত করা হত। পরবর্তীকালে এই 'মুখান্নাসুন' গোষ্ঠী বহু জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতকারের জন্ম দেয়। সঙ্গীত সম্প্রদায় নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় জগতের সঙ্গীত ইতিহাসে বিরল। সঙ্গীতে উমাইয়া যুগ এই বিরল ইতিহাসের জন্মদাতা।

মদীনার তুয়ায়েস্ (৬৩২-৭১০ খ্রীঃ) ইসলামি সঙ্গীতের জনক বলে অভিহিত হন। প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে কয়েক শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, যেমন—সামাজিক সঙ্গীত, উষ্ট্রচালকের সঙ্গীত, প্রেমের সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত ইত্যাদি। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল—উষ্ট্রচালকের সঙ্গীত, যাকে 'হুদা'

বলা হত। তখন আরবে কবিতা আবৃত্তির প্রথা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ীকে আরবে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ-বিদ্বান বলে সসম্মানে ভূষিত করা হত। এই কবিতা আবৃত্তি সঙ্গীতেরই পর্যায়ে পড়ত। প্রাক-ইসলামি যুগে বাঁশি ও দফ্ খুবই জনপ্রিয় ছিল। এমন কি মহানবীকে (দঃ) যখন মদীনাবাসীগণ স্বাগতম সহকারে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তখনও তাঁরা আনন্দে দফ্ বাজিয়েছিলেন, শিশু, বালক-বালিকারা বাঁশি বাজিয়ে মহানন্দে নৃত্য করেছিল। তখন তাঁরা সকলে মিলিতভাবে বারিদার রচিত যে সঙ্গীতটি আবৃত্তি করেছিলেন, তার বঙ্গানুবাদ ঃ

এসেছেন শান্তি রাজ, শান্তি দিতে মানবে
সন্ধির স্থপয়িতা রুখে দিবে দানবে,
নিখিলের অনুপম নিরুপম নিষ্ঠা
ন্যায় ও বিচারে হবে শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং মক্কা ও মদীনার নর-নারী-বালক-বালিকা যে সঙ্গীতপ্রিয় ছিল, এ কথায় কোন সন্দেহ নাই। প্রখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ আল-সুবায়েজ ৭২০ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম খলিফা হিশামের দরবারে পারস্য দেশীয় বাদ্যযন্ত্র আনয়ন করে আরবদেশের সঙ্গীতে নতুন দিশা সংযোজন করেন। এইভাবে মদীনার তুয়ায়েস সর্বপ্রথম আরবী সঙ্গীতে ঝঙ্কার প্রবর্তন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তুয়ায়েসের প্রধান শিষ্য ইবন-সুবায়েজ চারজন শ্রেষ্ঠ আরব-সঙ্গীত বিশারদের একজন ছিলেন। মক্কাবাসী নিগ্রো সাইন-বিন-মিসজাহ উমাইয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বলে ভূষিত হন। সে যুগের গায়ক হিসেবে মারাদের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এতদ্ব্যতীত মুহ্বীজ ও গারিবের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইয়াজীদের (৭২০) দরবারে গায়িকা জামিলা, ও হারেমের মধ্যে হাবীবা ও সাল্লামার নাম ইতিহাস বিখ্যাত।

উমাইয়াদের এই সঙ্গীতচর্চা এতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল যে পবিত্র হজের সময় হজ যাত্রীদের দৃষ্টিও তাঁরা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উমাইয়া যুগে মক্কা ও মদীনা গান বাজনার ধাত্রীগৃহ ও সংরক্ষণশালা রূপে পরিগণিত হয়েছিল। এবং তাঁরাই দামেস্কে খলিফার দরবারে পাঠাতেন সঙ্গীতবিশারদ ও যন্ত্রবিশারদ প্রতিভাধরদের। এই দিক থেকে উমাইয়া যুগে মক্কা ও মদীনা ছিল —উন্নত আরব সঙ্গীত জগতের সূতীকাগার। উমাইয়া দ্বিতীয় খলিফা অর্থাৎ মুয়াবিয়ার পুত্র প্রথম ইয়াজীদ তাঁর রাজসভায় সঙ্গীতের চর্চাকে যথাযথভাবে সমাদৃত করে

ও রাজ-সম্মান দিয়ে মুসলিম রাজদরবারে গান-বাজনার দ্বারোদঘাটন করেন। পরবর্তীকালে খলিফা দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফাই কম বেশি এই পথেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে আরব-সঙ্গীত জগতে বহু ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর পুরুষের জন্ম দেন। উমাইয়া যুগের শেষ প্রান্তে আববাসীয়গণ তাঁদের আন্দোলনে উমাইয়াদের এই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতচর্চাকে ইসলাম বিরোধী বলে প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন।

উমাইয়া যুগের স্থাপত্য-শিল্প (Architecture) ঃ

[**স্থাপত্য শিল্পের প্রধান দিক** ঃ প্রথম স্থাপত্য শিল্প—আরবের প্রেরণা ও অনারবের অভিজ্ঞতা—বিশ্ব শিল্পের মিলন প্রধান ছয়টি মসজেদ —মসজেদের তিনটি বিশেষ জিনিস ঃ— মিহরাব—মিনার—মিম্বর—ডোম অব দ্য রক।]

প্রথম স্থাপত্য শিল্প মসজেদ ঃ স্থাপত্য শিল্প বলতে প্রধানত অট্টালিকা সৌধ দালান-কোঠাবাড়ি মসজেদ ও গীর্জা প্রভৃতিকে বোঝায়। এই শিল্প সম্পর্কে একথা বললেও কোন অতিরঞ্জন করা হবে না যে, পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী প্রথম ও প্রধান শিল্প বলতে —স্থাপত্য শিল্পই। আরব মুসলিম জগতের কথা বলতে গেলে তথাকার শিল্পজগৎ তার প্রথম যে ভাবমূর্তি দর্শন করল, তার প্রথম সূচনার ও সৃষ্টির যে শুভ উদ্বোধন হল, আবার সেই সূচনা যে সৌন্দর্যের ষোলকলায় শোভিত হয়ে উঠল, সম্পূর্ণ হয়ে উঠল, তা ছিল ধর্মীয়-স্থাপত্য শিল্প সমজেদ। এইভাবে আমরা বিভিন্ন মসজেদের মধ্যে মুসলিম সভ্যতার স্থপত্য শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের বিশ্বকেন্দ্রিক একটা সংক্ষিপ্তসার ও ছাপ লক্ষ্য করি। সম্ভবত মুসলিম-জাহানে এমন একটা জিনিসও নেই যা মসজেদ অপেক্ষা মুসলিম জাহানের স্থাপত্য শিল্পকে অতি সুন্দরভবে তুলে ধরতে পারে। সুতরাং মসজেদই মুসলিম জাহানের স্থাপত্য শিল্পের প্রথম ও প্রধান প্রতীক।

আরবের প্রেরণা ও অনারবের অভিজ্ঞতা ঃ মদীনার সরল-সহজ অনাড়ম্বর মসজেদে নববী অর্থাৎ নবীর-মসজেদ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে সকল মসজেদের আদর্শ স্থানীয় ছিল। কালক্রমে ইসলামের প্রসারতা ও বিস্তৃতি এক বিশাল রূপ ধারণ করল। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে মুসলমানগণ অধিকারী হলেন বহু সম্পদের ও বহু সৌধের। এই সৌধগুলোর কতকগুলো ছিল প্রাচীন, কতকগুলো ছিল অতি প্রাচীন। সেগুলো নানা সভ্যতার প্রতীক স্বরূপ ছিল। এইভাবে আরব মুসলিম জাহান এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার প্রাচীন ও নব সভ্যতার সাথে লীন হয়ে গেল। গড়ে উঠল জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির নব যুগ, নব-চেতনা। সৃষ্টি হল নতুন শিল্প ও স্থাপত্য সম্ভার। কত দেশের কর্ত

জাতি তাঁদের যুগ-যুগান্তের সাধনা-দ্বারা তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন—তাঁদের জাতীয় জীবনের সাহিত্য ও শিল্প সম্ভারকে, চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পকে। আরব মুসলিম জাহান একদিনে অধিকারে লাভ করলেন বহু জাতির বহু দিনের সেই অভিজ্ঞতাকে। এইভাবে আরবদের নব জীবনের অনুপ্রেরণা ও অনারব প্রাচীনদের অভিজ্ঞতা এই দুয়ে মিলে আরব স্থাপত্য শিল্পকে সৌন্দর্যে সুষমায় করল অসাধারণ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিশ্ব শিল্পের মিলন ঃ সিরিয়ার মুসলিম স্থাপত্য প্রভাবান্বিত হল তথাকার প্রাচীন সিরিয় বাইজানটাইন খ্রীস্টান ও রোমান ঐতিহ্য দ্বারা। পারস্য ও মেসোপটেমিয়াতেও আমরা একই জিনিস লক্ষ্য করি, মুসলিম স্থাপত্য উৎকর্ষ লাভ করছে তথাকার মেসোপটেমিয়ান খ্রীস্টানদের সংস্পর্শে, অনুরূপভাবে মিশরেও লক্ষ্য করা যায় প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার প্রতীক মিশরবাসীদের স্থাপত্য শিল্পের অঙ্গসজ্জাও আরব মুসলিম জাহানকে কম মুগ্ধ করেনি। আরব মুসলিম জাহান তথা উমাইয়া খলিফাগণ সংকীর্ণতার সমস্ত গ্লানিকে পরিত্যাগ করে খোলা মনে খোলা প্রাণে বিশ্ব-স্থাপত্য শিল্পের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। জাতীয় জীবনে স্থাপত্য শিল্পের জগাতে তাঁদের এই উদার দৃষ্টি ব্যর্থ যায়নি। বরং পরবর্তী জীবনে সৃষ্টি করেছে জগৎ স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, যা আজও তুলনাহীন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যেমন ভারতের 'তাজমহল' ও স্পেনের 'আলহামরা'। উমাইয়া খলিফাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আরব স্থাপত্য শিল্পে প্রধানত বিশ্বস্থাপত্য শিল্পের চারটি ধারার মহামিলন ঘটল, এবং সৃষ্টি করল কালজয়ী মুসলিম স্থাপত্য শিল্প। এই চারটি ঃ (১) সিরীয় মিশরীয় ধারা অর্থাৎ খ্রীস্টান রোমান ধারা, (২) ইরাকীয় পারস্য ধারা, (৩) স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার ধারা, (৪) ভারতীয় ধারা।

প্রথম যুগের প্রধান ছয়টি মসজেদ ঃ বিজিত রাজ্যসমূহে যে সমস্ত মসজেদগুলো আরব স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন রূপে গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে ছয়টি প্রধান ঃ (১) বিজিত রাজ্যগুলোর মধ্যে উৎবা কর্তৃক বসরায় প্রথম মসজেদ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে খলিফা ওমরের গভর্নর মুসা-আল-আশারী এই মসজেদটি পুনর্নির্মাণ করে। (২) ৬৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সেনাপতি সাদ কুফাতে একটি সেনানিবাস বা দুর্গ তৈরি করে তার মধেও একটি সরল মসজেদ নির্মাণ করেন। পরে মুয়াবিয়ার গভর্নর যায়েদ এই মসজেদটিকে সাসানাইদ আদর্শে রূপান্তরিত করে এর শিল্প মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (৩) তৃতীয় বিশেষ মসজেদ নির্মিত হয়েছিল আমর বিন-আল-আস কর্তৃক আফ্রিকার ফুসতাতে।

৬৪২ খ্রীস্টাব্দে আমর তথায় একটি সেনানিবাস তৈরি করেন। এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকার মাটিতে প্রথম একটি মসজেদ নির্মাণ করেন। এই মসজেদটি ছিল আফ্রিকার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অনেকটা ঐতিহ্যবাহী। (৪) উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদ দামেস্কের সেন্ট জোহনের গীর্জাকে মসজেদে রূপান্তরিত করে এবং তার বিপুল সংস্কার সাধন দ্বারা মুসলিম স্থাপত্যের এক বিরাট নিদর্শন তুলে ধরেন। (৫) পরবর্তী প্রসিদ্ধ মসজেদ বলতে উকবা কর্তৃক কায়রোর মসজেদ। এটাও ছিল ফুস্‌তাতের ন্যায় সেনানিবাস অন্তর্গত একটি মসজেদ। এই মসজেদটির একটি বিশেষত্ব এই যে, মসজেদটি বহুবার তার উত্তরসূরীদের দ্বারা সংস্কার সাধনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, এবং এটার শেষ সংস্কারক ছিলেন আগলাবাইদ সুলতান জিয়াদৎ-উল্লাহ্। তখন হতে আজ পর্যন্ত এই মসজেদটি ইসলাম জগতের অতি পবিত্র স্থানের মর্যাদা লাভ করে আসছে। (৬) ইসলাম জগতের বিজিত রাজ্যের ষষ্ঠ মসজেদটি বিশ্ব-সংস্কৃতির মিলনের এক অপূর্ব কীর্তি তুলে ধরেছিল। হিমসে অবস্থানরত গীর্জাটি মুসলিম খলিফাদের দ্বারা মসজেদে রূপান্তরিত হলেও খলিফাদেরই নির্দেশে ওটা খ্রীস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় দ্বারাই তাদের আপন আপন প্রার্থনাগার, গীর্জা, ও মসজেদ রূপে ব্যবহৃত হত। বিশ্ব ইতিহাসেও মানব জাতির ধর্মীয় মিলনের এ দৃষ্টান্ত বিরল। এটাও উমাইয়া খলিফাগণের উদারতারই এক অনুপম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ আজকের দিনের অনেক মুসলমান মনে করেন কোন বিধর্মী কোন মসজেদে পা দিলে তা (নাপাক) অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু এ সুমহান শিক্ষা মহানবীরই (দঃ)। তিনি মসজেদ নব্বীতে অর্থাৎ মদীনার মসজেদে বহু বিধর্মীদেরও আলোচনার জন্য আহ্বান দিতেন, আবার প্রার্থনার সময় হলে সকলকেই অনুমতি দিতেন সেইখানেই আপন আপন ধর্মানুযায়ী প্রার্থনা শেষ করতে। উদারতার কি সমুজ্জ্বল উপমা, মিলনের কি মহান দৃষ্টান্ত যা আজকের বিশ্বে একান্ত প্রয়োজন।

মসজেদের তিনটি বিশেষ জিনিস ঃ

১. **মিহ্‌রাব ঃ** মিহ্‌রাব শব্দটি ইসলাম জগতে আসার পূর্বে এর প্রথম অর্থ ছিল—কোন রাজপ্রাসাদের অংশ বিশেষ, কুলঙ্গি বা তাক বিশেষ, যেখানে কোন কিছুকে রাখা হত, বা হয়। অনেক সময় খ্রীস্টানগণ এখানে তাঁদের বিশেষ পাদ্রীর মূর্তিকে রাখতেন। আরব জগতেও এর নিশান পাওয়া যায়। দক্ষিণ আরবের 'মিকরাব' শব্দ হতে মিহ্‌রাব, মিকরাব শব্দের অর্থ মন্দির, গীর্জা বা উপাসনালয় ও ইবাদৎখানা বিশেষ। পবিত্র কোরআনেও এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যখন যাকারিয়া 'কক্ষে' দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল। সূরা ইম্‌রান ৩ ঃ ৩৯। এখানে

'মিহ্‌রাব' 'কক্ষ' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। "ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী 'প্রাসাদ' মূর্তি, বৃহদাকার হাউজসদৃশ পত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিতবৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত"। সূরা সাবা ;৩৪ ঃ ১৩। এখানে 'প্রাসাদ' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। "যারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করল," সূরা সাদ ; ৩৮ ঃ ২১। এখানে 'ইবাদতখানা' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আমরা জানতে পারলাম 'মিহ্‌রাব' শব্দটি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই খ্রীস্টান ও আরব জগতে প্রচলিত ছিল। এবং কোরআন শরীফেও যার স্পষ্ট প্রয়োগ দেখতে পেলাম।

মিহ্‌রাব কি এবং কখন ব্যবহৃত হল ঃ কিন্তু এবার প্রশ্ন হল—'মিহ্‌রাব' ইসলাম জগতের 'মসজেদে কখন হতে ব্যবহৃত হল, এবং কিরূপে বা কিভাবে 'মিহ্‌রাব' মসজেদে ব্যবহৃত হল বা স্থান পেল। বর্তমান মুসলিম জগতের মসজেদে যে মিহ্‌রাব আমরা লক্ষ্য করি, তা — মসজেদের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থানে দেওয়ালের যে অংশটি সাধারণত বাহিরের দিকে সামান্য বেঁকে ভিতরে যে একটু স্থানের সংকুলান করে। এবং যেখানে দাঁড়িয়ে 'ইমাম' জামাতের (সকলের) নামায পরিচালনা করেন, ঐ স্থানটিকে 'মিহ্‌রাব' বলা হয়। কিন্তু এই প্রথার প্রচলন স্বয়ং মহানবীর (সাঃ) সময়ে ৬২২—৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মদীনার মসজেদেও দেখা যায় না। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়েও (৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ) লক্ষ্য করা যায় না। তবে এর পরবর্তী সময়ে ঠিক দিনক্ষণ ধরে কখন মিহ্‌রাব মসজেদে ব্যবহৃত হল, সেকথা কেহই বলতে পারেন নি; তবে কারো কারো অভিমত প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া এটার প্রথম প্রচলন করেন — ৬৬১-৬৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু কেহই একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন নি। মুসলিম জগতের মসজেদে 'মিহ্‌রাব' ব্যবহারের সময় সম্পর্কে যে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা — প্রথম উমাইয়া খলিফা — মুয়াবিয়ার গভর্নর মাসালামা বিন মুখাল্লাদ কর্তৃক তৈরি মিহ্‌রাব — (৪৭-৬২ হিজরী, ৬৬৭-৬৮২ খ্রীঃ)। এবং খলিফা আব্দুল মালিকের ভ্রাতা ও গভর্নর আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান কর্তৃক প্রস্তুত মিহ্‌রাব— (৬৫-৮৫ হিঃ, ৬৮৫-৭০৪ খ্রীঃ)। অতঃপর উমাইয়া খলিফা প্রথম আল্-ওয়ালিদের রাজত্বকাল-(৭০৫-৭১৫ খ্রীঃ)। এবং এই সময়ে যে মসজেদটিতে প্রথম মিহ্‌রাব তৈরি করা হয়, সেটি মিশরের আল্-ফুসতাতের মসজেদ।

২. মিনার।। উৎপত্তি ও অর্থ ঃ তিনটি নামে 'মিনার'-কে আমরা লক্ষ্য করি, যেমন— প্রথম 'মাযামা' বা 'মিযান' যার অর্থ 'আযানের স্থান', ইহা মিশর ও সিরিয়াতে এই ভাবে ব্যবহৃত হত ; দ্বিতীয় 'সাওয়ামেয়ু' যার অর্থ ক্ষুদ্র কুটীর

বা ঘর, যার ব্যবহার লক্ষ্য করি উত্তর আফ্রিকায়। পবিত্র কোরআনেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—"খ্রীস্টান বৈরাগীদের উপাসনা-স্থান" ২২ ঃ ৪০। তৃতীয়—মানারা, যার অর্থ আলোকের স্থান, বা পাহারা-কক্ষ ইত্যাদি।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় মিনারের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক-রোম-বাইজানটাইনগণও প্রাচীনকালে মিনারকে পাহারা কক্ষ রূপে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে মসজেদে এইটারই সংস্করণ হল 'মানারা' রূপে, যেখানে হত দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের জন্য আলো বা প্রদীপ দ্বারা সংকেত করা হত।

ইসলাম জগতে মিনার ঃ স্বয়ং মহানবীর (সাঃ) সময় যখন প্রথম 'আযান' প্রবর্তিত হয়, তখন মহানবীর নির্দেশক্রমে ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জীন হযরত বেলাল (রাঃ) মদীনা-মসজেদ সংলগ্ন উচ্চ বাড়ির ছাদ হতে 'আযান' দিতেন। তখনও মসজেদ-নববীতে কোন মিনার ছিল না। এমন কি যখন মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রীঃ) হল, তখন মহানবী (সাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে কাবার ছাদ হতে আযান দিতে নির্দেশ দেন, অর্থাৎ তখনও কাবা শরীফে কোন মিনার ছিল না। সুতরাং মহানবীর (সাঃ) সময়ে ইসলাম-জগতের কোন মসজেদেই আমরা 'মিনার' লক্ষ্য করছি না। এমন কি খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ও আমরা মিনার পাই না। সবের ঊর্ধ্বে মিনার যখন সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হতে শুরু হচ্ছে, তখন দুটি উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধিত হয়, (১) আযান দেওয়ার জন্য; (২) জাতীয়-জীবনে সাবধান ও সতর্কতা বাণী উচ্চারণের জন্যে। এখানে মিনারে গ্রীক ও রোমান-সভ্যতার প্রভাব লক্ষণীয়।

মিশরে প্রথম ব্যবহার ঃ মিশরীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন— প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার নির্দেশে তাঁর গভর্নর মাসালামা বিন মুখাল্লাদ ৫৩ হিজরী, ৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে ফুসতাতের মসজেদের চার কোণে — 'সাওয়ামেয়্' ক্ষুদ্র ঘর তৈরি করেন। তিনি সমগ্র ফুসতাতের সকল মসজেদেই এরূপ করতে থাকেন। এইগুলিই মিনার নামে পরিচিত হয় এবং এদের সিঁড়িগুলো ছিল—মসজেদের বাইরে। এই ভাবে প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে আমরা মসজেদে প্রথম মিনার লক্ষ্য করি, যার ব্যবহার শুধু আযানে সীমিত ছিল না, বরং সতর্কতার জন্যও ব্যবহৃত হত। সকল মসজেদে এই মিনারের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করল— উমাইয়া খলিফা প্রথম আল ওয়ালিদের সময়। এই সময় খলিফার গভর্নর দ্বিতীয় ওমর মদীনার মসজেদে-নববীতে প্রথম মিনার প্রচলন করেন। এই ভাবে সমগ্র ইসলাম জগতে মিনার চরম জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইসলাম ধর্মের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন—উমাইয়া যুগে মিনারের

এত ব্যাপক প্রচলন হওয়ার মূলে ছিল — গীর্জার প্রভাব। তখনকার দিনে প্রতিটি গীর্জার একটি অংশ বিশেষ ছিল ঐ টাওয়ার বা মিনারগুলো। বর্তমান যুগে দূর হতে বা বাহির হতে পাকা মসজেদের প্রধান চিহ্ন বলতে মিনারকেই বুঝায়। কিন্তু আজিও কোন কাদার গড়া মস্‌জেদে এর কোন ব্যবহার নাই, যার জন্য ইসলাম ধর্মের কোন অঙ্গ হানিও হয় না। সুতরাং মিনার ইসলাম ধর্মে কোন আবশ্যিক অঙ্গ নহে। আযান দেওয়ার জন্য একটি মিনার থাকলেও, মসজেদের চারকোণে যা দেখা যায়, সেগুলো শুধু স্থাপত্য শিল্পের নুতন ও পুরাতন নিদর্শন মাত্র।

৩. মিমবর বা মিন্‌বর ঃ

উৎপত্তি ও অর্থ ঃ স্বয়ং মহানবী (সাঃ)-এর সময়েই মিমবরের উৎপত্তি। এর উৎপত্তি নবর ধাতু হতে, যার অর্থ উচ্চ, পরিভাষাগত অর্থ—'আসন', 'কুরসী' ইত্যাদি। বহুকাল পূর্ব হতে আরবগণ যখন কোন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতেন, তখন উচ্চ স্থানে 'আসন' গ্রহণ করতেন, যাতে শ্রোতৃমণ্ডলী সহজে বক্তার কথা শুনতে ও বুঝতে পারে। পরবর্তীকালে মহানবীও (সাঃ) আরবের এই চিরাচরিত জাতীয় প্রথাটিকে আপন জীবনে প্রয়োগ করেন। কোন সময় উটের পিঠে আরোহণ করে, আবার কখন সাফামারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করে বক্তৃতা করতেন। সুতরাং মিম্‌বরের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—যার উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়া বা বক্তৃতা দেওয়া। অনেক সময় মিম্‌বরকে শক্তিধর রাজা-বাদশার সিংহাসনও বলা হত। কিন্তু ইসলামের চোখে মিম্‌বর সম্পূর্ণভাবে খুৎবা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইসলামে মিম্‌বরের স্থান ঃ মহানবীর (সাঃ) প্রিয় শহর মদীনার বুকে প্রথম মসজেদে নববীতে 'মিমবর' ব্যবহৃত হয়। এটা মিহ্‌রাবের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এটা প্রথমে ছিল একটি উচ্চ 'আসন', যার নিচে ছিল দুটো সোপান বা সিঁড়ি। মহানবী (সাঃ) এই সিঁড়ি দুটো ব্যবহার করে মিম্‌বার বা আসনে আরোহণ করে খুৎবা বা বক্তৃতা দিতেন। মহানবীর (সাঃ) পর ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) মহানবীর (সাঃ) ঐ ব্যবহৃত 'আসন'টিকে অর্থাৎ মিম্‌বরটিকে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহার না করে মিম্‌বর সংলগ্ন দ্বিতীয় সিঁড়িটিকে মিমবর রূপে ব্যবহার করেন, এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ও প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের (রাঃ) ব্যবহৃত ঐ দ্বিতীয় মিমবর রূপ সিঁড়িটাকে মিম্‌বর রূপে ব্যবহার না করে প্রথম সিঁড়িটিকেই মিমবর রূপে ব্যবহার করেন। হযরত আবুবকরের (রাঃ) প্রতি এটা ছিল তাঁর চরম শ্রদ্ধার প্রকাশ। পরবর্তীকালে খলিফাগণ ঐ প্রথম সিঁড়িটিকেই মিমবর রূপে ব্যবহার

করতে থাকেন। এবং সেই দিন হতে আজ পর্যন্ত সারা মুসলিম জাহানের প্রতিটি মসজেদে ঐ একই প্রথা প্রচলিত আছে।

মিমবর স্থানান্তরণ ঃ এই মিমবরগুলো স্থানান্তরণ যোগ্য ছিল। তাই প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া যখন চেষ্টা করেছিলেন মদীনার মসজেদের মিমবরটিকে দামেস্কে স্থানান্তরিত করতে, তখন মদীনাবাসীগণ তাঁকে এককথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—সিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়া যত সহজ, তা অপেক্ষা বহুগুণে শক্ত মহানবীর (সাঃ) মিম্বরকে মদীনা হতে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া। মদীনাবাসীর নিকট সমগ্র আরব সাম্রাজ্য মহানবীর (সাঃ) মিমবরটির নিকট অতি তুচ্ছ বা নগণ্য বস্তু ছিল। তাই শক্তিধর সম্রাট মুয়াবিয়া তাঁর ইচ্ছা বা বাসনাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শাসকের সিংহাসন হতে সমাজের আসন—মিনবর বা মিম্বর ঃ উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার সময় থেকে মিনবর বা মিমবরকে শাসকের আসন রূপেও ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি প্রাদেশিক গভর্নরদেরও আমরা মিমবর ব্যবহার করতে দেখি খলিফার প্রতিনিধি রূপে। শাসকগণ উচ্চস্থানে উপবিষ্ট হয়ে তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও বিরল নয়। যে কোন বিচারালয়ে প্রবেশ করলেই নজরে পড়ে বিচারক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং মিমবর বা মিনবর মানুষের জীবনযাত্রার ও সমাজ জীবনের অঙ্গ স্বরূপ ছিল ও আছে। এবং ইসলাম ধর্ম মানুষের এই সমাজ জীবনেরই ব্যবস্থাপনা, তাই ইসলামের সংজ্ঞা বলতে—সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবন ব্যবস্থা ও জীবন চেতনা। অতএব আমাদের সমাজ-জীবনে যা সত্য, যা সুন্দর ইসলাম তাকে নির্বিবাদে সাদরে বরণ করেছে, গ্রহণ করেছে। মিম্বর বা মিন্বর ইসলামের সেই সাদরে গ্রহণীয় বস্তু।

মিম্বরের উপাদান ঃ যে মিমবরকে আমরা কোথাও শাসকের সিংহাসন, কোথাও সমাজের আসন, কোথাও মসজেদের 'খুৎবা' দেওয়ার উচ্চ আসন রূপে পেলাম, তার প্রস্তুতি পর্ব লক্ষ্য করি—প্রাচীনকালে কাঠের মিম্বর, উমাইয়া যুগে পাথর ও লোহার মিম্বর, পরবর্তীকালে ইটের মিম্বর।

মসজেদের শ্রেষ্ঠস্থান মিম্বর ঃ কাবা শরীফকে যেমন আচ্ছাদিত করা থাকে তেমনি মদীনার মসজেদ নববীতে মহানবীর (সাঃ) ব্যবহৃত মিমবরটিকে হযরত ওসমান (রাঃ) আচ্ছাদিত করার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে খলিফা মুয়াবিয়া ঐটিকে দামেস্কে স্থানান্তরিত করতে অক্ষম হয়ে তিনি তাকে সসম্মানে ঢাকার ব্যবস্থা করেন। আব্বাসীয় খলিফাগণও বাগদাদ হতে নতুন কিসওয়া (চাদর

বিশেষ) দ্বারা প্রতি বছর ঐ সম্মানিত মিম্বরটিকে ঢাকার ব্যবস্থা করেন। সমগ্র মুসলিম জাহানে প্রতিটি মসজেদেই মিম্বর আজ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের স্থান। সকল মুসলমানেরই অকৃত্রিম বিশ্বাস— যদি কোন ব্যক্তি যে-কোন মসজেদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলেন বা মিথ্যা শপথ করেন, তা হলে তার পরিণতি অনিবার্যভাবেই মহা ভয়াবহ ও ভীষণ মারাত্মক হবে।

ডোম-অব-দি-রক ঃ (প্রস্তর গম্বুজ) ঃ উমাইয়া যুগের স্থাপত্য শিল্পের অন্য একটি অপূর্ব নিদর্শন — ডোম-অব-দি-রক। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে যখন জেরুজালেম পরিদর্শন করেন, তখন মরিয়াহ পাহাড় অঞ্চলে প্রথম একটি মসজেদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে খলিফা আব্দুল মালিক ঐ অঞ্চলে 'কুববাতুস্ সাখ্‌রা' প্রস্তর গম্বুজ নামে মসজেদ নির্মাণ করেন। ইহা ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি গোলাকার সৌধ। এর মধ্যভাগে আছে একটি পবিত্র পাথর। বাইজানটাইন স্থাপত্য রীতির প্রভাবে নির্মিত এই সৌধটি সৌন্দর্যে শিল্পকলায় সমগ্র উমাইয়া যুগের একটি অতুলনীয় সৃষ্টি। খলিফা আব্দুল মালিকের সময় হেজাজ ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের অধীনে। সুতরাং মক্কা ও মদীনার আব্দুল মালিকের কোন প্রভাব প্রথম দিকে না থাকায় খলিফা মক্কা হতে হজ যাত্রীদের দৃষ্টি জেরুজালেমের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই ডোম-অব-দি-রকের সৃষ্টি করে তার মধ্যে হাজারুল আসওয়াদের (কাল পাথর) ন্যায় একটি পবিত্র পাথর স্থাপন করে। শিল্পকলার দিক থেকে তাঁর সৃষ্ট স্থাপত্য জগতে অতুলনীয় বস্তুর স্থান লাভ করলেও খলিফার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি, অর্থাৎ কোন হজ যাত্রীই মক্কার কাবার পরিবর্তে জেরুজালেমের রককে গ্রহণ করেনি।

উপসংহার ঃ উপসংহারে উমাইয়া যুগের স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বলা যায় যে, উমাইয়া খলিফাগণ স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাই তাঁদের যুগে স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষও সাধিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় আরব স্থাপত্য শিল্প ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর। ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে মুসলিমগণ দেশ বিদেশের নানা স্থাপত্য শিল্পের সাথে যেমন পরিচিত হন, তেমনি প্রভাবান্বিতও হন। মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সূচনা মসজেদকে কেন্দ্র করেই। আবার বিশ্ব মসজেদের আদর্শ মসজেদ বলতে মদীনার মহানবীর (সাঃ) মসজেদ। তাই মুসলিম জাহানের মসজেদগুলো মদীনার মসজেদের অনুকরণ করে গড়ে ওঠে। মসজেদের প্রধান উপকরণ বলতে আমরা পেলাম— মিহরাব, মিনার, মিনবর, সাহন বা চত্বর, মাক্‌সুরা (মুয়াবিয়া) কর্তৃক ব্যবহৃত ইত্যাদি। উমাইয়া রাজত্বকালে খলিফা মুয়াবিয়ার সময় কুফা ও বসরার মসজেদগুলো প্রাচীন

বাইজানটাইন রীতিতে সংস্কার হয়। আমর সর্বপ্রথম ফুসতাতের মসজেদে মিহ্‌রাব স্থাপন করেন। উত্তর আফ্রিকার উকবা বিন নাফি কায়রোয়ানে একটি মসজেদ নির্মাণ করেন। আব্দুল মালিকের জেরুজালেমের ডোম আজও পৃথিবী বিখ্যাত ইমারতের গৌরব লাভ করে আছে। তথাকার মসজেদুল আক্‌সার পুনর্নির্মাণও সেদিনের স্থাপত্য শিল্পের কম নিদর্শন বহন করে না। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় গভর্নর দ্বিতীয় ওমর মদীনার মসজেদে প্রথম মিহ্‌রাব স্থাপন করেন। খলিফা প্রথম ওয়ালিদকে উমাইয়া যুগের স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাতা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁকে মোঘল যুগের সম্রাট শাহ্‌জাহানের সাথে তুলনা করা যায়। খলিফা ওয়ালিদ কর্তৃক দামেস্কের জামে মসজেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য কীর্তি। স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে এই মসজেদটির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চল হতে সংগৃহীত শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের দ্বারা এটা নির্মিত হওয়ায় এই মসজেদটিতে মুসলিম স্থাপত্যের এক অপূর্ব ও অভাবনীয় সমন্বয় ঘটায় এটি যেন মুসলিম স্থাপত্য সৌন্দর্যের চির নিদর্শনের সম্মান লাভ করেছে। একটি জামে মসজেদের যাবতীয় শিল্পকলা এতে স্থান পেয়েছে যেমন—মিনার, মিহ্‌রাব, মিম্‌বর, সাহ্‌ন, মকসুরা, গম্বুজ ঘোড়ার নালের আকৃতি বিশিষ্ট খিলান প্রভৃতি সকল কিছু এক যোগে এটিকে এতই সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে যে, এটি পরবর্তীকালে সকল মসজেদ নির্মাণের আদর্শের স্থান লাভ করেছে।

ধর্মীয় ইমারতগুলো ছাড়াও উমাইয়া যুগে বহু মরুপ্রাসাদ, ও অনিন্দ্যসুন্দর বহু অট্টালিকা নির্মিত হয়, যেমন—সিরিয়ার মরু অঞ্চলে বহু প্রমোদ ভবন, তন্মধ্যে প্রথম ইয়াজীদের 'কুশাইর আক্‌রা' বা কায়সার আমরা প্রাসাদ কলা নৈপুণ্যের এক অপূর্ব পরিচায়ক। এই প্রাসাদের দেওয়াল চিত্র চির প্রশংসার দাবী রাখে, যার মধ্যে কোথাও প্রতীক চিত্র—বিজয়, কোথাও দর্শন, কোথাও ইতিহাস, কোথাও কবিতা, প্রভতি স্থানে লাভ করেছে। আবার কোন কোন চিত্রে নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকার নগ্ন মূর্তি ইত্যাদি সমগ্র উমাইয়া যুগের শিল্পকলারও চিত্র জগতের পূর্ণ মূর্তিকে যেন তুলে ধরেছে। খলিফা ওয়ালিদের পর হিশাম ও দ্বিতীয় ওয়ালিদেব সময়েও — খিরবত, মফজর, ও মাশাত্তা ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এককথায় সেদিনের মুসলিম স্থাপত্য-শিল্প নীরবে জন্ম দিয়েছিল এদিনের সপ্তমাশ্চর্য তাজমহল।

উমাইয়া বংশানুক্রমিক খলিফাগণ
(৬৬১—৭৫০ খ্রীঃ)

(১) প্রথম মুয়াবিয়া—(৬৬১-৮০)
(২) প্রথম ইয়াজীদ—(৬৮০-৮৩)
(৩) দ্বিতীয় মুয়াবিয়া—(৬৮৩)
(৪) প্রথম মারওয়ান—(৬৮৩-৮৫)

- মহম্মদ
  - (১৪) দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৪—৭৫০)
- (৫) আব্দুল মালিক (৬৮৫—৭০৫)
  - (৬) আল-ওয়ালিদ (৭০৫—৭১৫)
    - (১২) তৃতীয় ইয়াজীদ (৭৪৪)
    - (১৩) ইব্রাহীম (৭৪৪)
  - (৭) সুলাইমান (৭১৫—৭১৭)
  - (৯) দ্বিতীয় ইয়াজীদ (৭২০—৭২৪)
    - (১১) দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩—৭৪৪)
  - (১০) হিশাম (৭২৪—৭৪৩)
- আব্দুল আজীজ
  - (৮) দ্বিতীয় ওমর (৭১৭—৭২০)
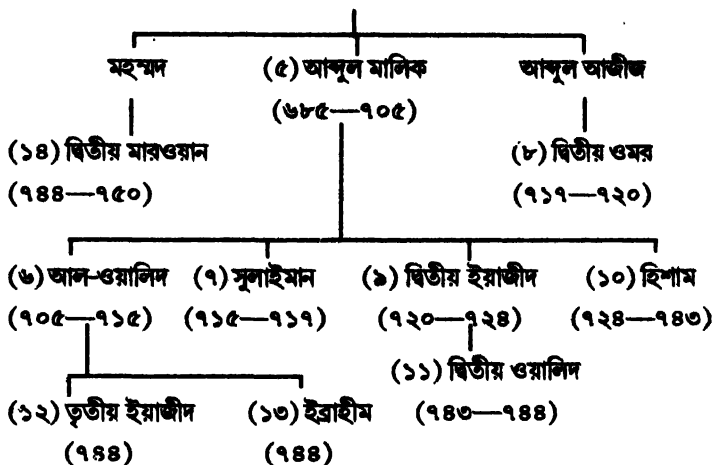
আব্বাসীয় প্রাথমিক বংশতালিকা (৭৫০—৭৭৫ খ্রীঃ)

পরিশিষ্ট—১
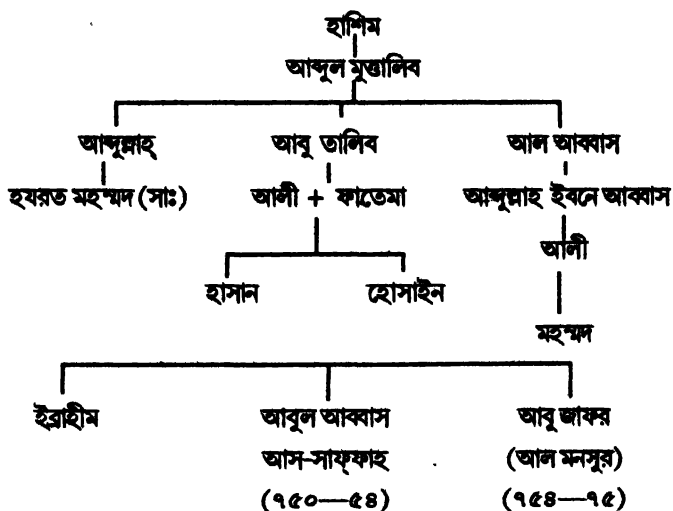
উমাইয়াদের সম্পর্কে মন্তব্য

মওলানা আবুল কালাম আজাদ : যে সত্যের মৃত্যু নাই

আমার বিশ্বাস কেয়ামতের (উত্থান) দিন যদি জালেমদের ফাছেক দল থেকে পৃথক করে দাঁড় করানো হয়, তাহলে তাঁদের পয়লা কাতারে বনু উমাইয়ারা থাকবে। সে জালেমরাই ইসলামের এই আজাদীর (গণতন্ত্রের) মন্ত্রটিকে জুলুমের শিকারে পরিণত করল। এরা ঠিকউত্থান ও প্রসারতা লাভের মুহূর্তেই গতিরোধ করে দাঁড়াল। ব্যক্তিগত স্বার্থে এ আদর্শটিকে তারা পদদলিত করল। তাই তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দিনটিই আমর বিল মা'রুফের (সৎকাজের জন্য আদেশ বা নির্দেশের) দ্বারা রুদ্ধ হবার পয়লা দিন হিসাবে গণ্য হবে।

তারা যে শুধু ইসলামের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করে ছেড়েছে তাই নয়, অবশ্য এটাও কোরআনের দৃষ্টিতে কুফরী বৈ নয়। কিন্তু সব চাইতে বড় জুলুম হল, তারা ইসলামের প্রাণশক্তি সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার নির্দেশটিকে তরবারির জোরে দাবিয়ে দিতে চাইল মুসলমানদের সত্য বলার স্বতঃফূর্ত প্রেরণাকে নষ্ট করে দিল।

যেহেতু নবী-যুগের কোরআনী শিক্ষা ও আত্মিক শক্তির প্রভাব তখনও তাজা ছিল, তাই যদিও নানা রূপ বেদাত ও পাপাচারে বাজার কিছুটা গরম ছিল, তথাপি সত্য প্রকাশের প্রচণ্ড ধ্বনি দামেস্ক ও কুফা প্রাসাদে কাঁপন জাগিয়েছিল। ষাট বছরের এক বুড়ীকে দরবারে ডাকা হল। সে মুয়াবিয়ার সামনে বিপুল উদ্দীপনার সাথে শুধু সেই সব চরণ আবৃত্তি করে চলল, যাতে শুধু নবী পরিবারের প্রশংসাই ছিল না, বরং বনু উমাইয়াদের কুৎসাও ছিল অনেক। আব্দুল মালিকের মত প্রভাবশালী ও অত্যাচারী বাদশাহ মদীনায় এলে, তখন তাঁর দরবারে কম্বলধারী ফকীররা এসে তাঁকে জালেম আখ্যা দিয়ে যেত। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই হাজ্জাজ খোলা তরবারি সামনে নিয়ে বসতেন। কিন্তু অনেক প্রাণোৎসর্গী মুমিনরা, যাঁরা তাঁর তরবারিকে উপেক্ষা করেই সত্য ভাষণে তাঁর অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিত। পৃঃ ৩৪৪-৪৫ [অনুবাদ-আখ্তার ফারুক।]

স্যার সৈয়দ আমীর আলী : দ্য স্পিরিট অব ইসলাম

আততায়ীর হস্তে এই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের (ইসলামের দ্বিতীয় সৎ খলিফা হযরত ওমর ফারুক) মৃত্যু নিঃসন্দেহে সরকারের বিরাট ক্ষতি। তাঁর কঠোর অথচ ন্যায়পরায়ণ চরিত্রশক্তি, তাঁর সাধারণ বুদ্ধি ও মনুষ্য স্বভাবের জ্ঞান উমাইয়া সন্তানদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা দমনে ও সংযত রাখতে তাঁকে উল্লেখযোগ্য ভাবে উপযোগী করেছিল। মৃত্যুশয্যায় ওমর ছয় জন নির্বাচকের উপর খেলাফতের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। আবু তালিবের পুত্রকে খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু উমাইয়াদের ষড়যন্ত্র এই প্রস্তাবের সঙ্গে এমন একটি শর্ত যোগ করেছিল, যা তারা জানত আলী সমর্থন করবেন না। তাঁকে শুধু হযরতের আইন ও নজির অনুসারে সরকার পরিচালনা করলে চলবে না, অধিকন্তু তাঁর পূর্ববর্তী দু'জন খলিফার প্রতিষ্ঠিত নজির অনুসারেও সরকার পরিচালনা করতে হবে। স্বাধীনচেতা আলী তাঁর বিচার বুদ্ধিকে কোনরূপে শৃঙ্খলিত করতে রাজী ছিলেন না। কাজে কাজেই উমাইয়াগণ যেভাবে প্রত্যাশা করেছিল তেমনি তাদের জ্ঞাতি ওসমানকেই খেলাফত প্রদান করা হল। হযরতের উত্তরাধিকারত্বে এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানের অভিষেক শেষ পর্যন্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে শর্তবিহীন অমঙ্গলের কারণ হয়েছিল। তিনি সেই বংশের সদস্য ছিলেন, যে বংশ সর্বদা হাশেমের বংশধরদের প্রতি বদ্ধমূল শত্রুতা পোষণ করত। তারা বিদ্বেষপূর্ণ শত্রুতার সঙ্গে হযরতের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল, এবং তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। তারা শৈশবেই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য জোর প্রয়াস চালিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।...উমাইয়াগণ বিদ্বেষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে তাদের পূর্ব শক্তি ও আভিজাত্য বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মক্কা বিজয়ের পর নির্বন্ধকে (ইসলামী বিধান) গ্রহণ করেছিল সত্য, কিন্তু আব্দুল্লাহর পুত্র (হযরত) তাদের যে বিপর্যয় এনেছিলেন, সেজন্য তারা হাশিম বংশকে বা ইসলামকে কখনো ক্ষমা করেনি। হযরত যতদিন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের সামনে এ সব বিশ্বাসঘাতকের দল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই স্বার্থের তাগিদে এবং মুসলমানদের পার্থিব বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে কল্যাণ বহন করে এনেছিল, তার আংশিক ভাগীদার হওয়ার লোভেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা কোন দিনই মুহম্মদ ঘোষিতগণতন্ত্রের প্রতি শত্রুতা থেকে বিরত হয় নি। লম্পট, অবিবেকী ও নির্মম এবং অন্তরে পৌত্তলিক, তারা সাম্যের ধর্মের প্রতি বিরক্তবোধ করত—যে ধর্ম নৈতিক কর্তব্য ও ব্যক্তিগত

শালীনতার পালন পুরোপুরি দাবী করত। যে সরকারের প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল, তাকে ধ্বংস করার জন্য এবং যে সব লোকের উপর প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। হযরতের প্রথম দুজন উত্তরাধিকারী তাদের উচ্চাশাকে সীমার মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা মূলক অভিপ্রায় দমন করতে পেরেছিলেন। ওসমানের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে শুকুনি যেমন শিকারের গন্ধপায় তেমনি তারা মদিনায় এসে জুটেছিল। তাঁর খেলাফত লাভ উমাইয়াদের সেই বিদ্বেষ প্রকাশের এবং সেই বদ্ধমূল লাম্পট্যের সংকেত ছিল, যা ইসলাম জাহানের অন্তঃস্থলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং তার মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনগুলি ধ্বংস করেছিল।

ওসমানের শাসনামলে তাঁর দুজন পূর্বসূরীর নীতি ও প্রশাসনের সম্পূর্ণ ওলট পালট হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত সমূহ অনুসরণের জন্য তিনি অঙ্গীকৃত ছিলেন।.:. এ সব বিদ্রোহে পর্যবসিত হয়েছিল, যার ফলে ওসমান প্রাণ হারান। ওসমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে জনগণ সর্বসম্মতিক্রমে আলীকে খলিফার শূন্য আসনে নির্বাচিত করল। যে বিদ্রোহ পরে দেখা দিয়েছিল তা ইতিহাসের বিষয়। ওল্‌সনার বলেন—"যদি আলীকে শান্তিতে শাসন পরিচালনা করতে দেওয়া হত তবে তাঁর গুণাবলী, তাঁর দৃঢ়তা এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতা পুরাতন প্রজাতন্ত্র ও তার সরল কার্যপদ্ধতিকে চিরস্থায়ী করতে পারত। অততায়ীর খঞ্জর ইসলামের আশা নির্মূল করে দিল। মেজর অসবর্ণ বলেন—"তাঁর নিধনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যদীপ্ত হৃদয় ও সর্বোত্তম মুসলমান, যাঁর বিবরণ ইসলামের ইতিহাসে শ্রদ্ধাভরে স্মরিত, বিশ্ব থেকে তিরোহিত হন।"...সত্যের জন্য আপোষহীন অনুরাগ, কোমল ও দয়ার্দ্রহৃদয় আলী উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাশক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রায় অনুপযোগী।...উমাইয়া শাসন আমলে সরকার ছিল নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্র। পৃঃ ৩৮১-৮৪

হিন্দার (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) পুত্রের ভাগ্য এখন ঊর্ধ্বগামী, আর আবু সুফিযানের মক্কার সুলতান হওয়ার উচ্চাশা মোয়াবিয়া দ্বারা ব্যাপকতর পরিধিতে পরিপূর্ণ হল। এরূপে হযরতের সর্বাপেক্ষা দুই ক্ষমাহীন শত্রুর (হিশাম ও আবু সুফিযান, হযরতের মহাশত্রু আবু সুফিযানের পুত্র মোয়াবিয়া) পুত্র ইতিহাসে লিপিবদ্ধ, নিয়তির সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর খেয়ালে খলিফার পদে উপবিষ্ট হল। পাছে মোয়াবিয়ার চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন পক্ষপাত-প্রসূত বলে বিবেচিত হয়, কাজেই আমরা একজন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দেব। যাকে কোনদিন পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। ওসবোর্ণ

বলেন—"বিচক্ষণ, বিবেকবর্জিত ও নির্মম উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা তার নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এমন অপরাধ নেই, যা করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণ করার জন্য হত্যাই ছিল তাঁর চিরাচরিত রীতি।...তাঁর পুত্র ইয়াযিদের উত্তরাধিকারত্ব নিরাপদ করার জন্য মোয়াবিয়া আলীর একমাত্র জীবিত পুত্র হুসাইনের সঙ্গে তার প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করতে দ্বিধা করেন নি। তথাপি এই ধীর মস্তিষ্ক, হিসেবী, নাস্তিক, ইসলামী এলাকার উপর রাজত্ব করেছিলেন। পৃ. ৪০১

(উমাইয়া) নৃপতিদের রাজনৈতিক আচরণ যাই হোক না কেন, সকল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মমতের নিরপেক্ষতা ও পরিপূর্ণ সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ তাদের চেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত কখনও দেখেনি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের চর্চা—একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার মহান নির্দেশক—মুসলমানদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় পেশায় পরিণত হয়েছিল। পৃ. ৫১২

[অনুবাদ ঃ ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স]

মওলানা মহম্মদ ইলিয়াস ঃ

জ্ঞানের আলোক বর্তিকা (পবিত্র কোরআন) হস্তে নিয়ে এ সংসারের কঠিন মাটিতে সত্য ও সুন্দরের পথে শান্তি, সাম্য এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্য আল্লাহর দূত মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) গণতান্ত্রিক ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার জন্য যে আপোষহীন আন্দোলন, যে আমরণ অভিযান শুরু করেছিলেন ; তাঁর তিরোধানের পর উমাইয়া জালেমরা (উমাইয়া খলিফাগণ দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত) যদি ইসলামের প্রাণশক্তি—সত্যের প্রকাশ ও সত্যাশ্রিত ঐ সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পথে ঐ আন্দোলনের গতিরোধ না করত, তাকে প্রতিহত না করত, দূতের প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান-দীপকে দানবের মত নির্মমভাবে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করত, তাহলে জগৎ-অন্ধকার দূরীভূত হয়ে মেকি সাম্যের নামে অসাম্যের, মেকি সভ্যতার নামে অসভ্যতার এবং বহু দুঃখ ও দারিদ্র্যের অবসান হত ; যার ফলে শুধু ইসলামের ইতিহাস নয় ; আজ সমগ্র মানব জাতির—সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সামাজিক ও অর্থনীতির বিবর্তনের বিশ্ব-ইতিহাসও অন্যভাবে লিখিত হত।

[—হামিদীয়া লাইব্রেরী—পাপুড়া—বারভূম।]

ইসলামী চিন্তা জগতের মহান চিন্তানায়ক ও প্রবক্তা এবং ইসলামের ইতিহাসের বিশ্ববিখ্যাত মিশরীয় ঐতিহাসিক সাইয়েদ কুতুব শহীদের চোখে উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আমির মুয়াবিয়া ঃ

ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার : সাইয়েদ কুতুব শহীদ

অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিজামী

এরপর (হযরত আলীর পর) আসলো বনি উমাইয়া যুগ। তারা ইসলামী খেলাফতকে তাদের নিজ বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে একটি স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এটা ইসলামী শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণার ফল ছিল না। বরং এটা ছিল এমন একটি জাহেলী প্রভাবের বাস্তব পরিণতির ফল বিশেষ, যা ইসলামের আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণরূপে কর্মহীন ও অচল করে দিয়েছিল। এখানে ইয়াজীদ বিন মুয়াবিয়াকে খলিফা নির্বাচনের বায়ত সমস্যা নিয়ে যে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে, তা উল্লেখ করলেই মূল ব্যাপারটা অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে যে, কি অবস্থায় তার বায়ত হয়েছিল।

আমির মুয়াবিয়া সিরিয়ার জনসাধারণের থেকে ইয়াজীদের জন্য বায়ত নেওয়ার পরে হিজাজবাসীদের থেকে যে কোন প্রকারে ইয়াজীদের খেলাফতের জন্য সায়াদ-বিন-আবু-আক্কাস-এর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বহুবিধ চেষ্টা তদবির চালাবার পর একাজে সফলতা লাভ করতে পারল না। অতঃপর মুয়াবিয়া নিজে বহু ধন-সম্পদ ও লোক লস্কর নিয়ে মক্কায় গিয়ে সেখানকার নেতৃবৃন্দকে ডেকে এনে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন—

"আমি তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করে থাকি এবং যেরূপ আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখে থাকি, সে বিষয়ে তোমরা অবশ্যই অবগত আছ। ইয়াজীদ হচ্ছে তোমাদের ভাই, এবং তোমাদের চাচার ছেলে। আমার ইচ্ছা যে, খলিফার আসনে তাকে নাম-মাত্র বসিয়ে দাও। বাস্তবক্ষেত্রে খেলাফতের সমুদয় কাজ, যথা কাহাকেও কোন পদে বসিয়ে দেওয়া বা পদচ্যুত করা, ট্যাক্স ও খাজনা উসুল করা, আর ধন-সম্পদ বণ্টন করার সমুদয় কাজ তোমাদের হাতে থাকবে।"

মুয়াবিয়ার এ কথার জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর বললেন—"আপনার জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) খেলাফতের ব্যাপারে যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, সেই পথ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ তিনি এমন লোকের (ওমর) জন্য অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর খান্দানের লোক নয়, অথবা হযরত ওমরের ন্যায় খেলাফতের জন্য এমন ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে একটি পরামর্শ বোর্ড করে দেওয়া, যার ভিতর আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন থাকবে না।"

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইয়ের ভাষণ শুনে মুয়াবিয়া ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এবং বললেন— "তোমাদের সামনে আর কোন পথ আছে কি?" ইবনে যুবাইর উত্তর করলেন — না, দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই।" মুয়াবিয়া অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন—"এ ব্যাপারে তোমরা কি বল?" তার উত্তর করলো — "আমরা সকলেই ইবনে যুবাইয়ের কথার সাথে এক মত।"

অতঃপর মুয়াবিয়া তাদের ধমক দিয়ে বললেন—"যে ব্যক্তি তোমাদেরকে এ কথা জানিয়েছে, সে নিজের জন্য পথ খুঁজে নিয়েছে। আমি তোমাদের নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপন করলাম, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সকলের সামনে তা প্রত্যাখান করল। সুতরাং এখন আমি তোমাদের সামনে এমন একটি কথা বলার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সে কথার জবাবে একটি বাক্যও ব্যবহার করে, তবে দ্বিতীয়বার তার কোন কথা শোনার পূর্বেই আমি তার দেহ থেকে মস্তক পৃথক করে ফেলব। এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাবার চিন্তা করুক।"

এরপর যা কিছু হয়েছিল, তা হচ্ছে এই যে, মুয়াবিয়ার দেহরক্ষা বাহিনীর কমাণ্ডার হিজাজের সেই সকল নেতৃবৃন্দের জন্য দু-দুজন করে ফৌজ মোতায়েন করেছিল, যাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। এদিকে মুয়াবিয়া তার কমাণ্ডারকে নির্দেশ দিলেন—"এদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি আমার সততা কিংবা মিথ্যার ব্যাপারে মুখ থেকে একটি বাক্যও বের করে, তবে এ দু'জনে (ফৌজে) যেন তলওয়ারের মুখে তাকে উড়িয়ে দেয়।"

(অতঃপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভাকক্ষ একেবারেই নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মুয়াবিয়া মনের সুখে উঠে পড়লেন, কেননা নীরবতা সম্প্রীতির লক্ষণ। বয়াত গ্রহণের কি নির্লজ্জ প্রহসন।)

অতঃপর মুয়াবিয়া মসজেদে (আমজনতার নিকট) এসে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে সাধারণের মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন ঃ—

"ঐ সকল লোক হচ্ছে মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় লোক, এবং তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম ব্যক্তি। তাদের মতামত ব্যতীত যেমন কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, তেমনি হয় না তাদের পরামর্শের পরিপন্থী কোন ফায়সালা। ওরা ইয়াজীদকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করার ব্যাপারে সম্মত হয়ে বায়ত করে নিয়েছে। তোমরাও খোদার নাম নিয়ে বায়ত করে নাও। তখন সাধারণ মানুষ এই কথা শুনে তখনই বায়ত করে নিল।" পৃঃ ৩২৮—৩৩০।

মুয়াবিয়ার এই ধোকাবাজী ও প্রতারণা সম্পর্কে একদিন খেদভরে শেরে খোদা হযরত আলী বলেছিলেন ঃ "খোদার নামে শপথ নিয়ে বলছি, মুয়াবিয়া আমার চেয়ে বেশি চালাক চতুর কখনই নয়। কিন্তু ধোকাবাজী ও প্রতারণা ছিল তার অভ্যাসগত ব্যাপার। সে প্রকাশ্যে খোদার নাফরমানী কাজ করত। যদি ধোকাবাজী আর প্রতারণা মানব সমাজে একটি নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ না হত, তবে আমিই সবচেয়ে বড় চালাক চতুর হতাম। পৃঃ ৩৫৩।

ইয়াজীদের হুকুমত এমনি একটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। আর ইয়াজীদ লোকটি কে (বা কেমন) ছিলেন? এ লোকটি এমন একটি অবাঞ্ছিত লোক ছিল, যার সম্পর্কে হযবত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা বলেন—"খোদার নামে শপথ করে বলছি যে, আমরা ইয়াজীদের বিরুদ্ধে তখনই দণ্ডায়মান হয়েছি, যখন আমাদের মনে এই ভয়ের উদ্রেক হয়েছে যে, না জানি আসমান থেকে আমাদের উপর পাথরের বর্ষণ হয় নাকি? এ লোকটি মা, বোন ও মেয়েদেরকে এক সাথে বিবাহ করত। মদ্যপান করত, আর নামায ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দিত। খোদার কসম যদি আমার সাথে অন্য লোক নাও হত, তবুও আমি একাই খোদার পথে অবশ্যই কোরবান হয়ে যেতাম।"
পৃঃ ৩৩০—৩৩১।

মুয়াবিয়া কুফায় বসে জনসাধারণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"হে কুফাবাসী, তোমরা কি মনে করছ যে, আমি নামায, রোজা, যাকাত ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নিমিত্ত তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি? অথচ আমি ভালভাবেই অবগত আছি যে, তোমরা নিয়মিত নামায রোজা আদায় কর, আর যাকাত এবং হজ্জব্রত পালন করে থাক। জেনে রেখো, কখনও আমি এজন্য যুদ্ধ করিনি। বরং আমি তোমাদের উপর আমার শাসন ক্ষমতার প্রভুত্ব পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি। মনে রাখবে, এই যুদ্ধে জান, মাল, সহায়-সম্পত্তি ইত্যাদি যা কিছু ক্ষতি সাধন হয়েছে, তার কোন ক্ষতিপূরণ বা প্রতিদান কিছুই দেওয়া হবে না। আর আমি তোমাদের সাথে যতটি শর্তের উপর সন্ধিবদ্ধ ছিলাম, তা আজ আমি আমার পদতলে দাফন করে দিলাম।"

এমনিরূপে তিনি মদীনাবাসীদেরও সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ—"খোদার নামে শপথ করে বলছি, আমার জ্ঞাতসারে তোমাদের ভালবাসার প্রতিদান হিসাবে আমি নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব লাভ করিনি। আর আমার ক্ষমতালাভেও

তোমরা সন্তুষ্ট ছিলে না। বরং তোমাদের থেকে আমি তলোয়ার বলেই তা লাভ করেছি। তোমাদের জন্য আমার স্বভাবকে আমি ইবনে কাহাফার (হযরত আবুবকর) মত্ ও পথের দিকে চলার জন্য উৎসাহিত করেছি। করেছি ওমরের কর্মনীতি অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু সে (আমার স্বভাব) তা কঠোরভাবে অস্বীকার করেছে।" পৃঃ ৩৬২।

এরপর থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও কর্মসূচী ইসলাম এবং তার শিক্ষার গণ্ডীর সীমা রেখা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাহির হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান আরো বিকৃত রূপ নিয়ে বিরাজ করছে। পৃঃ ৩৬৩।

(তখনকার দিনে খলিফা আবুবকর ও ওমর তাঁদের গর্ভনরদের হাতে পাঁচটি দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন — ১. প্রশাসন, ২. সেনাবাহিনী পরিচালন, ৩. বিচার বিভাগ, ৪. অর্থ বা রাজস্ব বিভাগ এবং ৫. ধর্মীয় বিভাগ। হযরত ওমর, আমির মুয়াবিয়ার চরিত্র সম্যকরূপেই জানতেন, তাই তাঁকে গভর্নর করেছিলেন, কিন্তু প্রথম দুটো দায়িত্ব ব্যতীত আর কোনটিই দেন নি। কেননা শেষের তিনটিতে চরিত্রবান মানুষের প্রয়োজন ছিল। খলিফা ওসমানের আমলে এর ঠিক বিপরীত ছবিটিই পাওয়া যায়। এখানেই ইসলাম খেলাফতের মৃত্যু-পরোয়ানা এসে গিয়েছিল।)

সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, (আমির মুয়াবিয়ার) প্রচুর ধন-সম্পদ আর সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করার পর হযরত আলীর খেলাফতকালে যাতে সে (মুয়াবিয়া) খেলাফতের দাবীদার হয়ে দণ্ডায়মান হতে পারে, তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করার পূর্ণ সুযোগ তিনি (খলিফা ওসমান) দিয়েছিলেন। হযরত ওসমান সিরিয়া ছাড়াও ফিলিস্তিন ও হামস্ প্রদেশকেও তার আয়ত্তাধীন করে দিয়েছিলেন। তাকে মূল সেনাবাহিনীর কমান্ডারের পদও দান করেছিলেন। পৃঃ ৩৪১।

মহানবীর যুগের মানুষ হলেই যে সে ফেরেস্তা হবে, এমন কোন কথা নাই। এ সম্পর্কে শেরে খোদা হযরত আলী বলেন— "মনে রেখ, নবী করীম (দঃ)-এর সাহাবী, মুহাজীর, এবং আনসারদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, নবী করীম (দঃ)-এর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হওয়ায় অন্যান্যদের উপর তাদের সম্মান ও মর্যাদা অধিক, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই মান-সম্মান, মহত্ব ও গৌরবকাল খোদার দরবারে কাজে আসবে, তিনি তাদের সওয়াব দান করবেন, কিন্তু আমার নিকট তার (যুগের) কোনই মূল্য নাই। আমার কাছে (কাজের দ্বারা) সকলেই সমান।" পৃঃ ৩৫১।

(কতকগুলো ধর্মান্ধ পণ্ডিতের আচরণে বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক নিম্নরূপ মন্তব্য করেন)।

এ মায়া মরীচিকার ভিতর দূর থেকে এমন কতক পাগড়ীধারী লোক দেখা যাবে, যারা কথাকে মূল উদ্দেশ্যের অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে খুব অল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে থাকে। পৃঃ ৪৫৮।

আল্লাহর নিকট আশা এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে, তিনি আমাদের মানস চক্ষুকে মূল বিষয় অবলোকন করার জন্য এবং অন্তরকে হক্ক কথা অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন। পৃঃ ৪৫৯।

A renowned scholar and historian of Islam :

S. Khuda Buksh : Islamic Civilization : Vol. I., ED. III . Regarding Muawiyah :

1. Suffice it to say that he (Hazrat Ali) was ensnared by the treachery of Muawiyah....... The murder of Ali (660), indeed, greatly helped Muawiyah in consolidating the Power he had so fondly coveted but so dishonourably won..... It has too often been asserted that, with the rise of Muawiyah, the democratic principles of Islam vanished.
Page : 233.

2. A strong personality like Muawiyah was necessary and doubly necessary, to pacify the commotion of the time. Page : 235.

3. He, like Muawiyah, adorned his profligate son with the purple, despite the fact that he trampled upon the virtues of manhood, and shed a lurid light–on the purity of his father. Page : 236-237.

4. Omar's insight into human character was profound. He always called Muawiyah, the Caesar of the Arabs, because he knew perfectly well that he was a man of great ambition and little principle.
Page : 274.

5. Under Omar, Muawiyah was sent as governor to Damascus, he was invested with very little Powers, it consisted in the governor during command over the troops and carrying on the administrative work, but neither exercising judical functions nor presiding over the financial department, nor representing the Caliph in religious matters. Page : 276-277.
6. With the rise of Muawiyah the strong religious colour which was conspicuous in the four Caliphs almost entirely passed away and a purely temporal policy was adopted. Page : 284-285.
7. The Umayyad government, from its very outset alienated the sympathy of the more religious sections of the Mohammedans. We are indebted to ilm Qutaibah for transmitting to us a letter which Husain, the grandson of the Prophet, is alleged to have addressed to Muawiyah, the founder of the Umayyad dynasty. Whether genuine or apoeryphal for that is beside the mark here – this letter expresses centiments which, without a doubt, were very largely shared by the generality of the Muslims of that age. It runs thus :

"Your letter has reached me in which you speak of evil reports about me that have come to your knowledge and which, you say, you would never have expected of me as being beneath my dignity. .... Are you not the murderer of Huji(Hazrat Ali), the devotee and the companions of Huji, the pious and God-fearing who were averse to heresies and who exhorted people to do good and forbade them from evil ? Yet you killed them wrongly and unjustly after giving them faithful and inviolate promises of immunity and safety. In this act you defied God and thought lightly of His name. Are you not also the murderer of Amar Ibnul-Hamiq whose face was worn out by long devotion? You killed him after holding out promises to him, which would have brought down even the mountain goats from their

lairs. And are you not the man who adopted Ziyod as your brother, during the time of Islam and alleged that he was the son of Abu Sufyan, whereas the prophet of God had laid it down that AL-Walad li-l-firash wae si-l-ahiri-l-hajar (See Goldziher, Vol. 1, P. 188, Note 2, Fakhri, P. 135; Iban Khallikan, vol. IV, P, 247). Then you invested him with power to kill Muslims and cut off their hands and feet and crucify them on the trunks of palm trees. By God! Muwiyah, you behave in a manner that would lead the people to think that you are not one of the Muslims and they have no part or lot in you. Are you not again the murderer of Al Hadhrami, concerning whom Ziyod wrote to you that he was one of the same religion as Ali Ibn Ali Talib? Well then, the religion of Ali is no other than the religion of his cousin the Prophet through whose instrumentality you are occupying the position you now hold ..... Fear God, O Muawiyah, and know that God has a book which fails not to record the largest and smallest sin, and know also that God will never forgive your killing men on mere suspicion and punishing them upon false charges and your appointing as your successor a youth who drinks wine and hunts with dogs." Page : 20-23.

পরিশিষ্ট—২

ইসলামের খেলাফতের পটপরিবর্তনে ইতিহাসের উত্তর

(Changs in the Chelephat and Historical Repercussions)

সময়ের বিভিন্ন ক্ষণে মহানবী (দঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের খেলাফতের পট পরিবর্তনে দূর পরিণতিতে, কখন সুদূর কালের গর্ভে আল্লাহর বা ইতিহাসের উত্তর কি ছিল, সেই নির্ভুল-সেই নীরব, সেই মহা উত্তরকে কেউ কি অগ্রাহ্য বা অতিক্রম করতে পেরেছেন। আজ পর্যন্ত জগতে এমন কোন বাদশাহ, শাহানশাহ, সম্রাট, রাজাধিরাজ জন্মান নি, যিনি যথাসময়ে তার কাজের সঠিক উত্তর পান নি। ঐ উত্তরটি আমরা একবার লক্ষ্য করবো।

ইসলামের ইতিহাসের বহুস্থান সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্য দুর্বোধ্যতা হেতু দুরধিগম্য।নানা উত্থান-পতনের ইতিহাসে তাঁরা কখন নির্বাক হোন, কখন বা চঞ্চল হোন। কেনই বা এত উত্থান, কেনই বা পতন এত গভীর। এর মূলে কারণ লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক ঐতিহাসিক জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের অন্তরালের দৃশ্যটিকে অকপটে জাতির চোখের সামনে তুলে ধরতে অনেক সময় নানা কারণে সঙ্কুচিত হয়েছেন, দ্বিধা করেছেন, নানা দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান হয়েছেন। কেউ বা কিছু কিছু ইঙ্গিতে-আকারে প্রকাশ করেছেন। মানুষের ধর্ম যেমন মনুষ্যত্বের প্রকাশ ও বিবেকের প্রয়োগ, আল্লাহর ধর্ম তেমনি সত্যের প্রকাশ ও ন্যায় বিচার। এই ন্যায় বিচারেই খেলাফতের পটপরিবর্তনে আল্লাহর বা ইতিহাসে উত্তর পাওয়া গেল।

থাকিলে পাপের কণা কিঞ্চিত জমা
তোমার বিচারাগারে নাহি আছে ক্ষমা।
বিরাট বাহিনী যোগে বিপুল বিজয়
বলি হে বিধাতা কোর্টে পাপে নাই জয়। ৯৯ : ৭-৮

পবিত্র খেলাফতের পতন হতে আব্দুল মালিক তথা দ্বিতীয় মারওয়ান পর্যন্ত আমরা কি দেখলাম। কোন্ কোন্ লোমহর্ষক ছবি আমাদের চোখে পড়ল, অমাদের অন্তর-আত্মাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করলো। বিবেকের অপপ্রয়োগে বিবেককে

আঘাত দিল, কোঁড়া ও কষাঘাত মারল কোন্ অজানা হাত। মহানবীর জীবনব্যাপী ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফল ইসলামের পবিত্র খেলাফতের পতন কেন হলো, কোন্ নোংরা হাত এই নিখিল সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন করলো, কেন ভাস্য মেঘের জালে সত্য-সূর্য ঢাকা পড়লো। কার অভিশাপে বিশ্ব-করুণা মহানবীর উপর বর্ষিত আশীর্বাদ অভিশাপ না হলেও আবার বন্ধ হলো।

হযরত আবুবকর হতে হযরত ওমর পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কোথাও ছন্দ-পতন ঘটেনি। প্রশাসনের নদীধারা তার সাবলীল স্বচ্ছ গতি হারায় নি। সমাজের বিশুদ্ধ নদী তরঙ্গ সদাই ছিল তরঙ্গায়িত। বাঘ ও বক্‌রি এক ঘাটে এক সাথে জল খেয়েছে, শৃগাল ও সিংহ এক সাথে সহ-অবস্থান করেছে। সুবিশাল সাম্রাজ্যকে সুশাসনে রাখতে হযরত ওমর ফারুকের একটিমাত্র অঙ্গুলিই যেন যথেষ্ট ছিল।

হযরত ওসমানের খেলাফতের প্রথম দু'বছর ছিল খুবই সাবলীল। পরবর্তী দু'বছর খলিফা ওসমান যেন অতি বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেন। এই সময়ে তাঁর প্রধানমন্ত্রী থাকলেন তারই চাচাত ভাই আবার জামাতা মারওয়ান। প্রথম দিকে প্রশাসনে খলিফার পদক্ষেপ ছিল খুবই শক্ত এবং খলিফা ওমরের প্রকৃত অনুসরণ। তাই তখন বা ঐ সময়কালে খেলাফতে কোন গোলযোগের বা দুরারোগের কোন লক্ষণ ফুটে উঠেনি। পরবর্তীকালে জামাতা মারওয়ানের পরামর্শে ওমর-নীতির আমূল পরিবর্তন হওয়ায় পরিণতিতে দেশ জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। গজিয়ে উঠলো আরবভূমিতে আবার অত্রিব ধনীশ্রেণী, ও তার পাশাপাশি দরিদ্রতম মানুষ। যে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা দূর করার নিমিত্ত স্বয়ং মহানবী সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। আবার দলে দলে দাস-প্রথার অভ্যুদয় হলো। যে দাস-প্রথার উচ্ছেদ-কল্পে মহানবী সারা জীবনই ঘোষণা করেছিলেন ঃ —

যে-কাজ আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়তর
তোমরা সকলে আজ দাস মুক্ত কর।

এই একটি কথাতেই মহানবী বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিখিল বিশ্বের নির্যাতীত মানুষের পক্ষে এ হেন অদ্বিতীয় অস্ত্র আজিও কি কেহ আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সেই মহান অস্ত্র প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে খলিফার অস্ত্রাগারে বন্দী হলো।

এই সময় বহুজন, বিশেষ করে শেরে খোদা হযরত আলী খলিফা-দরবারে ওসমান সমীপে বারবার বহু সাবধান ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বার

বার তিনি বিরাগভাজনই হয়েছিলেন। এমন কি অনেক সময় তর্ক-বিতর্কও আরম্ভ হতো, তবুও ইসলামের বীরসেনা শেরে খোদা কোন দিনই সত্য বলতে দ্বিধা বোধ করতেন না, অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদ করাটা ছিল তাঁর চির স্বভাবজাত ধর্ম। মহানবীর একান্ত প্রিয় প্রহরী কোথাও কোন দিন নীরব ও নিরস্ত হন নি। শেষাবধি অবস্থা বৃদ্ধ খলিফার একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। এইভাবে ইসলামের পবিত্র খেলাফত্রে প্রথম পটপরিবর্তনের অতি মর্মান্তিক প্রথম ধাপটি হযরত ওসমানের খেলাফতেই সূচিত হলো। দেশের সর্বত্র যেন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো, দাবানল ভীষণাকারে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকলো। যে অপ্রত্যাশিত আগুনে স্বয়ং খলিফা প্রথম দগ্ধ হলেন, এবং চিরদিনের জন্য দগ্ধীভূত হলো ইসলামের পবিত্র খেলাফতও। হযরত ওসমান জীবনের চরম ব্যর্থতা আপন জীবন রক্ষার্থে যতখানি, তা অপেক্ষাও সমধিক ব্যর্থতা বিধৃত মহানবীর প্রবর্তিত ওমরের সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি খেলাফত রক্ষার্থে। তিনি যেন নিয়তি বা প্রকৃতির উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপন প্রাণ ও খেলাফতকে সংহারে পরোক্ষে সমর্থন জানালেন। এটা তো ইসলামি কানুন নয়, এটা তো মহানবীর পদাঙ্ক অনুসরণও. হলো না। মহানবী বলেন—চেষ্টা আমার নিকট হতে, ফল আল্লাহর হাতে, বা আল্লাহর নিকট হতে।

জীবন উদ্যানে আমি জল দিয়ে যাই
কভু না চেষ্টায় রই কুসুম ফুটাই।

হযরত ওসমান চলে গেলেন, পড়ে থাকলো খলিফার মরদেহ ও তাঁর মৃত খেলাফত। আরম্ভ হলো হযরত আলীর দগ্ধীভূত খেলাফতকাল। হযরত ওসমান পরিত্যক্ত মৃত খেলাফতের ঘোর দুর্দিনে যদি তিনটি মানুষ সব ভুলে হযরত আলীকে একবার মনেপ্রাণে সমর্থন জানাতে পারতেন, তাহলে ইসলামের পবিত্র খেলাফত্রে লোমহর্ষক ইতিহাস সেদিন ও এদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে অন্যভাবে লিখিত হতো। হযরত যুবাইর ও হযরত তালহা মুখে যাই বলুন, যখন হযরত আলী তাঁদের প্রত্যেককে খলিফার পদ অলংকৃত করার জন্য অনুরোধ জানালেন, তখন তাঁরা ঘন ঘোর অন্ধকারের মহাদুর্যোগে কাপুরুষোচিত ভীরুতার জন্য ঘনীভূত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দেশের কাণ্ডারীরূপে তরীর হাল ধরতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই জল একটু স্থিতলেই, একটু শীতল হলেই, (খলিফা হওয়ার জন্য) বুকের সুপ্ত বাসনার তরীটিকে বর্ষার মহাপ্লাবন কাটিয়ে বসন্তের নদীতে তরীটিকে ভাসাতে বড়ই আগ্রহী ছিলেন। (এ কথার নিখুঁত সত্যতা প্রতীয়মান হয়—যখন তাঁরা

বিবি আয়েশা সহ মারওযানের নেতৃত্বে মক্কা হতে বসরার মুখে ধাবমান) যার জন্য উভয়েই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' কৌশলের যথাযথ প্রয়োগ করলেন। দেশের চরম সংকটকালে এটা কি কোন বীরের ধর্ম ; এটা কি কোন প্রবীণ সাহাবীর স্বতোৎসারিত প্রাণের স্পন্দনময় সাড়া, আজ ঈমানের পরীক্ষা ও প্রত্যয় কোথায় গেল। তাঁরা উভয়েই এই চরম বিশৃঙ্খলাময় সময়ে হযরত আলীর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'উমরাহ' করার নামে মক্কাতে কেটে পড়লেন। তথায় তাঁরা কি উমরাহ পালন করলেন,—বিবি আয়েশা ও মারওয়ানের সাথে ; সে কথা তো ইসলামের ইতিহাসের শিশুরাও জানে। তাঁরাই আলীকে খলিফা করলেন, আবার তাঁরাই তাঁকে দুর্বার দাবানলের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সম্মুখে একাকী রেখে 'ধর্ম' পালন করতে সরে পড়লেন। এটা কতখানি মানবিক ছিল, তা চিরদিনই প্রশ্নের উদ্রেক করবে।

ঈমান ইনসাফ্ সহ তোমার আমান
তোমাকে করিবে দান জগৎ সম্মান। —হাদিস

এবার বিবি আয়েশা মক্কার বুকে বসেই মদীনার মর্মান্তিক ঘটনার আদি-অন্ত না জেনেই, বিন্দু-বিসর্গ না বুঝেই কয়েক জনের মুখে ঝাল খেয়েই তদানীন্তন বিপদগ্রস্ত, বিব্রত, খলিফা আলীর সাথে কোনরূপ যোগাযোগ বা পরামর্শ, এমনকি লোক মারফত সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ টুকুও না করেই মারওয়ান তালহা ও জুবাইরের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে, এককথায় মারওয়ান কল্পিত তালে তাল দিয়ে যতখানি হযরত আলীর ক্ষতি করলেন, তা অপেক্ষা শতাধিক সর্বনাশ করলেন মহানবী প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পবিত্র খেলাফতের। বিবি আয়েশার খলিফা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না ; তবে তাঁর সাথে বিবি ফাতেমা ও হযরত আলীর সম্পর্কটাও খুব একটা মসৃণও ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক যেন জাতীয় জীবনের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলো। যেটা জাতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে হওয়াটা সমীচীনও ছিল না। এই তিন জনের প্রথম দিকের অভাবেই হযরত ওসমানের খেলাফতের দুর্যোগ হযরত আলীর কালে মহাবিভীষিকাময় ভীষণ দুর্যোগে পরিণত হলো। একথা সজোরে, অতীব নিশ্চিতভাবে, নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, প্রথমেই এই তিন জন হযরত আলীর সাথে হাতে হাত মিলালে বা পাশে দাঁড়িয়ে দুঃসময়ে পরামর্শ ও সাহায্য করলে দুর অতীতের দুই ধান্দাবাজ মারওয়ান ও মোয়াবিয়ার কিছুই করার ছিল না, বা থাকত না। কিন্তু তা হলো না, ফলে সব কিছু যেন উলটিয়ে গেল। পবিত্র খেলাফতের পটপরিবর্তন হলো। গণতন্ত্র বা আল্লাহতন্ত্র খতম হলো। রাজতন্ত্র বা মোয়াবিয়া

তন্ত্র বহাল হলো। তবে সকরুণ হয়েছিলেন এই তিন জনেরই পরবর্তী অনুভূতি এবং পরিণতি। হযরত তালহা ও যুবাইর যখন আপন আপন ভুল বুঝতে পারলেন, তখন পরীক্ষার হলের বা জীবনের শেষ ঘন্টা বেজে গেছে। তাই আর শোধরাবার সময় পেলেন না, বড়ই করুণ—দুজনেই কুচক্রীদের হাতে শহীদ হলেন। বিবি আয়েশা জামালের যুদ্ধে খুবই অপদস্থ হয়ে বসে গেলেন। দেশের নিকট এই তিনজনের এক দাবী ও আস্থা ছিল, তা আর আলীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োগ করতে পারলেন না। নিজেরাও খতম হলেন। আলীও খতম হলেন, খেলাফতও খতম হলো।

পরবর্তী অধ্যায়ে মোয়াবিয়া দেশের কর্ণধার হলেন। খলিফা আলীর শাহাদত বরণের পর তিনি হযরত হাসানকে অনেক ভাল ভাল কথা ও হোসেনকে খলিফা করার জন্য শপথ বাক্য জানিয়ে পরে গভীর ষড়যন্ত্রে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। এবং মরণকালেও তাঁর কুচক্র ও কুচিন্তা এতটুকুও মলিন হয়নি। তাই হাসানকে দেওয়া সকল কথা ও প্রতিজ্ঞাকে চুথা কাগজে পরিণত করে পুত্র ইয়াজীদকে সিংহাসনে মনোনীত করলেন।

ইয়াজীদ সিংহাসনে বসলেন, যখন হোসেন মদীনাতে। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হেজাজের শাসনকর্তা রূপে মক্কাতে অবস্থান করছেন। ইমাম হোসেন মোয়াবিয়ার কথা ভঙ্গের জন্য রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ইয়াজীদকে খলিফা না মেনে কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে কুফা যাত্রা করলেন। ছোট বড় সকলেই বিপদের আশঙ্কা করে কুফা যাত্রাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলো। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর 'যাকশত্রু পরে পরে' ভেবে তাঁকে যেতে উৎসাহ দান করলেন। হোসেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বা পথের কাঁটা ছিলেন। তাঁর বাসনা পূর্ণ হলো। প্রতিদ্বন্দ্বী হোসেন অকালে পথেই প্রাণ হারালেন।

অতঃপর ঘনিয়ে এলো নাটকের পরবর্তী দৃশ্য। এই দৃশ্যে দেখতে পেলাম দুরাচার ইয়াজীদের মৃত্যু পরোয়ানা। সঙ্গে সঙ্গে পটপরিবর্তন। এবার প্রথম বৃদ্ধ মারওয়ান বিগত মোয়াবিয়ার মত ইয়াজীদের বিধবা পত্নীকে বহু ভাল ভাল কথা ও সুন্দর সুন্দর প্রতিজ্ঞা শোনালেন যে, তাঁকে খলিফা করা হোক, তিনি তাঁর মরণকালে ইয়াজীদের পুত্রকেই খলিফা মনোনীত করে যাবেন। এমন কি আস্থা অর্জনের জন্য বুড়ো তরুণী বিধবাকে প্রিয়তমা পত্নীতেও বরণ করলেন। তাঁর মহামরণ এগিয়ে এলো। তিনি অবিকল গুরু মোয়াবিয়ার পথ অনুসরণ করেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সব কথা, সব প্রতিজ্ঞা এক পলকে বেমালুম ভুলে গিয়ে আপন পুত্র আব্দুল মালিককে খলিফা মনোনীত করে ওপারে গিয়ে গুরু

মোয়াবিয়াকে বললেন,—গুরু! অমি তোমারই পথ অনুসরণ করে তোমার নাতিকে পথে বসিয়ে আমি আমার আপন পুত্রকে খলিফা করে এসেছি। একদিন মোয়াবিয়া কথা ভঙ্গ করে হোসেনকে পথে বসিয়েছিলেন, আজ তাঁরই শিষ্য তাঁরই বংশধরকে তাই করলো। এটা কি ইতিহাসের সমীচীন উত্তর হলো না। মোয়াবিয়ার বংশধর আর কোনদিনই খেলাফতে আসতে পারেনি। মোয়াবিয়া গুপ্ত ষড়যন্ত্রে হাসানকে বধ করেছিলেন, এবং তাঁর পুত্র ইয়াজীদ হোসেনকে সারা বিশ্বের এক চিরন্তন বেদনাদায়ক পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে সংহার করলেন সিংহাসনের লোভে। ইতিহাস উত্তর দিল, নিয়তি সব কেড়ে নিল।

অতঃপর আরম্ভ হলো আব্দুল মালিকের যুগ। আব্দুল মালিক আপন জ্ঞাতিগণের সাথে পরপর পাঁচ রাউন্ড যুদ্ধ করলেন,—প্রথম রাউন্ড ইরাকের সাথে। তখন ইরাকে সমাসীন মোখ্‌তার ও আসতার। আব্দুল মালিক কারবালার কসাই উবাইদুল্লাহকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন। আসতার ও উবাইদুল্লাহর মধ্যে কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধ বাঁধল। যুদ্ধে উবাইদুল্লাহ পরাজিত ও নিহত হলেন। তখন আসতার উবাইদুল্লাহর বিদেহী মস্তকটিকে ইরাকে পাঠালেন। ইতিহাস সঠিক উত্তর দিল। উবাইদুল্লাহর বিদেহী মাথা ওপারে গিয়ে হযরত হোসেনের বিদেহী মস্তকে দেখা করে বলল—ভাই, রাগ করো না, আমি তোমারই পথে এপারে এসেছি। তবে তোমার জন্য আজিও এ তামাম দুনিয়া কাঁদে, এবং আমার জন্য আজিও শয়তান হাসে। ইতিহাস ক্ষমা করলো না।

আব্দুল মালিক তাঁর যুদ্ধের পঞ্চম রাউন্ডে নিষ্ঠুরের দেবতা হাজ্জাজকে পাঠালেন হেজাজের শাসনকর্তা ভাবী খেলাফতের দাবীদার আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের বিরুদ্ধে পাঞ্জা কষতে। অতি উচ্চাভিলাষী এই আব্দুল্লাহ একদিন সিফফিনের যুদ্ধে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেই হযরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। অন্তিমকালে একটি হাদিস হঠাৎ স্মরণে আসায় যুবাইর সম্বিত ফিরে পান ও আলীর পক্ষে যোগদান করেন, এতে এই পুত্র তাঁকে ভর্ৎসনাই করেছিলেন।

যথাসময়ে আব্দুল্লার সাথে হাজ্জাজের বিশাল বাহিনীর যুদ্ধ বাঁধল। আব্দুল্লাহ খুবই শোচনীয়ভাবে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে, হাজ্জাজ তাঁর ছিন্ন মস্তকটিকে তাঁর বৃদ্ধা গর্ভধারিণী জননী, আবুবকরের কন্যা, স্বয়ং মহানবীর অতীব স্নেহধন্যা বিবি আস্‌মার নিকট খাঞ্চাযোগে উপঢৌকন রূপে পাঠিয়ে দিলেন। হাজ্জাজ এখানে নিছক অনৈস্লামিক কাজই করেন নি, অমানুষিক কাজও করলেন। ইতিহাস আপন পথে উত্তর দিল। এই আব্দুল্লাই একদিন

প্রতিদ্বন্দ্বী নিধনের গোপন অভিপ্রায়ে ইরাকের পথে হোসেনকে উৎসাহিত করেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন—মহানবীর ঐ বাণীটি—"কার্য্যাবলী উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।" মানুষের কাজ যাই হোক, ফলাফল নিয়েত বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে। হযরত হোসেন রোজ হাশর পর্যন্ত শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন, এমন কি তিনি আজ মুসলিম জাহানের জাতীয় শহীদ। কিন্তু আব্দুল্লার প্রাণদান বড়ই পরিহাস ও উপহাসে পরিণত হলো। আব্দুল্লাহ্ যেন ইতিহাসের উত্তর পেলেন।

কল্‌মা নামায রোযা হজ্ব ও যাকাত
সব কিছু পড়ে থাকে মন দেখে নাথ।
কুচিন্তায় সদা যার লিপ্ত থাকে মন
অশান্তি হৃদে তার বহে অনুক্ষণ।

এইভাবে একই ভাবে পটপরিবর্তনের অধ্যায়ে ইতিহাস তার সমুচিত উত্তর দিতেই থাকলো—আব্বাসীয়া খেলাফতের পটপরিবর্তনের পতন পর্যন্ত। আমরা বার বার এর পশ্চাতে কি দেখলাম, নীচতা, হীনতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা, অসংযমতা, সবার উপর ভোগের অতিরিক্ত লোভ ও লালসা, অতিরিক্ত ইচ্ছা ও অকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি। তবে শাস্তির কথা, স্বস্তির কথা, সান্ত্বনার কথা ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করলো না। এইগুলো কি নবীজীর শিক্ষা ছিল!

দেখিয়াছ ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙ্গাগড়া
দেখনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।......
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সেই মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায়ে মোরে।"

—রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি—২

পরিশিষ্ট—৩

নবীজীর শিক্ষা (১)

কতিপয় বাদ দিলে সবাই সমান
মানেনি কেহই তারা নবীর ফরমান্।
কিছুটা উড়ার মতো সু-সুযোগ পেয়ে
উড়েছে সবাই তারা অজ্ঞ-যুগ ধেয়ে।
কেহ গড়ে জমিদারী, কেহ তালুকদারী
গড়েনি নবীর ধারা আফ্সোস্ তারি।
থাকিলে তাদের হাত সুন্দর-সংযত
কখনো নবীর ধারা হতো না ক্ষত।

মুখেতে যাহাই বলুক জীবন-মরণ
করেনি কেহই কভু নবীর স্মরণ।
গড়েছিল কার লাগি কোন্ খেলাফত্
নবীর সুন্নত নয়, আল্লাহ্‌র লা'নত্
সুফল পায়নি দেখ কারো বংশধর
পেয়েছে সবাই তারা কালের উত্তর।

প্রতিজ্ঞা সবার হোক জীবন-মরণ
করিতে কঠোর চিত্তে নবীর স্মরণ।

—কাব্যকানন

নবীজীর শিক্ষা (২)

ঈমান্ ইন্‌সাফ্ যদি থাকে সুখে-দুঃখে
গড়ে উঠে ইন্‌সানিয়াত মুখে নয় বুকে।
তব হাতে নাই কোন ক্ষীণ পরাজয়
বিবেকেতে থাকে যদি ইন্‌সাফের জয়।
তোমাতে পশুতে করে সহস্র তফাৎ
ইনসান্ তোমার নাম তব ইন্‌সানিয়াৎ।

হেন শক্তি নাহি কোন তোমাকে রুখিতে
নবীজীর শিক্ষা যদি রাখ সম্মুখেতে।
তব হাতে কিছু নয় বিশ্বের বিজয়
অন্তরেতে থাকে যদি ঈমানের জয়
ঈমান ইন্‌সাফ্ সহ তোমার আমান
তোমাকে করিবে দান জগৎ সম্মান।

—কাব্যকানন

আশ্রয় প্রার্থনা (১)

বলো। আল্লাহ্ চাই আমি আশ্রয় তোমার
প্রভাতের প্রতিপালক, রাতের স্রষ্টার।
যা কিছু সৃষ্টি তব, তার অনিষ্ট হতে
হাযোয তোমার নাম রেখ হেফাযতে।
রাতের আঁধার যবে ঘনীভূত হয়
ঘনঘোর অন্ধকারে তুমিই আশ্রয়।
ঐ নারীর হাতছানি যাদুবিদ্যা হতে
রক্ষা কর তুমি মোরে তোমার রহ্‌মতে।

হিংসুক যখন তার কুচক্র ধরে
চাই আমি আশ্রয় তোমার করে।
ভেতরেতে ষড়রিপুর সবল যন্ত্র
বাহিরেতে যাদুকরের তন্ত্র-মন্ত্র।
কোন কিছু অঘটন ঘটাবার আগে
বধিবারে শয়তানেরে দাও শক্তি ত্যাগে। কোরআন ১১৩ : ১-৫

—কাব্যকানন

আশ্রয় প্রার্থনা (২)

বলো! আল্লাহ্ চাই আমি আশ্রয় তোমার
মানুষের প্রতিপালক মানব-কর্তার।
সমগ্র মানব জাতির উপাস্য তুমি
রক্ষা কর তুমি মোদের অন্তর-ভূমি।
জ্বিন ও মানব-রূপী শয়তান্ এসে
মানব হৃদয়ে দেয় কুচিন্তা ফেঁসে।
পরিস্থিতি পরিবেশ না কর হেন
প্রবঞ্চনায় প্রতারণায় না পড়ি যেন।
বলি! আল্লাহ্ তব আসন অন্তর-ভূমি
খান্নাস্ শযতান্ হতে রক্ষা কর তুমি।
তব হাতে সর্বশক্তি দাও শক্তি বল
ষড়রিপুর ষড়যন্ত্র করিতে বিকল্।
শিক্ষা দিতে শয়তানেরে দৃঢ় চিত্তে মম
শক্তি মোরে দাও প্রভু পাহাড় সম। ১১৪ : ১-৬
মহান অমূল্য রত্ন নবীজীর শিক্ষামালা
এ যেন প্রাচুর্যে ভরা প্রকৃতির পাঠশালা।

—কাব্যকানন

পরিশিষ্ট—৪

বিশ্বধর্মের পটভূমিকায় ইসলাম

বিশ্বধর্ম ঃ সৃষ্টি-জগৎকে সুখী ও সুন্দর করতে, কখন শান্ত ও সংযত করতে, কখন বা সৎ পথে পরিচালিত করতে স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিলোকে মাঝে মাঝে কিছু উপদেশ, কিছু নির্দেশ, কিছু সতর্কবাণী পাঠিয়েছেন—যুগে যুগে, নানা লোকে, নানা ভাবে, নানা পরিবেশে। বিধাতার এই বাণী প্রেরণকেই মোটামুটিভাবে ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্রষ্টার এই বাণীগুলোই ধর্মীয় গ্রন্থ, এবং বাণী বাহকগণ তাঁর ধর্মীয় দূত। কোনটির সাথে কোনটির, কারোর সাথে কারোর মূলগত কোনই পার্থক্য নাই। সময়ের ব্যবধানে, সময়ের প্রয়োজনে সৃষ্টি লোকে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, এই যা। তা কখন বর্ষার পলিমাটি মিশ্রিত কর্দমাক্ত প্লাবিত জল, কখন বৈশাখীর খরদীপ্তদাহ মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড মাথায় নিয়ে অতীব উত্তপ্ত জল, কখন শীতের হিম প্রবাহে হাড়-কাঁপান কনকনে ঠাণ্ডা জল, কখন বা বসন্তের সুশীতল প্রাণজুড়ান পানীয় জল, অর্থাৎ বর্ষার নদীতে বর্ষার রূপ, বৈশাখীর নদীতে বৈশাখীর ছাপ, শীতের নদীতে শীতের ভাব।

তাই যা কিছুই এসেছে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন জনে ;সেই এক জনেরই নিকট হতে এসেছে। তিনি আল্লাহ্ বা ঈশ্বর যাই হোন, ভগবান বা রহমান যাই বলি।*১

সত্যসন্ধানী ভারত ঃ সৃষ্টির আদিম যুগ হতেই মানব মনে ও মানব সমাজে ধর্ম জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সজ্ঞানে-অজ্ঞানে, চেতনায়-অবচেতনায় কম বেশি স্বীকৃতি পেয়েছে। কোথাও তা সাধনা ও সংস্কারের আলোকোজ্জ্বল ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় হয়েছে উন্নত, কোথাও বা গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের ভাষ্য মেঘে হয়েছে আচ্ছন্ন। সমাজে তার প্রতিষ্ঠা পাওয়া না পাওয়া উভয়ের পেছনে আছে বহু শতাব্দীর ভক্তি ও ভালভাসা, যুক্তি ও তর্ক। তবুও সে কারো প্রয়োজনে কারো অপ্রয়োজনে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, নিন্দায়-প্রশংসায় মানুষের মনে মহানের দূত মানুষ দ্বারাই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশেষ করে ভারত ভূমিতে ধর্মের স্বীকৃতি বা প্রয়োগ যেন সারা বিশ্বের বিস্ময়। কেননা সত্যের সন্ধানে ভারত কতকাল পূর্বে ভক্তি ও ভালবাসা এবং জ্ঞানের পিলসুজ মাথায় নিয়ে তার কৃতি সন্তানদের সত্যান্বেষী করে তুলেছিল, তা যজুর্বেদও নির্ণয় করতে

পারে নি। সত্যের সাধনা ও সন্ধান ভারতের আদি ও আদিম সাধনা, তার অন্তরের আত্মিক সাধনা, তার শাশ্বত মূল মন্ত্র। তাই সত্য জয়ের সাধারণ সূত্রটিও যেন যে আবিষ্কার করল সহজ পথেই সহজ ভাবেই—'ভক্তের ভগবান'।

ভারত ভূমি মূলত সত্যের সাধক ঋষি মহর্ষীর দেশ, তপোবনের দেশ, ধর্মের দেশ। এই সত্যের ও সুন্দরের সাধনাই সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভারত সেই শ্রেষ্ঠ সাধক ও সাধনার তীর্থভূমি। দূর অতীতের কোন অজানা অলিখিত এক ইতিহাসে একদিন ভারতের পূণ্যভূমি পবিত্র হয়েছিল, প্লাবিত হয়েছিল ঐ অগণিত সত্য সাধকের পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করে। তাঁদের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত ভারত, সাধনাপুষ্ট ভারত, সত্যস্নাত ভারত, নির-অহংকার ভারত, নৈতিকতায় গভীর বিশ্বাসী ভারত, নিখিল পিতার চির নিত্য পূজারী ভারত তার প্রকৃতির হাতে তুলে ধরল সত্যের পতাকা—প্রেম, এবং প্রবৃত্তির হাতে তুলে ধরল শান্তির প্রতীক-ভালবাসা। সত্য ও সুন্দর যেমন তার সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেম ও ভালবাসা তেমনি তার জন্মগত প্রকৃতি। এই দুয়েরই মিলন মোহনায় তার স্বভাব-ধর্ম হল আন্দোলিত। তার নীতি-ধর্ম হল নিয়ন্ত্রিত, তার মহান ধর্ম হল প্রতিষ্ঠিত। ঐ ধারাতেই এই ধরণীর প্রেমও তার ধমনীতে স্বর্গের আসন লাভ করল, ভারতীয় সাহিত্যে সমাজে সংস্কারে এমন কি শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলাবিধানে ও প্রেমের লীলায় সাদরে সসম্ভ্রমে সম্মানিত হল মানুষের প্রেম—রাধা ও কৃষ্ণ, শিব ও সাবিত্রী, শিরি ও ফরহাদ, লায়লা-মজনু, রোমিও ও জুলিয়েটর। তাই অহিংসা বা প্রেম তার সন্তানদের চির গৌরবময় মাতৃ-ঐতিহ্য। নানা জাতি নানা বর্ণ নানা ভাষা নানা ধর্ম সমন্বিত এই ক্ষুদ্র জগৎ ভারত তার আপন প্রকৃতিগত সহনশীলতা ও সহ-অবস্থানের মাধ্যমে প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার দ্বারা পাপী তাপী মানুষকেই 'এই পৃথিবীর বুকেই যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করল দেব মহিমায় মহিমান্বিত করে—'নরই নারায়ণ'। ভক্তির হাতে ধরা দিল ভক্ত, আবার ভক্তের প্রেমে ধরা দিলেন স্বয়ং ভগবান, তখন এই প্রেমময় ভক্তই আবার—'নরই নারায়ণ'। এই ভাবে ভারতের যে সাধনার ধারা আমরা লক্ষ্য করলাম, তা একদিকে যেমন স্রষ্টাকে ভক্তির মাধ্যমে পাওয়া গেল, অর্থাৎ ভক্তের ভগবান, আবার অন্যদিকে তেমনি তাঁরই সৃষ্টির সেবার মাধ্যমেও তাঁকে পাওয়া গেল, অর্থাৎ এখানে মানুষ মাত্রেই যেন দেব মহিমায় মহিমান্বিত—'নরই নারায়ণ'। সাধনার কি সুন্দর ধারা।

কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা বর্তমান ভারত শান্তি ও সাধনার এই সুন্দর ধারা কি জীবিত রাখতে পেরেছে, না পারছে ! তাকে বাঁচিয়ে রাখা সমগ্র ভারতের সমস্ত সন্তানের নিজ নিজ নৈতিক দায়িত্ব। কেননা প্রকৃতির অনুশাসনে

যে কোন বড় জিনিস তার ধৈর্য, সহ্য, ও সহনশীলতা ব্যতীত বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। ভারত তার সামান্য অসামান্য সব কিছুকে নিয়েই অখণ্ডিত ও অনন্য ভারত, এর কোন রূপ ব্যতিক্রম হলেই সে খণ্ডিত ও ক্ষতবিক্ষত ভারত।

মনুষ্যত্বের মহা উত্তরণ

ভুবনেরে শিখাইল ভারত সন্তান
প্রেম ভক্তি ভালবাসায় সত্যের সন্ধান,
ভাবিলে সৃষ্টিরে হীন ভাবিও নিশ্চয়
মহান স্রষ্টারে তার ঘৃণা করা হয়।
দয়া দান স্নেহ মায়া দেখে ভালবাসা
স্বর্গের দেবতা করে মর্তে যাওয়া আসা,
স্বর্গ হতে নেমে তিনি মর্তে যবে আসে
এ জীবন ধন্য করে বসে কার পাশে।
কোন চোখে দেবতারে দেখে কোন জন
ভক্তের দুনয়ন, 'নরই নারায়ণ'।
প্রেম প্রীতি ভালবাসায় দেবতার মান
আরাধনা নয় শুধু মানবতার গান।
প্রেমহীন উপাসনায় ডেকে স্রষ্টারে
নাহি করে প্রার্থনা গালি দেয় তারে।
প্রেম প্রীতি ভালবাসায় পূজা আরাধনা
মনের মন্দির মাঝে দেবতারে আনা।
তুমি যে প্রেমের বাহন প্রেমময় প্রাণ
আরাধনা হোক তব তারই জয়গান।
ভারতের মনুষ্যত্বের মহা উত্তরণ
'ভক্তের ভগবান', 'নরই নারায়ণ'।

ইসলামের ইতিহাস : এতক্ষণ আমরা ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল সুর ও মর্মবাণীর মূল ধারাটি লক্ষ্য করলাম। কে কতটা তা পালন করেন, না করেন, সেটা স্বতন্ত্র কথা। তবে ধারাটি যে অতি সুন্দর, এতে কোন সন্দেহ নেই। কথিত আছে, মানুষের আদি পিতা হযরতআদম (আঃ) মর্তের বুকে প্রথম এই ভারত ভূমিতেই পদার্পণ করেছিলেন। এই ভারত ভূমিতে ইসলাম একদিন তার প্রাণের সাড়া পেয়েছিল। তাই সে এখানে সহজে সফলতাও লাভ করেছিল। আমরা এখানে সেই ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখছি বা আলোচনা করছি। তবুও এটা কিন্তু সঠিক ইসলামের ইতিহাস নয় ;এখানে ইসলামের ইতিহাস মানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম ইতিহাস। তবুও তাঁদের ইতিহাসই জনরবে ইসলামের ইতিহাস বলে পরিচিত বা প্রচলিত। এই অর্থেই ইহা ইসলামের ইতিহাস মাত্র।

দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে গরিব হয়েছে নাশ
ভাবিও না তা কোরআন হাদিস ইসলামের ইতিহাস।
দেখিয়া কোন বাদশার কোপে অসহায় মজলুম—
জালেমের রূপ দেখিও সেথা ইসলামে নাই জুলুম।
দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে জুয়ার আসরে তাস—
ভাবিও না তা আল্লাহর বাণী নবীজীর ইতিহাস।
দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে সতীর সর্বনাশ—
ভাবিও না তা কোরআন হাদিস ইসলামের ইতিহাস।
নর-নারীর প্রেম শুদ্ধ পথে বহিতে প্রেমের প্রবাহ—
ব্যভিচারে দিল প্রাণদণ্ড, বিবাহেতে বহে উৎসাহ।
"বলে না কোরআন, বলে না হাদিস ইসলামের ইতিহাস—
নারী নর-দাসী বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারমাস।"
এক যদি হয় গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি হয় মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী।

বলে না কোরআন বলে না হাদিস সাম্যের ইতিহাস—
মর্তের বুকে করিবে মানুষ খুনোখুনি বারমাস।
বলেছে কোরআন বলেছে হাদিস শান্তির ইতিহাস—
বিশ্ব-মানব করিবে হেথা শান্তিতে বসবাস।
চার খলিফার রচিত যাহা ইসলামের ইতিহাস—
মোরা শুধু তার বিকৃতি করণ করেছি সর্বনাশ।*২

মুসলিম ইতিহাস : ইসলামের এই ধারাবাহিক ইতিহাসে মুসলিম রাজাবাদশাদের কাহিনীর সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের প্রবর্তক মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ইসলাম কি? সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে বিধাতার দূত এই পৃথিবীর বুকে কি করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সাধনা, তাঁর ব্রত, তাঁর মূল উদ্দেশ্যই বা কি ছিল, সে সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের সাথে প্রকৃত ইসলামের অল্প-বিস্তর পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কেননা কতিপয় বিরল ব্যক্তিত্ব ব্যতীত অধিকাংশ খলিফা বা রাজা বাদশাদের তৎসহ বহু মুসলমানদের কাহিনী ইসলামের ইতিহাস নয়, ইসলামের বিকৃত রূপ, ইসলামের কলঙ্ক মাত্র। রসুলের ইসলাম, মহানবীর ইসলাম, সৎ-খলিফাদের ইসলাম ঐ বিকৃত ইসলাম নয়, কলঙ্কের ইতিহাসও নয়। ইসলামের নামে সাধারণ মানুষের মাথায় টুপি পরিয়ে তথাকথিত নকল ধান্দাবাজ পীরদের প্রভূত পয়সা রোজগারেরও ইতিহাস নয়, কলকাতার কোন এক বড় বই প্রকাশক বলেন— আল্লাহ্‌কে নিয়ে ব্যবসা করাটা সহজ, এই ঘৃণিত ইতিহাসও নয়। সে ইতিহাস বিশ্বের নবজাগরণের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস, দুর্গত মানুষদের উদ্ধারের ইতিহাস, অবহেলিত রমণীকুলের রক্ষার ইতিহাস। পথভ্রষ্ট মুসলিম রাজা-বাদশাগণের কাহিনী ও ভ্রান্ত মুসলমানগণের ঘটনারাশি কোনক্রমেই ইসলামের ইতিহাস নয়, বরং তা ইসলামের পরিতাপ, পরিহাস ও উপেক্ষিত বস্তু উপহাস। বড়জোর তাকে বলা যেতে পারে মুসলিম ইতিহাস।

ধর্ম : আপাত আমরা আমাদের অলোচনায় আবার ফিরে যাব সেই মূল ইসলামের দিকে। ধর্ম মানেই প্রেম, অর্থাৎ ধর্মের মূল বক্তব্যই হল প্রেম ও ভালবাসা। পরম করুণাময় কৃপানিধান প্রেণময় আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের মহান দূতগণ যুগে যুগে দেশে দেশে নানা ভাবে এই প্রেমের বাণীই বহন করে এনেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিধাতার বাণীবাহক, সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। দুর্গত মানবতার মহান কাণ্ডারী। ধরার ধূলি মাটিতে ইসলাম-জগৎ এই প্রেমের পথেই প্রেম বিতরণে সর্ব কনিষ্ঠ পথিক রূপে সারা বিশ্বের ধর্মীয় সমাজে পদার্পণ করেছিল।

অতি সংক্ষেপে সামগ্রিকভাবে স্রষ্টার সৃষ্টি জগতে তার আবেদন, অবদান, মূল সুর ও মর্মবাণী কি ছিল, পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তারই কিঞ্চিত আলোচনা এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রেম ও মানবতার ধর্ম ইসলাম : ইসলামের প্রবর্তক মহানবীর জীবনে ও সৎ খলিফাগণের দৈনন্দিন আচরণে ইসলামের যে সর্বজন গ্রাহ্য অবিকৃত দর্পণ, যে নির্মল স্বরূপ, যে স্বচ্ছ ছবিটি কালের কপোলতলে চির সমুজ্জ্বল :—

১। যেখানে বেজে উঠেছে তার (ইসলাম) কণ্ঠের সহজাত গান—ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য প্রেম ও ভালবাসা।

২। দুর্গত মানুষ ও মানবতাকে বাঁচান তার কোথাও ঘোষিত, কোথাও বা অঘোষিত আমরণ আপোষহীন জেহাদ।

৩। ন্যায়ের সংগ্রাম ও সমর্থন যার স্বভাবসুলভ প্রবৃত্তি, তথা সত্য ও সুন্দরের স্বীকৃতি এবং ইনসাফ্ তার জন্মগত প্রকৃতি।

৪। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারকে সে প্রাণের বিনিময়েও রুখে দিতে সরবে নীরবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৫। সততা এবং শুচিতা তার সূর্য ও চন্দ্রসম বাণীর মূলধন।

৬। হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা তার রুদ্রবীণায় প্রাণের অতীব ঘৃণিত বস্তু।

৭। সৎশীলতা, সহনশীলতা, সহ অবস্থান তার শ্রেষ্ঠ বাণীর উজ্জ্বলতম তারকারাশি।

৮। আচারে বিচারে সহ্য ধৈর্য দয়া ও ক্ষমা তার অঙ্গের ভূষণ, নবীজীবনের আলেখ্য।

৯। সমাজ-গঠনে সাম্যের সাধনা, শান্তির কামনা ও প্রতিষ্ঠা তার স্থির লক্ষ্য।

১০। বিশ্বপিতার বন্দনা যার প্রথম কাজ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ ও শান্তি স্থাপন তার প্রধান কাজ। একটি অপরটির বিকল্পরূপ পরিপূরক।

১১। শরীয়ৎ (ইসলামের অনুশাসন) যার দেহ স্বরূপ। হকীকৎ সৃষ্টির সেবা (ইসলামের সত্যে অবস্থান অর্থাৎ সূফীবাদ) তার প্রাণ স্বরূপ।

১২। তার প্রাণ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন কি তার স্নায়ুহীন একটি লোমের সাথেও নকল পীরবাদ ও বিকৃত মোল্লাতন্ত্রের কোন যোগ নাই।

১৩। বিশ্বতন্ত্র, বিশ্বমিলন, মানুষ এক তার মূল মন্ত্রের মূলসুর।

১৪। সৃষ্টির জন্য ভালবাসা ও স্রষ্টার জন্য ভক্তি তার শেষ কথা।

ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনার প্রধানত চারটি স্তর—১। শরীয়ৎ= (ইসলামের) নীতি বা অনুশাসন, ২। তরীকৎ=(ইসলামের) সত্যের পথ, ৩। মারেফৎ=(ইসলামের) সত্যে উত্থান, হকীকৎ=(ইসলামের) সত্যে অবস্থান।

এই বিশ্বের অচিন্তনীয় সমাজ সংস্কারক মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মক্কার মহাপ্রতিকূল নিঃস্ব জীবনের যে ছবিটি আমরা পেয়েছি, যেখানে তার এক হাতে ছিল ধারণাতীত ধৈর্য, এবং অন্য হাতে ছিল সীমাহীন সহ্যশক্তি, অর্থাৎ সেখানে পেলাম তার ধৈর্য ও সহ্যের জীবন। আবার মদীনার মুকুটবিহীন শক্তিধর সম্রাট মহানবীর জীবনে যা পেলাম—একহাতে ক্ষমা ও অন্য হাতে দয়া অর্থাৎ ক্ষমা ও দয়ার জীবন। যখন শক্তিহীন ও নিরুপায় ছিলেন, তখন ছিলেন ধৈর্যশীল। আবার যখন সমস্ত শক্তি তার পদ-লুণ্ঠিত, তখন হলেন ক্ষমাশীল। কি অপূর্ব জীবন, কি অপূর্ব আদর্শ। এককথায় প্রেম ও ভালবাসাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ধর্ম ও মহৎ শিক্ষা। ইসলাম তাই ধৈর্য ও সহ্যের ধর্ম, ক্ষমা ও দয়ার ধর্ম, এককথায় প্রেম ও ভালবাসার ধর্ম।

ইসলাম প্রেমের ধর্ম

হৃদয় আমার সবার লাগি সকল স্বরূপ ধরে।
যারাই আমার প্রেম করেছে তাদের ঘরে ঘরে।
পথ পন্থা তাদের ব্যাপার তাতেই তারা তুষি
অনুষ্ঠানের অন্তরালে প্রেমেই আমি খুশি।
অনুশাসনের অন্ধকারে কতই বাছাবাছি
প্রেমই আমার ধর্ম যেন প্রেমেই আমি আছি।*৩

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে অধিকাংশ মুসলিম রাজা-বাদশাদের চরিত্রে এ গুণগুলি যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। যদি কেউ মহানবী প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত ইসলাম জানতে চান, তা হলে তাঁকে (এই ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) পড়তে হয়—৬১০ খ্রীঃ হতে ৬৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত মহানবীর নবুয়ত্ বা ঐশী জীবন এবং ৬৩২ খ্রীঃ হতে ৬৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর সৎ খলিফাদের খেলাফৎ কাল। বাদ বাকি নকল ইসলাম না হলেও প্রকৃত ইসলামও নয়, অর্থাৎ বিকৃত ইসলাম। কোন জিনিসের বিকৃত রূপ

দেখলে তার সম্পর্কে বিকৃত ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ অমুসলিম জনমানসে ইসলাম সম্পর্কে সেই দুঃখময় মর্মান্তিক ঘটনাটিই ঘটেছে। এখানেই ইসলাম ধর্ম—Misunderstood Religion.

ইসলাম ও মুসলমান : শান্তিকামী শুদ্ধ (সংসারী) মানুয়ের নিখিল স্রষ্টাতে নির্দ্বিধায় যে নিরুপম নিষ্ঠা, যে অনুপম আত্মসমর্পণ, যে ব্যতিক্রমবিহীন বিশ্বাস, ও তাঁর বিধানে যে অবিচল আনুগত্য প্রকাশ, এবং যা মানুষ মাত্রকেই দেয় সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবন-ব্যবস্থা, তারই নাম ইসলাম। এবং এইরূপ আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিকেই বলা হয় মুসলমান। মুসলমান শব্দের আভিধানিক অর্থও আত্মসমর্পণকারী।

মুসলমান

সঁপিয়া মোরে সৃজন ভোরে মানিয়া তোমার সব কালাম
বলেছি আমি 'আসলামতো' মুসলিম্ তাই আমার নাম।
আসলামতো আস্তিকতা অর্থ যাহার সমর্পণ
সব কিছু মোর উৎসর্গ এই জগতের জীবন মরণ।
সমর্পণেই পূর্ণ যদি মুসলিমের যে সংজ্ঞা গান
হে প্রভু তোমার চরণতলে নয় কে মুসলমান।*৪

ইসলামের মূল মন্ত্রের মূল লক্ষ্য :

ইসলামের মূল মন্ত্রের অন্তরালে যে সার্বজনীন শাশ্বত সত্য নিহিত, সেটি ইসলাম ধর্মের মহা ও মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআন কোন একটি বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি বা বিশেষ ধর্মের কোন পৃথক মূল্য বা মর্যাদা দেয় নি। সে মূল্য দিয়েছে যে কোন দেশের, যে কোন জাতির ও যে কোন ধর্মের একমাত্র সৎশীল মানুষের। সে পরলোকে বা বিধাতা পুরুষের নিকট একমাত্র কৃতকার্য মানুষ রূপে ঘোষণা করেছে দেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষ একমাত্র নির্মল চরিত্র মানুষদেরই। অনুরূপভাবেই সে পুরস্কৃত মানুষ রূপে ঘোষণা করেছে একমাত্র সৎলোকদেরই। যে পুরস্কারটির নাম পরকালে বা বিধাতা পুরুষের নিকট জান্নাৎ বা স্বর্গোদ্যান। একথাটি পবিত্র কোরআন বজ্রকণ্ঠে কমপক্ষে ১৪০ বার ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ এককথায় স্বর্গ-শান্তি লাভ শুধু মাত্র সৎশীলদের জন্যই। সমগ্র

কোরআনে বহু ঘোষণা আছে, যাদের মধ্যে এই স্বর্গ-সংক্রান্ত ঘোষণাটি পবিত্র কোরআনে বারে ও সংবিধানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বলাভ করেছে শুধুমাত্র সৎশীলতাকে কেন্দ্র করেই। ইসলাম কোন পার্টি নয়, তার স্বর্গ কোন পার্টি অফিসও নয়।

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি মাত্র একটিই, তা মানবজাতি, এবং এই মানব জাতির জন্যই ইসলাম, ও তার প্রবর্তক এবং প্রচারক মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)। *৫

এই মানব জাতির কৃতকার্য ও স্বর্গপ্রাপ্ত পুরস্কৃত মানুষ হবে একমাত্র সৎ মানুষ। যাঁরা কোন একটি দেশ, জাতি বা ধর্মের সংকীর্ণ বা গোঁড়ামির গণ্ডিতে মোটেই সীমাবদ্ধ নন। যাঁরা স্থান পাত্র কালভেদে সকল দেশে, সকল জাতিতে ও সকল ধর্মে পরিব্যাপ্ত থাকেন। একদিন ইসলামের মহান সূফীকুল আকাশ সম উদারতা, পর্বত সম দৃঢ়তা ও সাগর সম গভীরতা নিয়ে এই সৎ-শীলতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জগৎ-মানবকে। ফলে বিরামবিহীন শ্রাবণের বারি ধারার মত মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে তাঁদের আহ্বানের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করতে, যে দীক্ষা ছিল—সৎশীলতার দীক্ষা, সহনশীলতার দীক্ষা, সহঅবস্থানের দীক্ষা, সাম্যের দীক্ষা, ভ্রাতৃত্বের দীক্ষা, সত্যের দীক্ষা, শান্তির দীক্ষা, আচারের দীক্ষা, আদবের দীক্ষা, এককথায় ইসলামের মূল মন্ত্রের দীক্ষা।

সৃষ্টির সেরা মানুষের লাগি মহাস্রষ্টার উক্তি—
মহানের কাছে মানুষের শুধু সৎশীলতায় মুক্তি।
আল্লাহর দাবী করিলে পূরণ বান্দার আছে মুক্তি
বান্দার দাবী করিবে পূরণ মহাকোরআনের উক্তি।
ঐশী কোরআন কাহারে দিয়েছে স্বর্গলাভের শর্তটি
ধর শুধু সেই স্বর্গগামী মহাজীবনের পথটি।
মানুষে মানুষে নাহি ভেদাভেদ দেখ কোরআনের যুক্তি—
বিশ্ব জোড়া সৎমানুষের সবারে দিয়েছে মুক্তি।

নাহি জাতপাত নাহি দেশকাল ইসলামের যেটি গর্ব—
বিশ্ব-মানব সৎশীলতায় পেয়েছে তাহার স্বর্গ।
সৎশীল হওয়ার মূল কথাটি ভালবাসা আর ভক্তি
নাহি সেথা কোন দেশের সীমা জাতবিচারের যুক্তি।
সৃষ্টির সেরা করিয়া যাদের গড়িলে মানব সমাজ
মানুষের দ্বারে দুটি দাবী তব বিশ্ব রাজাধিরাজ—
নিখিল মানবে দিল ইসলাম দুটি কথাতে মুক্তি—
সৃষ্টির লাগি ভালবাসা আর্ স্রষ্টার তরে ভক্তি।
উত্থান দিনে হাসরের মাঠে পাবে যারা তাঁর সাক্ষাৎ
কোরআনের কথায় ঘোষণা শুধু সৎমানবের জান্নাৎ। *২২

ইসলামের মূল মন্ত্র

যখনই নিবিড় প্রাণে নিখিলেরে ছুঁই
দেখিনা মানবশিশু এক ভিন্ন দুই।
ইসলামের মূল মন্ত্র করিলে মন্থন
একই পিতার পুণ্যে মোরা ভাই বোন।
কোরআন হাদিস মূলে শিক্ষা যেটি পাই
একই মায়েরই কোলে মোরা ভাই ভাই। *৬
তৌরাৎ জুবুর বেদ বাইবেল কোরআন
স্রষ্টার কল্যাণ বাণী সবই মহীয়ান।
বিধাতার যত বাণী যত মহাদূত
সম্মানে স্বীকৃতি দিল কোরআন নিখুঁত। *৭
ইসলামের মূল মন্ত্রে কৃতকার্য তিনি
স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যিনি। *৮
কোন্ বলে ইসলামের স্বর্গ পেল কারা
স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যারা। *৯
দেশ জাতি ধর্ম যত সকলই সমান
সৎশীল মানবের নাহি ব্যবধান। *১০

অনুশাসন ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে ইসলামের মূল আবেদন ঃ

ইসলামের সকল আনুষ্ঠানিক আবেদনের অন্তরালে গোঁড়ামী, ভাঁড়ামী, ভণ্ডামী বিবর্জিত শান্তিময় ও প্রগতিময় বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য, সহ-অবস্থান ও সহনশীলতার জন্য সকলেরই উপযোগী যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আবেদন নিহিত, তা যে কোন পবিত্র ধর্মের পুতঃ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ যখন মানুষকে ভালবাসার পরিবর্তে হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা পরশ্রীকাতর ও প্ররোচনায় পাগল করে তুলে, ধর্মের অনুশাসনের আহ্বান যখন মানুষকে রক্ষা করার পরিবর্তে সংহার করতে উন্মত্ত করে তুলে, তখন এ সংসারে ধর্মের ব্যবহার অপেক্ষা বিলোপটাই বেশি কাম্য হওয়া উচিত। যে কোন ধর্ম যখন শুধু অনুশাসন ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে ওঠে, তখন জানতে হবে তার মৃত্যু পরোয়ানা এসে গেছে। ইসলাম কোন দিনই এই তথাকথিত অনুশাসন ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। তার প্রকৃত আবেদন প্রয়োগে, অনুষ্ঠান হতে অনুশীলনে, এবং অনুশীলন হতে অনুভূতিতে এবং জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে, সমাজ গঠনে, শান্তি স্থাপনে, এবং সবার উপর সত্যের উপলব্ধিতে ঃ

সত্যের উপলব্ধি ইসলাম ধর্মের মুলকথা

যাদের প্রাণে ধর্ম শুধু অনুশাসনের অম্বরব
ধর্ম তাদের দেয়নি ধরা দিয়েছে ধরা তারাই সব।
যাদের কাছে নাই ভেদাভেদ অনুষ্ঠানের আড়ম্বর
আর কোথাও কি ধর্ম আছে তাদের ধরা ধর্ম পর।
মনুষ্যত্বের মহান রূপই ধর্মে যাদের লক্ষ্য স্থল
সত্য জয়ী মরণ জয়ী তারাই ধরার ধর্ম বল।
ধর্মে যদি স্বাদ পেল কেউ সেই মহাপুরুষ সেই হৃদয়
এক ধর্মের দীক্ষা মাঝে সব ধর্মের সত্যজয়। *১১

ইসলামের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া :

ইসলাম ধর্মের মূলত পাঁচটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া আছে ;—কলমা=স্বীকার উক্তি, নামায=প্রার্থনা, রোযা=উপবাস, যাকাৎ=দান, হজ=তীর্থ বা কাবা দর্শন। প্রতিটি ধর্মেই এই ধারাগুলো বিভিন্ন নামে বা প্রকারে আছে।

: ব্যক্তি জীবনে নামাযের বা প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য :

মানবাত্মার চরম বিকাশ ও মানবতার চূড়ান্ত প্রকাশ :

ইসলামের প্রথম বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলতে নামায, অর্থাৎ আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের আরাধনা। নামায নরনারীকে কদর্যতা ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে। *১২ ইসলামের এই আরাধনা ব্যক্তিজীবনে মানবাত্মার চরম বিকাশের হেতু বা হাতিয়ার স্বরূপ। ইসলামের প্রথম ও প্রধান বক্তব্য মানুষের মাঝে আল্লাহর ইবাদৎ বা বন্দনা হোক। তাই নামায অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এর অর্থ (ফানা ফিল্লাহ=আল্লাহতে বিলীন) মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হোক, যার তাৎপর্য (বাকা বিল্লাহ=আল্লাহতে অবস্থান) মানবাত্মার চরম বিকাশ। তাই ব্যক্তি জীবনে আরাধনার মাধ্যমে ইসলামের আল্লাহকে পাওয়ার অর্থই হলো—জীবনের পূর্ণতাকে পাওয়া, জীবনকে পূর্ণ করা। সুতরাং ইসলামের আল্লাহ্-প্রাপ্ত মানুষ মানেই—এ জগতের পূর্ণ মানুষ, এ সংসারের সিদ্ধ পুরুষ, সাধ্বী রমণী। শুধু এই কারণেই ইসলাম মানুষকে তার ব্যক্তি জীবনে পূর্ণ মানুষ করার নিমিত্তই তাকে নামায পড়ে আল্লাহ প্রাপ্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। এ সবই মানুষের আপন কল্যাণের জন্য। তাই মানুষের ব্যক্তি জীবনে ইসলামের আল্লাহ-প্রাপ্তির অর্থই হলো—মানবাত্মার বিকাশ প্রাপ্তি ও মানুষের ব্যক্তি জীবনের চিরকল্যাণ প্রাপ্তি। *১৩

সমাজ জীবনে এদের মূল উদ্দেশ্য :

ইসলামের পাঁচটি অনুষ্ঠানের কলমা ও নামায বাদ দিলে থাকে রোজা, যাকাৎ ও হজ। রোজা উপবাস, যা মানুষকে উপবাসের মর্ম উপলব্ধি করায়, গরিবের অনাহারকে হৃদয়ঙ্গম করায়। অন্যান্য উপকারিতার সাথে সমাজ জীবনে এর মূল্যায়ন কম না। যাকাৎ-এর অর্থ দান। ধনী ও বড় লোকদের বাধ্য করা হয়েছে গরিবদের এই দান করার জন্য। আমাদের সমাজ জীবনে এর তাৎপর্যও কিছু কম নয়। হজ হচ্ছে সকলের মিলিত সমাবেশ। তা হলে এখন আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে ইসলামের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলো প্রধানত দুভাগে বিভক্ত ; প্রথমার্ধে পেলাম মানবাত্মার বিকাশ সূত্র, এবং দ্বিতীয়ার্ধে

পাচ্ছি—সাম্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে উঠুক, এর অর্থ (ইখওয়া ইয়াৎ = ভ্রাতৃত্ববোধ) মানুষ মানুষমাত্রকেই ভাই বলতে শিখুক, যার তাৎপর্য (ইন্‌সানিয়াৎ = মানবতাবোধ) মানবতার চূড়ান্ত প্রকাশ।

সুতরাং উভয় দিক থেকেই ইসলামের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলোর মূল লক্ষ্য—বিচ্ছেদ নয়—মিলন, বিবাদ নয়—বন্ধন, সংঘর্ষ নয়—সংহতি, ধ্বংস নয়—প্রগতি। হিংসা নয় ভালবাসা, হত্যা নয় রক্ষা, বিদ্বেষ নয় প্রেম। তাই ইসলাম সমাজ জীবনে সমগ্র মানব জাতির সংহতি ও প্রগতির মহান হাতিয়ার স্বরূপ। *১৪

আন্তর্জাতিক জীবনে :

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবতার জাগরণে ও উত্তরণে ইসলামের যে আহ্বান, তা কোন গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায়, দেশ ও কালের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। তার আবেদন প্রতিটি মানুষকে তার মনুষ্যত্বের উত্তরণে নিয়ে গিয়ে আচারে বিচারে গড়নে গঠনে, লালনে পালনে, আহ্বানে প্রতিপালনে তাকে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতিনিধি করা। এর শেষ আবেদনটি সমগ্র সৃষ্টির সেবায় মানব জাতির কল্যাণে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়। যেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ধরার মানুষ হবে স্রষ্টার আসনে আসীন। *১৫

ইসলামের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার নিট ফল :

ধর্ম নিয়ে যেই কথাটি সদাই আমি মনে রাখি
অনুশাসনের অনুষ্ঠানে আল্লাহ নহে খাঁচার পাখি।
পরমাত্মার জয়গানে মানবাত্মার চরম বিকাশ
সূর্য সম জ্বলে উঠে—মানবতার পূর্ণ প্রকাশ।
বিশ্বপিতার স্মরণ আনে শুদ্ধ প্রাণের জাগরণ
বিশ্ব প্রেমের সোপান বেয়ে মনুষ্যত্বের উত্তরণ।
প্রেমের হাতে অর্ঘ দিলে বিশ্ব পিতার বন্দনা
হিংসা বিদ্বেষ অন্য-অপর ঘুচিয়ে তুলে সব ঘৃণা। *১৬

ইসলামের মুসলমান :

সুতরাং মানুষকে গড়া ও তার মনুষ্যত্বকে এবং চরিত্রকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানই আল্লাহর ইচ্ছা, কোরআনের হেকমত, মহানবীর সাধনা, এবং ইসলামের কাজ ও কৌশল, তাই ব্যক্তি জীবনে মানবাত্মার বিকাশ ও

সমাজ জীবনে মানবতার প্রকাশই ইসলাম। যাঁর মধ্যে এই বিকাশ ও প্রকাশ দেখা যায়, তিনিই ইসলামের মুসলমান। এই ইসলামকে ও এইরূপ মুসলমানকে অমুসলমানরাও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। বাদবাকি গতানুগতিক বংশগত বা বংশের উৎপাদন জাত মুসলমান। যাঁদের অধিকাংশই মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণে অক্ষম হয়েছেন। মওলানা মহম্মদ ইলিয়াস সাহেব বলেন—"হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করেন। এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু হিন্দু-ধর্মকে অশ্রদ্ধা করেন। দুটোর মধ্যেই তাৎপর্য নিহিত আছে। দুটোরই সংশোধন প্রয়োজন।"

ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস :

ইসলাম বলতে মূলত অমরা যা দেখলাম,—মানবাত্মার বিকাশ ও মানবতার প্রকাশ, মহানবীর এই ইসলামের ইতিহাস আজও কি রচিত হল। সমগ্র মানব সমাজে মহানবী একহাতে মানবাত্মা ও অন্যহাতে মানবতার, দুহাতে দুটো মশাল জ্বেলে সুদীর্ঘ ২৩ বছর মনুষ্য সমাজকে যে পথ দিয়ে গেলেন, যে পথ দেখিয়ে গেলেন, যে ইতিহাস রচনা করে গেলেন ও করতে দিয়ে গেলেন, তা আজিও কি রচিত হল। আমরা যা লিখি, ও যা পড়ি এবং পড়াই তার অধিকাংশই মুসলমানদের কাহিনী মাত্র। একে তাই যথার্থভাবে ইসলামের ইতিহাস বলা যায় না। বললে ইসলামকে অনেক সময়ই ছোট ও হেয় করা হয়। তখন ইসলামের প্রবর্তক মহানবীর প্রতিও অলক্ষ্যে যেন অবিচার করা হয়। কিন্তু তিনি অচিন্তনীয় মানব মহান।

ইসলামের মহানবী সবার নবী

আচারে পেয়েছে আলো জগৎ-ভূমি
মানব সমাজে নবী সূর্য তুমি।
বলেন দীনের নবী রসুল মোদের—
'মায়ের পায়ের তলে জান্নাৎ ছেলের।
খেতে দাও ভৃত্যগণে যা ভোজন কর
পরতে দাও চাকরেরে যে কাপড় পর।

বলেন দীনের নবী মহম্মদ অচিরে
মেটাও শ্রমের দাম ঘর্মাক্ত শরীরে।
যে করেছে তারে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল্
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল।' — হাদিস

তুমি যে অখণ্ডঅয়ের অখণ্ডিত দূত
তোমারে খণ্ডিত করে কেটে করি খুঁত।
সীমিত সম্মানে বেঁধে আপন গোত্রের
অসম্মান করা হয় জগৎ-দূতের। *১৭

সারা বিশ্বের বিস্ময় ঃ

মহানবীর যে পথ, যে কাজ, যে কৃতকার্যতা, যে ইতিহাস, যে ইতিবৃত্ত ইসলামের সৎ খলিফাগণ (খেলাফায়ে রাশেদীন—আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী) প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে দূর অতীতের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজেও করে দেখিয়ে গেলেন, রেখে গেলেন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, অমর ইতিহাস, এক হাতে রাজার ও অন্যহাতে ফকিরের, সেই পর্যায়ে পৌছতে, সেই ইতিহাস রচনা করতে, ও তার অনুশীলন করতে বিশ্বসমাজের আজকের এই আলোকোজ্জ্বল সমাজেও আর কতদিন, কত শত বছর লাগবে, তা কে জানে। তাই আজও তাঁরা সারা বিশ্বের বিস্ময়। *১৮

খেলাফায়ে রা'শেদীন— ইসলামের সৎ খলিফাগণ

(মানব মণ্ডলীর আদর্শ)

খলিফা নামের যোগ্য বুঝালেন বিধি
সৃষ্টির সেবায় যাঁরা তাঁরই প্রতিনিধি।
মহানবীর চার পার্শ্বে শিষ্য চার জন
নবীর বিকল্প রূপে করেছে ধারণ।
জীবিকা জীবন লাগি করি বিশ্বাস
জীবনেরে কর নাই জীবিকার দাস।
রেখেছ জীবন-ধ্রুব এমনি সুস্থির
যখনই বাদশা তুমি তখনই ফকির।
সমাজে শাসনে যাদের প্রত্যক্ষ জীবন

সাম্যেতে সূর্যের সম দীপ্তি বিকীরণ,
শান্তিতে চন্দ্রের ন্যায় আলো বিতরণ,
বিধাতার শতগুণে গুণান্বিত মন। — হাদিস্

কখন কোমল হৃদয় কুসুম সম,
কোথাও পাহাড় হতে ও রুদ্রতম।
কখন প্রশান্ত প্রাণ সাগর সম
কোথাও আকাশ হতেও উদারতম।
বেগবান নদী যারা কে তাদের রুখে
স্বয়ং বিধাতা যাদের স্রোতের সম্মুখে,
দুই তীরে রেখে গেলে দুয়েরই প্রকাশ
ইসলামের মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত বিকাশ।
খেলাফায়ে রা'শেদীন সিদ্ধ চারজন
মানুষের মানবতার মহা মূল্যায়ন। *১৯ —কাব্যকানন

ইসলাম জগতের মহাবিস্ময় বিরল ব্যক্তিত্ব এই চারজন সৎখলিফার পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ইসলাম বিদায় নিলেও, এই প্রকৃত ইসলামের পক্ষে একটি শুদ্ধচারী সবল শাখা রয়ে গেল, যাঁরা হলেন ইসলাম জগতের মহান সাহাবা (হযরতের বিশেষ অনুচরবৃন্দ) এবং দরবেশবৃন্দ ও সূফীকুল বা ইসলামের যথার্থ প্রাণশক্তি। *২০ যাঁদের নিকট ইসলামের আল্লাহ্ সারা বিশ্বের স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বা বিধাতা পুরুষ রূপে ধরা দিলেন। যাঁদের নিকট পবিত্র কোরআনের শিক্ষানুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-মানব একটি মাত্র জাতিরূপেই ধরা দিল—তা 'মানব জাতি'।

ভাই-বোন

সত্য যেটি ধর্ম নিয়ে বলতে পারি নির্দ্বিধায়—
সর্ব ধর্মের শীর্ষভাগে আমরা মানব একটি ভাই।
ধর্ম দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল যারা মানব সমাজ
এই ধরাতে করছে তারা নিকৃষ্ট এক জীবের কাজ।

ভেদ থাকে না ধর্ম মতে সত্য যদি হয় যাচাই—
সব ধর্মের সার কথাটি আমরা মানব একটি ভাই।
নামায রোজা হজ্ ও যাকাৎ পাঞ্জেগানা বন্দেগী
দেখে না খোদা, দেখেন তিনি কোন্ পথে তব জিন্দেগী।
পূজা-পার্বণ পূজা নিয়ে প্রেমহীন যে ধর্মরাজ
দেব-দেবতার পূজার নামে নিকৃষ্ট এই ধরার কাজ।
প্রাণের সাড়া জাগলে পরে যার উপরে সত্য নাই—
সব ধর্মের মর্মবাণী আমরা মানব একটি ভাই।
সৃষ্টিলোকে প্রীতিবিহীন প্রতিদিনের উপাসনা
বঞ্চিত প্রাণ বুঝলে শেষে ব্যর্থ এসব বন্দনা।
প্রাণের প্রদীপ উঠবে জ্বলে একটি কথার বন্দনায়—
সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী আমরা মানব একটি ভাই।
মানুষে মানুষে ভেদ টানে যে সন্ধ্যাসকাল আরাধনা
নিখিল পিতার পূজার নামে প্রার্থনা নয় প্রবঞ্চনা।
তোমার দিদার মিলবে বুঝি মসজেদে আর মন্দিরে—
বুঝব যখন আমরা মানব একটি জাতি অন্তরে।
তোমায় পেলাম প্রাণের মাঝে বিশ্বাসে ও বন্দনায়—
আমরা মানব একটি জাতি, আমরা মানুষ একটি ভাই। *২১
বলো হে মানব একটি কথা, নয় বাগদাদ বৃন্দাবন
সব ধর্মের শীর্ষভাগে আমরা মানব ভাই ও বোন।

—কাব্যকানন

ঈদ্-উল-ফিতর্

গনী মঞ্জিল, গঙ্গ্ গলিয়া, ধনেখালি

টীকা : কোরআন : আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের বাণী :
হাদিস্ : মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বাণী।

১। কোরআন (সর্বময় আল্লাহ্ সম্পর্কে) ২ : ২২৫, ১৭ : ১১০

২। কোরআন (খাঁটি মুসলমান সম্পর্কে) ২ : ১২৪, ২৭৯, ৯ : ৭০, ২৩ : ৯৪, ২৮ : ৩৭, ৪ : ৩, ৩৪, ১২৯, ২৪ : ৩২-৩৩, ৩ : ১৫৯, ২৪ : ২৭-২৮।

৩। কোরআন (ইসলাম প্রেমের ধর্ম সম্পর্কে) ২ : ১৭৭, ৪ : ১৭১, ৫ : ১১৬, ৬ : ১০৮, ১৬ : ৩৬, ১৭ : ১৫, ২২ : ৩৭, ৬৭, ২৩ : ৫৩, ৩০ : ৩২, ৩৫ : ৪, ৩৭ : ১৮১, ৪৯ : ১৩।

৪। কোরআন (মুসলমান সম্পর্কে) ২ : ১৩১, ৬ : ১৬২।

৫। কোরআন (মহানবী সমগ্র মানব জাতির জন্য) ৪ : ৭৯, ১৬৫, ৭, : ১৫৮, ৩৪ : ২৮, ৬৮ : ৫।

৬। কোরআন (মানব জাতি সম্পর্কে) ২ : ২১৩, ৩ : ১১০, ৪ : ১, ৭ : ১৮৯, ১১ : ১১৮, ২১ : ৯২, ২২ : ৩৪, ৬৭, ২৩ : ৫২, ৫৩, ২৬ : ২০৮, ৩০ : ২২।

৭। কোরআন (প্রেরিত সকল দূত সম্পর্কে) ৪ : ১৬৪, ১০ : ৪৭, ১৬ : ৩৬, ১৭ : ১৫, ৩৫ : ২৪, ৪০ : ৭৮।

৮। কোরআন (নির্মল চরিত্র ও কৃতকার্য মানুষ সম্পর্কে) : ২০ : ৭৬, ১১২, ২৩ : ১, ৮৭ : ১৪, ৯১ : ৯।

৯। কোরআন (সৎশীল এবং পুরস্কৃত বা স্বর্গপ্রাপ্ত মানুষ সম্পর্কে) ২ : ৩, ২৫, ৬২, ৮২, ১১২, ১৯৫, ২৬২, ২৭৭, ৩ : ৫৭, ১৩৪, ৪ : ৫৭. ১১২, ১৭৩, ৫ : ৯, ৬৯, ৯৩, ৬ : ৪৮, ৭ : ৪২, ৯ : ৭২, ১০ : ৪, ৯, ৬৩, ১১ : ১১, ২৩, ১৩ : ২৯, ১৪ : ২৩, ১৬ : ৯০, ১৭ : ৯, ১৮ : ২৯, ৩০, ৩০, ৩১, ১০৭, ১৯ : ৬০, ৯৬, ২০ : ৭৫, ৭৬, ৮২, ১১২, ২১ : ৯৪, ১০৫, ২২ : ১৪, ২৩, ৫০, ৫৪, ২৩ : ৫১, ২৪ : ৫৫, ২৫ : ৬৯, ৭০, ৭১, ২৬ : ৮৩, ১২৭, ২৭ : ১৯, ২৮ : ৬৭, ৮০, ২৯ : ৭, ৯, ৫৮, ৩ : ১৫, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৩২ : ১৮-২০, ৩৩ : ৩১, ৩৫, ৩৪ : ৪, ১১, ৩৭, ৩৫ : ৭, ৩৭ : ৮০, ১০৫, ১১০, ১২১, ১৩১, ৩৮

: ২৪, ৩৯ : ১০, ৪০ : ৫৮, ৪১ : ৮, ৪৬, ৪২ : ২১, ২২, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৬, ৪৫, ৪৭ : ২, ১২, ৪৮ : ২৯, ৫১ : ১৫, ১৬, ৫৭ : ১৯, ১৮, ৬৪ : ৯, ৬৫ : ১১, ৬৬ : ৮, ৬৮ : ৮, ৩৪, ৫০, ৭০ : ২২-৩৫, ৭৭ : ১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৮৩ : ১০, ৩৪, ৮৪ : ২৫, ৮৫ : ১১, ৮৭ : ১৪, ৯১ : ৯, ১০, ৯৫ : ৬, ৯৮ : ৭-৯, ১০৩ : ২, ৩।

১০। কোরআন (বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে) ২ : ৬২, ১৫৬, ৫ : ৬৯, ৬ : ১০৮, ১০ : ৯৯, ১১ : ১১৮। ১৬ : ১২৮, ১৭ : ৮৪, ২২ : ৬৭, ২৩ : ৫৩, ৩০ : ৩২, ৪৯ : ১১, ১৩।

১১। কোরআন (সত্যের উপলব্ধি সম্পর্কে) ২ : ১৭৭, ২৯ : ৪৫।

১২। কোরআন (নামায বা প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে) ২৯ : ৪৪।

১৩। কোরআন (নামায বা প্রার্থনা নিজের জন্যই) ১০ : ১০৮, ১৭ : ৭, ১৫, ২৭ : ৪০, ২৯ : ৬, ৩০ : ৪৪, ৩১ : ১২, ৩৯ : ৪১, ৪১ : ৪৬, ৬৫ : ১।

১৪। কোরআন (নামাজ গরিবের জন্য এবং অসৎ নামাযীর জন্য নরক) ১০৭ : ১-৩, ৪-৭,

১৫। কোরআন (আনুষ্ঠানিক কাজ আন্তর্জাতিক জীবনে) ২ : ৩০।

১৬। কোরআন (প্রার্থনা প্রেমের উপলব্ধি) ২ : ১৭৭, ২৯ : ৪৫।

১৭। কোরআন (মহানবী জগৎ দূত) ৪ : ৭৯, ১৬৫, ৭ : ১৫৮, ৩৪ : ২৮।

১৮। কোরআন (সৎ খলিফাগণ) ২ : ৩০, ৬২, ২১৩, ৩০ : ১১০, ৪ : ১, ১৬৫, ৬ : ১০৮, ৭ : ১৭২, ১৮৯, ১০ : ১৯, ৯৯ : ১০৮, ১১ : ১১৮, ১৬ : ৯৩, ১২৮, ১৭ : ১৫, ৮৪, ১০৫, ২১ : ৯২, ২২ : ৬৭, ২৩ : ৫২, ৫৩, ২৫ : ৫৬, ৩০ : ৩২, ৩৪ : ২৮, ৪৯ : ১১, ২৩, ৫৩ : ৩৯, ৬৪

---

* পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আচার্য সুকুমার সেনের অমূল্য উপদেশ মত ইসলামের ধাবাবাহিক ইতিহাসেব পরিশিষ্টে 'বিশ্বধর্মের পটভূমিকায় ইসলাম'-এর সংযোজন করা হল।

: ২, ৮৭ : ১৪।

১৯। কোরআন (মহানবীর সহচরগণ সম্পর্কে) ৪৮ : ২৯।

২০। কোরআন (সূফীকুল বা অলি-আউলিয়া সম্পর্কে) ১০ : ৬২, ১৮ : ৬৫, ৮৯ : ২৭।

২১। কোরআন (অখণ্ড মানব জাতি সম্পর্কে) ২ : ১১৩, ৩ : ১১০, ৪ : ১, ৭ : ১৮৯, ১১ : ১১৮, ২১ : ৯২, ২২ : ৩৪, ৬৭।

২২। কোরআন (দ্রঃ ৯নং টীকা)

ডক্টর ওসমান গনীর প্রকাশিত গ্রন্থমালা

১। কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (আধুনিকতম)

২। কাব্যকানন (কোরআন ভিত্তিক ইসলামি কবিতামালা)

বাংলা ভাষায় প্রথম সাতখণ্ডে সাতশ' বছরের

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস (৫৭০—১২৫৮)

৩। ১ম খণ্ড : মহানবী (৫৭০—৬৩২)

৪। ২য় খণ্ড : হযরত আবুবকর সিদ্দীক (৫৭৩—৬৩৪)

৫। ৩য় খণ্ড : হযরত ওমর ফারুক (৫৮৩—৬৪৪)

৬। ৪র্থ খণ্ড : হযরত ওসমান গনী (৫৭৬—৬৫৬)

৭। ৫ম খণ্ড : হযরত আলী হায়দার (৬০০—৬৬১)

৮। ৬ষ্ঠ খণ্ড : উমাইয়া খেলাফত (৬৬১—৭৫০)

৯। ৭ম খণ্ড : আব্বাসীয় খেলাফত (৭৫০—১২৫৮)

প্রকাশক : আলহাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩